দুর্বৃত্তপনা রাজনীতির বাংলাদেশের কিছু হাল-হকিকত

মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন

দুর্বৃত্তপনা রাজনীতির বাংলাদেশের কিছু হাল-হকিকত

মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন

নাফি পাবলিকেশন
ঢাকা

www.pathagar.com

দুর্বৃত্তপনা রাজনীতির বাংলাদেশের কিছু হাল-হকিকত

Durbrittapana Rajnitir Bangladesher Kisu Hal-Hakikat
(Some Aspects of Criminalization of Politics of Bangladesh)
A COLLECTION OF SOME SELECTED ARTICLES
ON CRIMINALIZATION OF POLITICAL ISSUES
BY THE AUTHOR WRITTEN BETWEEN 1996 TO 2004.
১৯৯৬-২০০৪ পর্যন্ত লেখকের কিছু নিবন্ধাদির একটি সংকলন।

মূল্যঃ টাকা-১০০.০০
ইউ.এস.ডলার-১২.০০
ইউ.কে. পাউন্ড-৮.০০

আই.এস.বি.এনঃ ৯৮৪-৩২-৩০৮১-৮
(I.S.B.N. NO.-984-32-3081-8)

প্রথম প্রকাশকাল ঃ জুন-২০০৬ইং

প্রকাশক ঃ **নাফি পাবলিকেশন**
৭৬৭ ইব্রাহিমপুর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট,
কাফরুল, ঢাকা-১২০৬।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ **নেহা কম্পিউটার**
ইব্রাহিমপুর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট,
কাফরুল, ঢাকা-১২০৬।

বিপননে ঃ **নেহাল পাবলিকেশন**
ক ৫৪/১, বারিধারা উত্তর (নোড্ডা)
গুলশান, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
UK-Address:
28 Castlemain Street
London E1 5DA

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ স্বপ্ন চৌধুরী-সম্পাদক- মাসিক জিয়া বার্তা ও ফয়সল

(লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ঢাকা নগরীতে বসে ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সারা বৃটিশ ভারতের মুসলমান নেতাদের একতাবদ্ধ করে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশে যিনি মুসলিম স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং একই সাথে সকল নিপীড়িত মানুষের আজাদী নিশ্চিত করার জন্য প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই মহামানব মরহুম নবাব খাজা সলিমুল্লাহর ১২৭তম জন্মদিন ৭ই জুন ২০০৬ইং তারিখে তাঁরই স্মৃতি এবং রুহের শান্তির উদ্দেশ্যে এবং একই সাথে নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, সৈয়দ আহমেদ খান, আল্লামা ইকবাল এবং চিত্তরঞ্জন দাস ও মুসলিম লীগের ১০০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর মহৎ দিন ক্ষনটির স্মরনের জন্য।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ক্র. নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	০১
২	দলীয় ভাবাবেগ জাতির ঘাড়ে চাপাবেন না	০৩
৩	কোন্ সুতার টানে শম্ভু বাবু মুখ খুলেছিলেন?	০৬
৪	আওয়ামী সরকারের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন কর্মসূচীঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা	১০
৫	প্রতিহিংসার রাজনীতি দেশের ধ্বংস ডেকে আনবে	২৩
৬	মিথ্যা ইমেজ টিকে থাকবে না	২৬
৭	শেখ হাসিনা দেশের সম্ভ্রম খেয়েছেন	৩০
৮	১৭৫৭-এর এবং ১৯৭২-এর চুক্তি দু'টির একটি পর্যালোচনা	৩৪
৯	কোন্ হত্যার বিচার হবে আর কোন্ হত্যার বিচার এড়ানো যাবে	৪৯
১০	অন্নদাবাবু ও বিবিসি-এর কাছে নিবেদন	৫৩
১১	স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা	৫৬
১২	২৩ জুন বিটিভি'তে আরেক ধাপ্পাবাজি	৬০
১৩	নিজ জন্মস্থান ছেড়ে কোথায় যাব?	৭০
১৪	চোরের মায়ের ডাঙ্গর গলা	৭৩
১৫	প্রধানমন্ত্রীর বিবিসির সাক্ষাৎকার-'হার মাষ্টার্স ভয়েস'!	৭৭
১৬	তবে কি আদভানী ও হাসিনা একই গন্তব্যের যাত্রী?	৮০
১৭	শেখ হাসিনাকে নিয়ে পশ্চিমাদের মোহভঙ্গ শুরু	৮৩

www.pathagar.com

১৮	দুর্নীতিবাজদের মুখে দুর্নীতি দমনের কথা মানায় না	৮৬
১৯	মাননীয় অর্থমন্ত্রী, হিসাব তো মিলছে না	৯০
২০	'শুট এট সাইট' নয়, আইনের শাসন কায়েম হোক	৯৩
২১	প্রতিহিংসা দিয়ে আইনের শাসন চলে না	৯৬
২২	শুধু ব্যর্থই নয় ওরা.....	৯৯
২৩	হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্র সমাচার	১০৩
২৪	চলমান প্রসঙ্গ ঃ "ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু"	১০৭
২৫	খাঁটিদের বিরুদ্ধে মেকীদের আস্ফালন কেন?	১১১
২৬	এই ঘৃণা ছড়ানো কেন?	১১৫
২৭	সুরঞ্জিত বাবুদের একজাতিতত্ত্ব বাংলাদেশে অচল	১১৯
২৮	মুজিব আমলে মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না, হাসিনার আমলেও নেই	১২৩
২৯	'মৃত্যু'- 'কবর' এবং বাস্তবতা নিয়ে কথা	১২৬
৩০	'বাঁধন', আওয়ামী লীগ ও অবক্ষয়ের প্লাবন	১৩১
৩১	"জুডিশিয়ারীর উপর প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ পরিকল্পিত"	১৩৭
৩২	ঠান্ডা ও গরম নিঃশ্বাস নেয়া বন্ধ করুন ঃ জননন্দিত মহান বীরদের অবিলম্বে মুক্তি দিন	১৪০
৩৩	"দ্বিতীয় টার্মে জিতলে তিনি লেন্দুপ দর্জীর ভূমিকা নেবেন"	১৪৬
৩৪	"গোযেবলস্ আজাদ সাহেব এখন কি বলবেন?"	১৪৯
৩৫	আওয়ামী লীগের তিপ্পান্ন বছর! মীর জাফরীর ইতিহাস	১৫২
৩৬	ভূতের মুখে রাম নাম	১৫৬
৩৭	প্রসঙ্গ ১৫ই আগষ্ট ঃ আলো আর অন্ধকার নিয়ে কিছু কথা	১৫৯

www.pathagar.com

ভূমিকা

সত্যি বলতে কি ২০০৬ সালের মার্চ মাসে আমি যখন 'দুর্জন রাজনীতিকদের কিছু চালচিত্র' সংকলন গ্রন্থটি 'নেহা কম্পিউটার' এ খসড়া টাইপ করতে দিই তখন এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলোও সেখানে একই সাথে বইটিতে প্রকাশের জন্য দিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এর সব, সেখানে একই বইতে দিয়ে দিলে ওটির ভলিউম অনেক বেশী হত, তাই আমি সেখানে কিছু নিবন্ধাদি দিয়ে এই বইয়ের জন্য বাকী সব রেখে দেই। সেই দৃষ্টিতে বলা যায় এটি সম্পূর্ণ কোন বিষয়ের উপর লেখা একখানা নতুন বই নয়। তাই নামটি আলাদা হলেও মূল বিষয়বস্তু একই রয়ে গেছে। ফলে বলা যায় যে যারা যারা আমার 'দুর্জন' পড়ে দেখেছেন, কিংবা অন্ততঃ ওটির ভূমিকা পড়ে দেখেছেন, তাদের জন্য 'দুর্বৃত্তপনার' ভূমিকা আলাদা করে পড়ার বোধ করি কোন প্রয়োজন নেই। তবে একটি বিষয় পুনঃ বলতে হয় এবং তা হচ্ছে এই যে বাংলাদেশের রাজনীতিকে সম্ভবমত মুখোশধারী দেশপ্রেমিক অথচ মীরজাফররূপী দুর্জন ও দুর্বৃত্তদের হাত থেকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে আমি আমার বাকী জীবন সাধ্যমত এই ধরনের লেখালেখির কাজ চালিয়ে যেতে চাই। সে কারনে সবার দোয়া কামনা করি।

মোঃ তাজাম্মুল হোসেন
৭৯৫/২ ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।
৭ই জুন-২০০৬ইং।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দলীয় ভাবাবেগ জাতির ঘাড়ে চাপাবেন না

দেশ, জাতি এবং দল একক কোন সত্তা নয়। তিনটিই আলাদা ভিন্ন বস্তু। এই তিন বস্তু এক বস্তু হয় না। কেউ যদি বর্তমানকালে তা করতে চায়, তাহলে যেমন তা হাস্যকর হবে, তেমনি হয়ে উঠবে বিপজ্জনকও।

দেশ হচ্ছে ভূগোল কেন্দ্রিক। একটি ভৌগলিক সীমারেখা একটি দেশের প্রধান এবং প্রথম পরিচয়। অন্যদিকে জাতি হচ্ছে জনগোষ্ঠীর অবস্থিতি। সে বিশেষ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, চেতনা, আশা-আকাঙ্খা, আচার-আচরণ, জীবন-জীবিকা এবং মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় ভৌগলিক পরিবেশ কোন জাতির জীবন ধারনকে প্রভাবান্বিত করলেও এ প্রাকৃতিক প্রভাব সবকিছু নিয়ন্ত্রন করে না। তবুও বলা যায় যে, দেশ ও জাতি এই দুটি বস্তুই স্থায়ী। কিন্তু রাজনৈতিক দল কোন স্থায়ী বিষয় নয়। কোন দেশের মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হলে দলীয় চেতনার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়। দলের লক্ষ্য ও আদর্শও বদলে যেতে পারে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটাই প্রয়োজন। এ ধরনের পরিবর্তনই কাম্য।

বর্তমান সময়কালে গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলের শাসন চলে। দলের আদর্শ থাকে, কর্মসূচী থাকে, কর্মীবাহিনী থাকে এবং থাকে নেতা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যদি কোন দল রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসে তাহলে সে দল তাদের নিজেদের কর্মসূচী অনুযায়ী দেশ চালায় বা চালাতে পারে এবং তারা তা করবে দেশ এবং জাতির মঙ্গলের জন্যে। মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে। মানুষের দুঃখ কষ্ট কমাবার জন্যে। সমাজ জীবনকে সুস্থ সবল করার জন্যে। যদি তারা তেমন কোন লক্ষ্যনীয় কিছু করতে পারেন, তাহলে তারা মানুষের আস্থাভাজন হবেন। আর তাহলে ক্ষমতায়ও বৈধ ভাবে টিকে থাকতে পারবেন। ভিন্ন কিছু হলে সে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক উপায়েই ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন। অন্যদল ক্ষমতায় আসবে। এরা আবার তাদের মত করে দেশ চালাবেন। যা কিনা অন্য দল থেকে ভিন্নতর হতে পারে। মোট কথা হচ্ছে দেশ ও জাতি অভিন্ন থাকলেও দল হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন। তাই দলীয় কোন প্রোগ্রাম দেশ এবং জাতিকে বিভক্ত করতে পারবে না। করা কোন ভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষে মানুষে যে দল গভীর বিভক্তি সৃষ্টি করে সে দল মানুষের কল্যাণকামী হতে পারে না। বাংলাদেশ এবং এদেশের মানুষের জন্য অতীতে যেমন তেমনি এবারে যেন আওয়ামীলীগ সরকারী দল এদেশ এবং জাতির মানুষকে একাকার করবার উদ্ভট ও অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দিকে এগুতে চাইছেন। দেশের এবং জাতির ঘাড়ে বিতর্কিত তাদের দলীয় কর্মসূচীকে চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই তারা তথাকথিত ঐক্যমত্যের জন্য ডাক দিয়েছেন, শেখ মুজিবকে 'জাতির পিতা'র স্থান দেয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। ক্ষমতা গ্রহনের ১০ দিনের মাথায় ২ জুলাই শেখ মুজিবের পতন দিবসকে তথাকথিত 'জাতীয় শোক দিবস' ও 'সরকারী ছুটি'র দিন ঘোষনা করেছেন। দেশের পাঠ্যক্রমেও সে

www.pathagar.com

মুজিবকে নতুনরূপে উপস্থাপন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোট কথা হচ্ছে বাংলাদেশকে আওয়ামীকরণ করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া তারা শুরু করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক দলীয় করনের এমন কোন ফ্যাসিষ্টিক নজির কোন গণতান্ত্রিক দেশে পৃথিবীর কোথাও আছে বা চলছে বলে আমাদের জানা নেই।

শেখ হাসিনার দশ দিন আয়ুস্কালের সরকার এভাবে যে মোজেযা দেখাচ্ছেন তাতে অনেকের পিছনের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা মনে পড়ার কথা। ১৯৩০ দশকের শেষের ঘটনা। ব্রিটিশ ভারতে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তনের পরের ঘটনাদির বিষয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রভিশন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের জন্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৬টি তে কংগ্রেস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করল এবং সরকারও গঠন করল। প্রাদেশিক সরকার গঠনের পরপরই কংগ্রেস পার্টি ঐ ৬ টি প্রদেশে তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা শুরু করল। সরকার হিসাবে তারা নিজেদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে এতে কারো আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। তাদের কর্মসূচী যদি সকল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হত, তাতে মানুষ বরং খুশিই হত। কিন্তু তারা তেমন কোন ইতিবাচক উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী হাতে নেয়ার আগে দলীয় আদর্শের নামে এমন সব কাজ-কাম করা শুরু করল যে তাতে অনেকের মনে আঘাত লাগা শুরু করল। যেমন কংগ্রেস নিজেদের দলীয় পতাকাকে প্রাদেশিক সরকারেরও পতাকা হিসাবে ব্যবহার করা শুরু করল। সবাইকে বলা হল ঐ কংগ্রেসের পতাকাকে সম্মান করতে হবে, অভিবাদন করতে হবে। স্কুলের ছেলেমেয়েদেরও নির্দেশ দেয়া হল ঐ কংগ্রেসের পতাকাকেই সেলুট করতে। যেসব ছেলে-মেয়ের পিতা-মাতা কংগ্রেস করতেন না বা অন্যদল করতেন তারা ঐ পতাকা অভিবাদন করতে আপত্তি করলেন। বিভেদ সৃষ্টি হল। কংগ্রেস সরকার এ বিভেদের সুরাহা না করেই তাদের দলীয় সঙ্গীত প্রাদেশিক সঙ্গীত হিসেবে চালু করার কসরৎ শুরু করলেন। 'বন্দে মাতরম'- এ সঙ্গীতে অনেক কংগ্রেস বিরোধীরাই আপত্তি তুললো। কংগ্রেস সরকার এ আপত্তি গ্রাহ্য করল না। কংগ্রেস আরও একধাপ এগিয়ে গেল। তাদের পিতাজী গান্ধীর বিশাল ছবি বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করল। স্কুলের ছেলে মেয়েদের ঐ ছবি নমস্কার করতে হুকুম জারি করল। এ কাজে মুসলমান ছেলেমেয়েরা ঘোর আপত্তি জানালো। তাদের অভিভাবকরাও এ আপত্তিতে যোগ দিলেন। এতো গেল তখনকার কংগ্রেসী শাসনের একদিকের উন্নাসিক রূপ। অন্যদিকে দলীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে তারা চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক কংগ্রেস প্রীতির অন্যায় অবিচার করতে থাকলো। ভারতীয় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের এসব দলীয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে থাকল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস সরকারগুলো মানুষের মঙ্গলের জন্যতো কিছু করতে পারলই না বরং প্রতিটি প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ-বিদ্বেষ মারাত্মক আকারে বাড়িয়ে তুললো

www.pathagar.com

মাত্র। ফলে তারা ১৯৩৯ সাল শেষ হবার আগে প্রায় আড়াই বছরের মাথায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হল। মানুষ হাফ ছেড়ে বাঁচে। মুসলিম লীগ ঘৃনিত কংগ্রেস সরকার গুলোর পদত্যাগ দিবসকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য Day of Deliverance বা 'নাযাত দিবস পালন করে'। এই স্বল্পকালীন কংগ্রেস শাসনের তাৎপর্যপূর্ণ ডেভলপমেন্ট (Development) হল এই যে মুসলমানদের ঠেলতে ঠেলতে দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা প্রায় Point of no return-এ চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। যার ফলেই কিনা ১৯৪০ সালের ৮ই মার্চ ইংল্যান্ডে বসে চৌধুরী রহমত আলী এককভাবে এবং এর ১৫দিন পর ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলনে মুসলমানরা নিজেদের আলাদা আবাসভূমি দাবী সম্বলিত সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহন করেছিলেন। উল্লেখ্য, কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে ঐ সময় যিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদে সমাসীন থেকেও কঠোর প্রতিবাদ প্রতিরোধ করে চলেছিলেন, তিনিই ছিলেন লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক-তিনিই তখন এই প্রতিবাদের নমুনার প্রতীক হিসাবে 'শেরে বাংলা' বা বাংলার বাঘ টাইটেলটি অর্জন করেছিলেন। এসময়কালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক যেসব প্রতিবাদ পত্র লিখেছিলেন বা বিবৃতি দিয়েছিলেন তা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে অনেক জায়গাতেই রক্ষিত আছে। দেখুন, কে. কে. আজিজ এর Muslims Under Congress Rule। ভারতীয় কংগ্রেস এবং বাংলাদেশের আওয়ামীলীগ অনেকেই জানেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কেউ কেউ আওয়ামীলীগকে কংগ্রেসের 'বি' টিম হিসাবেও বিবেচনা করেন। আর তাই হয়ত ১৯৩০ দশকের শেষে কংগ্রেস সরকার ব্রিটিশ ভারতের ৬টি প্রদেশে যেভাবে দলীয় নির্যাতন চালাচ্ছিলেন, বাংলাদেশের ২৩শে জুন পলাশী দিবস থেকে শুরু করে শেখের (শেখ হাসিনা) আওয়ামীলীগও তেমনি করতে উদ্যত হয়েছেন বলে আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি। একি নিছক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি? নাকি তারা বুঝেশুঝেই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের দলীয় ইচ্ছা এবং কার্যক্রম জোরজবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছেন? মনে রাখা ভাল, সংসদে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবার অর্থ এই নয় যে-বা এ হতে পারে না যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আওয়ামীলীগকে তার এসব উদ্ভট কার্যক্রমে সমর্থন দিচ্ছে। নির্বাচনে যে শতকরা ৭৩ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছেন বলে তথ্য দেয়া হচ্ছে, তার মধ্যে আওয়ামীদের মোট ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা শতকরা ৩৭ ভাগ মাত্র। সে হিসাব করলে দেখা যাবে যে আওয়ামীলীগ মোট ভোটারদের মাঝে সমর্থন পেয়েছেন মাত্র ২৭ ভাগের। এ ২৭ ভাগ ভোটার বা শতকরা ২৭ শতাংশ বা মোট জনগণের এক-চতুর্থাংশের সমর্থন লাভ করে জাতীয় কোন মৌলিক ইস্যু নির্ধারন এবং পরিবর্তন করা যায় কিনা তা গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখার বিষয়।

শেখ মুজিবকে নিয়ে আওয়ামী লীগের বা বিশেষ করে শেখ হাসিনার যে অনুভূতি তা অবশ্যই গভীর ভাবাবেগের। এটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভাবাবেগ যদি বারো কোটি মানুষকে বিভক্ত এবং ছিন্নভিন্ন করে তাহলে তা দেশ এবং জাতির জন্য মঙ্গলকর হবে না, হতে পারে না। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো কত সচেতন ভাবে তার পিতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর জন্যে নিজের ভাবাবেগকে চেপে রেখে দেশ চালাচ্ছেন। কেননা, একজন মৃত ব্যক্তি দেশের জন্য আর কিছুই করতে পারে না। যারা বেঁচে আছে তারাই দেশ চালাবে। মৃতদের জন্য নয়-জীবনে যারা বেঁচে আছে তাদের জন্যই দেশ, জাতি, সমাজ সবকিছু। তাই শেষে বলতেই হয়, দলীয় এবং ব্যক্তি ভাবাবেগের বোঝা বারো কোটি মানুষের ঘাড়ে অনুগ্রহ পূর্বক চাপাবেন না।

০৫/০৭/১৯৯৬ইং, দৈনিক সকালের খবর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

কোন্ সুতার টানে শম্ভু বাবু মুখ খুলেছিলেন?

আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য শম্ভু বাবু শাসনতন্ত্রে বিসমিল্লাহ-এর পাশাপাশি 'শেখ মুজিব'কে জাতির জনক হিসাবে সংযোজিত করার জন্য বক্তব্য পেশ করেছেন। ক'দিন আগে দেয়া তার এই বক্তব্যের অনেকেই প্রতিবাদ করেছেন। সংসদের ভিতরে এবং বাইরেও। এমনকি জানা গেছে যে, বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ছাড়াও আওয়ামীলীগেরও কেউ কেউ নাকি শম্ভু বাবুকে এই বক্তব্য দেয়ার জন্য প্রাইভেটে মৃদু তিরস্কার পর্যন্ত করেছেন।

সংসদের যে কোন সদস্যের বক্তব্য পেশ করা বা না করা অথবা কে কি বক্তব্য কখন পেশ করবেন, তা সবই যার যার ইচ্ছা বা এখতিয়ারের বিষয়। এসব নিয়ে আমাদের কোন কিছুই বলার থাকতে পারে না। তবে সচেতন জনগনের অংশ হিসাবে আমাদের অন্য সবার প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার আছে-কে, কি বললেন, কখন বললেন বা কেন বললেন? কেননা জনতার মঞ্চে সংসদ সদস্য এবং সরকার সবাইকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহি করা গণতান্ত্রিক সমাজে জরুরী। তাছাড়া গণতন্ত্র যেহেতু মেজরিটি শাসন, সংখ্যাগুরু মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রাধান্যের সমাজ, সেহেতু সরকার, বিরোধী দল এবং সংসদ সদস্য সবাইকে এই সব মৌলিক বিষয় মনে রেখেই কথা বলতে হবে, কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান আকীদাকে আঘাত করে এমন কোন কথা বলা সঙ্গত হবে না। এটাই গণতন্ত্রের চাহিদা। গণতন্ত্রের বাঁচার পূর্বশর্ত। এমনকি যে বৃটিশ সংসদ পৃথিবীর যে কোন সংসদের তুলনায় বেশি স্বার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং যে কারনে বলা হয়ে থাকে যে, 'বৃটিশ পার্লামেন্ট সবকিছু করতে পারে, শুধু পারে না পুরুষ মানুষকে মেয়ে মানুষ বানাতে বা মেয়ে মানুষকে পুরুষ মানুষ বানাতে'। সেই সর্বোত্তম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্রিটিশ সংসদও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মৌলিক বিশ্বাস বা চিন্তা-চেতনার বিপরীতে কোন কিছু বলে না। করার তো প্রশ্নই উঠে না। আরো বলা হয় যে, বৃটেনের কোন রূপ শাসনতন্ত্র নেই; কথাটি সত্য। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সে দেশের কনভেনশন বা চলতি রেওয়াজ খুবই সবল ও শক্ত। আর এই ধরনের কোন রেওয়াজ কেউই ভঙ্গ করে না। স্বভাবগতভাবেই করে না। প্রতিজন মানুষের স্বভাব সেইভাবে ছোট বেলা থেকে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিজন মানুষ যে কোন ক্ষুদ্র আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। রাস্তায় যেমন বাসে উঠার জন্য সবাই লাইনে দাড়ান, লাইন ভাঙ্গেন না কেউই, ঠিক সংসদ সদস্যরাও কোনরূপ কনভেনশন ভঙ্গ করেন না। আইন পূর্ণভাবে সবাই মেনে চলেন। ছোট-বড়, ধনী-মজুর সবাই। দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, এমন কোন কনভেনশন আমাদের দেশে গড়ে উঠেনি। গড়ে উঠেনি নূন্যতম গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। ফলে আমাদের অনেক সংসদ সদস্যই মাত্রাজ্ঞান ঠিক রাখতে পারছে না। শম্ভু বাবু হয়ত এ কারনেই তার সীমানা ছাড়িয়ে কথা বলেছেন। বিসমিল্লাহর পাশাপাশি শেখ

www.pathagar.com

মুজিবকেও ইকুয়েট (Equate) করতে চেয়েছেন। আর তা করে তিনি দেশে বিতর্কই সৃষ্টি করেননি বরং মারাত্মক সাম্প্রদায়িক ইস্যুও সৃষ্টি করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এখানে আলোচনায় না এসে পারেনা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধ কোন একক উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়নি। যে যার মত বুঝে যুদ্ধে গেছে। যুদ্ধ করেছে। সমর্থন করেছে। আবার কেউ কেউ নিজেদের কারনেই মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি। এই যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভিন্নতা তা অহেতুক ছিল না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থাদির কারণ যদি বাদও দেই, তাহলেও দেখা যাবে যে, মুক্তিযুদ্ধে কমপক্ষে দুটি ধারা প্রবল ছিল। একটা ছিল পাকিস্তানকে তাড়িয়ে বাংলাদেশ নামে পূর্ব পাকিস্তান ভূখন্ড স্বাধীন করা। এবং অন্যটি ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর পূর্ব পাকিস্তানকে বৃহৎ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে ভারতের অঙ্গীভূত করা। এই শেষোক্ত দলের লোকেরা ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২৪ বছর সময়কালে প্রায় কেউই পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিলেন না। পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানভূক্তি তারা একটি অস্থায়ী বা সাময়িক বিষয় বলে বিশ্বাস করতেন। কেননা, ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি ও তাদের নেতারা তাদেরকে সেইভাবেই বুঝিয়ে রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৭ পূর্ব হিন্দু মহাসভার নেতারা যেমন, তেমনি কংগ্রেসের নেতারাও একই বক্তব্য দিয়েছিলেন। হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন যে, মাত্র ছ'মাসের মধ্যে তারা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে পুনঃ ভারতে অর্ন্তভুক্ত করতে পারবেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পন্ডিত জওহরলাল মন্তব্য করেছিলেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সাময়িকভাবে তারা মেনে নিয়ে বরং 'খুব শিগগিরই' পাকিস্তানকে পুনঃ বৃহৎ ভারত ইউনিয়নে একীভূত করতে পারবেন। (দেখুন, বলরাজ মোদক রচিত শ্যামা প্রসাদের জীবনীগ্রন্থ এবং হাডসনের The Great Divide গ্রন্থদ্বয়)। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে যুদ্ধ শেষে এই কারনেই চিত্তরঞ্জন সুতার, মনোরঞ্জন ধর এবং ফনিভূষন মজুমদার এই তিনজন বাংলাদেশী হিন্দু নেতা ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে দিল্লিতে তার অফিসে সাক্ষাৎ করে তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন বাংলাদেশকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ হিসাবে একীভূত বা annex করে নেন। (দেখুন, মাসিক নতুন সফর, ঢাকা ও ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরীর Operation Bangladesh, লন্ডন ১৯৯৬ পৃঃ ৫)। সেইদিন ইন্দিরা কি কারনে তাদের সেই অনুরোধ নাকচ করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'ইয়ে আভি না মুমকীন হ্যায়' সে ভিন্ন কথা। তবে এদেশের সিনিয়র হিন্দু রাজনৈতিক নেতাগণ যে ঐ annexation এর প্রতি গভীরভাবে অনুগত এবং আকৃষ্ট ছিলেন তা সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। মনোরঞ্জন এবং ফনিভূষণ এখন বেঁচে নেই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সুতার এখনো বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছেন। শুধু তাই না। তিনি বাংলাদেশের বৃহত্তর বরিশালের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৫এর ১৫ই আগষ্টের পর কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আরও জানা যায় যে, তিনি সেখানে বসে সেই মূল আন্দোলন এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই কারনে তিনি বঙ্গসেনা নামে দিল্লির খাস মদদে

www.pathagar.com

একটি প্যারা মিলিশিয়া বাহিনীও নাকি গঠন করেছেন। বাংলাদেশকে পূর্ণভাবে ভারতের annexation না করতে পারার আগে তিনি বাংলাদেশের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে বঙ্গভূমি নামে একটি স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র বা স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এটি যে বাংলাদেশকে annex করার এক চক্রান্ত মূলক আন্দোলন তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে আরও উল্লেখ করা দরকার যে, যতদিন শেখ মুজিব বাংলাদেশ শাসন করতেন ততদিন এই সুতাররা 'বঙ্গভূমি' আন্দোলন সংগঠিত করা প্রয়োজন মনে করেননি। কেননা, এরা ভাবতেন যে, শেখ মুজিব তাদের লোক এবং তার দলও বাংলাদেশকে সময়ে ভারতের সাথে annex করিয়ে দিবে। সূতাররা বঙ্গভূমি আন্দোলনের সূচনা করেন কলকাতায় বসে ১৯৭৫-এ মুজিব ক্ষমতায় থেকে পতনের পর, ১৯৭৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যে অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনাও (বর্তমানে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী) নিজে উপস্থিত ছিলেন। (দেখুন, M.T. Hussain-এর 'Bangabhumi' The weekly Friday, London. 1-7 Sept. 1989)।

এই সুতার, ধর এবং মজুমদার কোন তুচ্ছ ব্যক্তিসমষ্টি ছিলেন না। ওরা বাংলাদেশের আওয়ামীলীগ দলের সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, এমনকি রাষ্ট্রদূতের পদ পর্যন্ত সময় সময় অলঙ্কৃত করেছেন। সুতার এখন কলকাতায় বসে তার সেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তার লোকজন বাংলাদেশে কাজ করছেন। তাদের কেউ কেউ এখন শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের ক্ষমতায় সার্বক্ষণিক সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। উপদেশও দিচ্ছেন। ১৯৯৭ সালের ১৮ই মার্চ যে সময়সীমার মধ্যে কুখ্যাত ১৯৭২-এ তথাকথিত বাংলাদেশ-ভারত শান্তি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার কথা এবং সেই সময়ের মধ্যে ভারতের জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি করা; কেননা তাহলেই কেবল ঐ চুক্তি দিল্লি নবায়ন করিয়ে নিতে পারে-তাদের দখলদারিত্বস্বত্ব নতুন করে পাকাপোক্ত করতে পারে এবং তাই সামনের ৭/৮টি মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে যে এক নাজুক সময় তা সঙ্গতভাবেই মনে করা যায়। এবং শম্ভু বাবুরা এই সময়ক্ষন বুঝেই এদেশে বিসমিল্লাহকে শেখ মুজিবের সাথে equate করার কথা বলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন Remote control-এর টানে কিনা কে জানে।

শম্ভু বাবু একজন জনপ্রতিনিধি এবং সংসদ সদস্য। জনগণের ভোটেই তিনি নির্বাচিত। তিনি কোন্ দলের সেটা এখানে বড় কথা নয়। তার বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খা এবং চিন্তা-চেতনার ধারক বাহক হবার কথা। তবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আদর্শিক আনুগত্য যাই হোক না কেন, তিনি বাংলাদেশের মানুষের নির্বাচিত সংসদ সদস্যের নির্বাচিত ৩০০ জনের একজন। তাই তিনি যেমন সম্মানের পাত্র তেমনি সেই সম্মান পাবার জন্য আবার এই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাধারন সেন্টিমেন্টকে তার সযত্নে খেয়াল রাখতে হবে। বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গ তেমনি একটি

www.pathagar.com

সেন্টিমেন্টাল ইস্যু। এই ধর্মীয় সেন্টিমেন্টাল বিষয়ের সাথে শেখ মুজিবের সত্ত্বা এবং ব্যক্তিত্বকে একাকার করে দেখার চেষ্টা করা যে কত 'নিন্দনীয়' ব্যাপার হতে পারে তা কি তিনি কথা বলার আগে চিন্তা করে দেখেন? যদি না করে থাকেন, তাহলে তা তার পক্ষে মারত্মক ভুল হয়েছে। আর যদি তা না হয় এবং তিনি বুঝে শুনেই সংসদে বলে থাকেন তাহলে তার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ না করে পারা যায় না।

প্রসঙ্গতঃ তাই এখানে বলতে হয় যে, ১৯৭১-এর যুদ্ধে সুতার বাবুরা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেট করেছিলেন এদেশের সৎ মুক্তিযোদ্ধারা এবং বিশেষ করে মুসলমান ঘরের সহজ-সরল যোদ্ধারা তাদের সেই উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম ছিলেন না। তারা পাকিস্তান থেকে আলাদা এবং স্বাধীন হবার পর দিল্লির কাছে এদেশের সার্বভৌমত্ব সারেন্ডার করাতো দূরের কথা, কিঞ্চিৎ কমপ্রোমাইজও করতে চায়নি। অবশ্য তাজুদ্দীনের ৭দফা চুক্তির পরে শেখ মুজিব নিজেই সেই ২৫ বছরের চুক্তি করে দিল্লির কাছে আমাদের সার্বভৌমত্ব ২৫ বছরের জন্য যেভাবে বন্ধক দিয়েছিলেন, তা যেমন সৎ মুক্তিযোদ্ধাদের অগোচরে করা হয়েছিল, তেমনি এই গোপন অপকর্মে সৎ যোদ্ধাদের কারো কোনরূপ সায় বা সর্বসম্মত রায় ছিল না। তাই দেখা যায় যে, সুতার বাবুদের লক্ষ্যের সাথে অর্থ্যাৎ বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানানোর অসৎ উদ্দেশ্যের সাথে বৃহত্তর মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্খার ব্যাপক ব্যাবধান এবং অমিল ছিল। শম্ভু বাবুদের বোধ করি মনে রাখা জরুরী যে, বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হলেও তারা নিজেদের মুসলমান আইডেনটিটি এবং গৌরবময় ইসলামী অতীত পরিত্যাগ করেনি। করতে পারে না। করবেও না। এবং নিজেদের এই আইডেনটিটির সাথে শেখ মুজিব যতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ ততটুকুই তারা গ্রহন করবে। মুজিব যেখানে মুসলিম জাতিসত্ত্বার সাথে সঙ্গতিহীন, সেইসব প্রশ্নে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাকে কিছুতেই মেনে নেবে না। মুজিব বাংলাদেশের 'জাতির জনক' এটি যেহেতু মুসলিম বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাই এটিও গ্রহন করবে না। আওয়ামীলীগ নেহাতই ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে যেভাবে এই ইস্যুটিকে নিয়ে অযৌক্তিকভাবে টানা-হেচড়া করছে তাতে তাদের কোন লাভ হবে না। তাদের ক্ষমতা শেষ হলে আবার ওই মুজিবকে জনগণ যথাস্থানেই স্থাপন করবে। স্বতঃস্ফুর্তভাবেই করবে। কাউকে এই নিয়ে বলে দিতে হবে না কিছুই।

প্রসঙ্গতঃ আরো বলা যায় যে, মুসলমানদের জাতির জনক বলতে কুরআনে যা বলা আছে, তিনি হচ্ছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাও কোনো ভৌগলিক, ভাষা, গোত্র, বর্ণের ভিত্তিতে নয় বরং সাধারন (Common) বংশসূত্রের তালিকার পরিচয়ের কারণে (Ancestory)। তাই বিসমিল্লাহর সাথে শম্ভু বাবু শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' বানানোর কথা বলে শুধু মুসলমানদের মনেই আঘাত দেননি বরং তিনি কুরআনের মৌলিক নীতিকেও কার্যতঃ অস্বীকার করেছেন। তিনি হয়তো তার নিজের বিশ্বাসগত দিক থেকে এতে খারাপ কিছু করেননি কিন্তু তাহলে কি হবে-তিনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি হিসাবে তাদেরই বিশ্বাস, চেতনা ইত্যাদি মৌলিক মানবিক বিষয়ে ও অধিকারে চরম আঘাত দিয়েছেন। আমার মনে হয়, দেশের মানুষের কাছে তার এই ভ্রান্ত বক্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এখনই অতি জরুরী। এবং একই সাথে সংসদ সদস্য পদ থেকে তার অবিলম্বে পদত্যাগ করা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়।

০৫/০৮/১৯৯৬ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

আওয়ামী সরকারের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন কর্মসূচী ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

২ আগষ্ট এক অনুষ্ঠানে আমি শ্রোতা হিসেবে কিছুক্ষণ উপস্থিত ছিলাম। সেখানে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণ শোনার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। এটি আমার সৌভাগ্য ছিল একটি বিশেষ কারনে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় বসার পরপরই যে দেশের স্কুল পর্যায়ের বিভিন্ন পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছেন, তিনি সেই বিষয়ের উপরই তীব্র সমালোচনামূলক বক্তব্য দিয়ে তার সভাপতির ভাষন শুরু করেছিলেন। কেননা, এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে একটি সমালোচনা লিখেছি এবং তা ঢাকার চারটি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। কে পড়েছেন কে পড়েননি তা আমি জানি না। সভাপতির ভাষন শেষে আমি যখন অনেকটা তাড়াহুড়া করেই সভার স্থান ছেড়ে চলে যাচিছলাম, তখন একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন আমি যেন পাঠ্যক্রম বিষয়টি নিয়ে আরও কিছু লিখি। সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের বক্তব্য শোনার পর নিজের থেকে আমি আরও কিছু লেখার তাগিদ অনুভব করছিলাম। তাগিদ অনুভব করছিলাম এই জন্য যে, তিনি আরও কিছু নতুন তথ্য দিয়েছিলেন যা কিনা আমি আমার প্রথম সমালোচনা লেখার সময় জানতাম না। যেমন বাংলা ভাষায় এবং প্রায় সকল স্কুল পর্যায়ের পাঠ্য বইতে বাংলা শব্দ চয়ন পর্যন্ত, বিশেষ করে কলকাতা বা পশ্চিম বাংলার অনুকরনে-অনুসরনে বদলাবার কার্যক্রম বর্তমান সরকারের গঠিত কমিটি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে করছেন। উনি আরও বলেছেন, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ বা বিশেষ ভাবে আরবি-ফারসি মুসলমানী শব্দাবলী বাদ দেয়া হচ্ছে বা হবে। তা না হলে নাকি বাংলা ভাষা শিক্ষা সহজতর হতে পারছে না। এ কারনেই সকল বিশ্বভারতীয় এবং শান্তি নিকেতন পন্থীদের কমিটিতে নেয়া হয়েছে। ইসলামী স্কলার, শিক্ষাবিদ বা এইসব বিষয়ে দক্ষ কাউকেই কমিটিতে নেয়া হয়নি বলে সৈয়দ সাহেব অনেক আক্ষেপও করেছেন। তিনি আরও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এদেশের পাঠ্যক্রম নির্ধারণে এই বাস্তব বিষয়টি অস্বীকার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্যের অংশবিশেষ ঢাকার কোন কোন দৈনিকে ৩ আগষ্ট প্রকাশিত হয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসান সাহেব দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। তিনি আজীবন একজন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ। এবং বাংলাদেশের একসময় শিক্ষামন্ত্রীর মর্যাদায় প্রেসিডেন্টের শিক্ষা উপদেষ্টাও ছিলেন। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-প্রশাসন, কারিকুলাম নির্ধারন ইত্যাদি শিক্ষা ও শিক্ষনীয় বিষয়ে তিনি শুধু একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই নন বরং তিনি আর্ন্তজাতিক মানের একজন বুদ্ধিজীবিও বটে। এর সাথে যুক্ত আছে তার পারিবারিক এবং মননগত মুসলিম ঐতিহ্য। এই সবকিছু মিলিয়ে তিনি একজন

www.pathagar.com

উঁচুমানের মুসলমান শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবী। তাই তার কোন বক্তব্য খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। শিক্ষার দর্শন এবং পাঠ্যক্রম নির্ধারনে তার কোন কোন মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার কোন বিকল্প নেই। অন্ততঃ এই মুসলিম জাতিসত্তার বাংলাদেশে।

শেখ হাসিনার সরকার ২৩জুন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পরপরই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিতর্কিত কাজ শুরু করেন। তার অন্যতম হচ্ছে দেশের স্কুল পর্যায়ে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম পরিবর্তন। তাদের ভাষায় 'বিকৃতির অবসান ঘটানো'। বিকৃতি বলতে সরকার কি বুঝাতে চায় তা যদিও তারা সুস্পষ্টভাবে বলেননি। তবে কিছু কিছু বিকৃতির আভাস ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আছে আওয়ামীলীগের এক সময়ের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গ। তাদের মতে মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' এবং বাংলাদেশের 'জাতির জনক' এ দুটি বিশেষন সকল পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। যেমন বাংলাদেশের সরকার (আওয়ামীলীগ) নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি মিডিয়াতে যেমন টিভি, রেডিও, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে এ দুটি বিশেষণ ১৯৯৬ এর ২৩-শে জুন এর পর ব্যাপকভাবে ইচ্ছেমত ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের মানুষকে বহুল ভাবে Brain Wash করার কসরৎ করা হচ্ছে। জনগণ তা কতটুকু গ্রহন করছে না করছে তার কোন তোয়াক্কাই করা হচ্ছে না।

আওয়ামী সরকারের এ প্রসঙ্গে অতি বাড়াবাড়ি নিয়ে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। প্রতিরোধও গড়ে উঠেছে। মুজিব প্রসঙ্গে এই ধরনের প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে সঙ্গত কারনেই। কেননা, ঐ বিশেষন দুটি আওয়ামীলীগের দলীয় ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যারা আওয়ামীলীগের নন বা অন্যদল করেন বা অন্য দর্শনে বিশ্বাস করেন, উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন না এবং যাদের সংখ্যাই বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ তারা এর প্রতিবাদ প্রতিরোধ করবেনই এবং করছেনও। এমতাবস্থায় বিতর্কিত এই বিশেষণ দুটি পাঠ্যক্রমে ছাপিয়ে দেয়ার কোন সুস্থ যুক্তি থাকতে পারে না। সরকার থেকে যদি আওয়ামীদের পতন হয় তখন কি আবার বাংলাদেশে ঐ বিশেষন দুটি পাঠ্যক্রমে উল্লেখ রাখা হবে? নিশ্চয়ই না। তখন আবার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে দেশের পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্যক্রম বদলানোর প্রক্রিয়ায় দেশের সম্পদ কি আবার নষ্ট করা হবেনা যেমন এখন করেছে। এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে আওয়ামীলীগ সরকারের দেশের পাঠ্যক্রমে এধরনের ছেলেমি করা পাগলামি ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না। আর সেই পাগলামিই করছেন শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষার কারিকুলাম নিয়ে, যার উপর কিনা নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মন-মনন গঠনের গতি প্রকৃতি চিন্তা-চেতনার ধরন।

আওয়ামী সরকারের গঠিত পাঠ্যক্রম সংশোধন কমিটি অন্য যে Sensitive বিষয়ে হাত দিচ্ছেন তা'হল বাংলাভাষায় হাজার বছর ব্যাপী যেমন মুসলমান এবং আরবী, ফার্সি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে তার মূলোৎপাটন করার প্রোগ্রাম। তারা এই অপকর্ম করতে চলেছেন বাংলাভাষাকে নাকি সাবলীল এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য।

www.pathagar.com

এটি আরও একটি পাগলামী। নিজের মায়ের মুখের শব্দের বদলে বইতে ছেলেমেয়েরা পড়বে নাকি সংস্কৃত উদ্ভুত অপরিচিত শব্দ।

বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং উৎপত্তি আলোচনা করা আমার কোন অভিপ্রায় নয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত কোন কিছু করার আমার তেমন কিছু জ্ঞানও নেই। তাছাড়া বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস এখানে প্রাসঙ্গিকও নয়। কিন্তু বাংলা ভাষাকে আরবী, ফারসী ইত্যাদি মুসলমানী ঐতিহ্যের মূল থেকে আলাদা করার অর্থ হচ্ছে এদেশের মুসলিম উম্মাহর অংশ থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিছিন্ন করা। ডি-ইসলামাইজ (De-Islamise) করা। এর সূত্রপাত আওয়ামী সরকার করেছে এমনটি পুরোপুরি সঠিক নয়। এর সূত্রপাত হয়েছিল এদেশে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের সূত্রপাতের প্রায় সাথে সাথেই। মুসলমানি পুঁথি সাহিত্যের বাংলা উৎখাত করে বিদ্যাসাগরী বাংলাভাষায় নতুনভাবে পরিবর্তন করার ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষা থেকে আরবী-ফার্সি, মুসলমানী শব্দের পরিবর্তন করে সংস্কৃত শব্দ নতুন করে আমদানী করে। মুসলমানী শব্দ বাদ দেয়াই সব কথা ছিল না। নতুন বৈদিক শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দিয়েই ভিন্ন এক ধর্মীয় দর্শন মুসলমানদের মধ্যে চাপিয়ে দেয়াও ছিল তাদের লক্ষ্য। যেমন আল্লাহ শব্দ মুসলমানদের নিজস্ব বিশ্বাসের শব্দ। এই আল্লাহ হিন্দুদের ইশ্বর বা ভগবান কিনা তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তেমনি আল্লাহ খৃষ্টানদের 'গড'ও নয় বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করে। এছাড়া এমন অনেক শব্দ আছে যেমন গোশত। এটা মুসলমানী শব্দ। মাংস বাংলা শব্দ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানী শব্দ বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করে না। পানি শব্দটা আরবী-ফার্সি কোনটাই নয়-তবুও পানি শব্দ বাংলায় মুসলমানরা ব্যবহার করে। জল শব্দ ব্যবহার করে বাংলায় হিন্দুরা। এছাড়াও আছে অসংখ্য আরবী-ফার্সি শব্দ যেমন খালা-মায়ের বোন বাংলায় হিন্দুরা যাকে মাসী বলে। তেমনি মুসলমানদের ফুফু আরবী শব্দ। কিন্তু বাংলা হচ্ছে পিসি যা কিনা মুসলমানরা ব্যবহার করেনা। ব্যবহার করে বাংলার হিন্দুরা। এমনি বাংলাভাষার শব্দ সমষ্টির মধ্যে প্রায় শতকরা দশভাগ শব্দ আছে যা কিনা মুসলমানরা নিজেদের ঐতিহ্যগত কারনে ব্যবহার করে। যে কারনে ছেলে-মেয়েদের নামকরনে বাংলার মুসলমানরা আরবী-ফার্সি ভাষা থেকে শব্দ চয়ন করে-বাংলা ভাষা থেকে করে না। তাই আমরা দেখি আবদুল করিম, তাজুল ইসলাম, হাসিনা বেগম, খালেদা বানু ইত্যাদি নাম। বাংলাদেশে মুসলমানরা বাংলা নাম রাখেন না। যেমন-গোপাল, কমল, সুকুমার, নিতাই, সতীশ, ধীরেন্দ্র ইত্যাদি নাম শুনলে এদেশে যে কেউ বুঝতে পারেন যে এরা হিন্দু। অথচ এগুলো বাংলা নাম। সন্দেহ নেই যে, সম্প্রতি কিছু শুদ্ধ বাংলা নাম কিছু মুসলমান বাবা-মা'রা তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য রাখছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নামের একটি অংশ আরবি-ফার্সি শব্দ থেকে নিচ্ছেন। যেমন-বাবুল হোসেন, ইলিয়াস কাঞ্চন, রীনা নাসের ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কোন একজন হিন্দু বা এমনকি এদেশীয় বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টানরা পর্যন্ত কেউই তাদের ছেলে-মেয়েদের নাম আরবি বা ফার্সি শব্দ দিয়ে রাখেন না। অথচ আরব দেশসমূহে অনেক খৃষ্টানদের নাম বিশুদ্ধ আরবীতে রাখা হয়। এই যে বাংলাদেশে

www.pathagar.com

অমুসলমানদের নামকরন নিয়ে এত সাবধানতা বা সচেতনতা তা কি খামখাই? এই সাবধানতা কি অর্থহীন কোন কাজ? অর্থহীন বা অযৌক্তিক কোনটাই নয়। বরং যার যার সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বা (Identity) রক্ষা করার তাগিদ। এই তাগিদ শুধুমাত্র পার্থিব কারনেই নয় বরং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনও বটে। যারা বিগত দশকে কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া ইত্যাদি মুসলমান অঞ্চলের মানুষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং নির্মমতার খবর রাখেন, তারা বুঝবেন যে এই স্বাতন্ত্র্য বিষয়টি কত গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান যাদের আছে তারা জানেন যে, এক সময়ের মুসলিম স্পেন বর্তমানে যাদুঘরের বস্তু। মুসলমান প্রধান আলবেনিয়াও এই শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ১৯৯০ দশক শুরু হবার আগে পর্যন্ত প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল। আমাদের পড়শী দেশ ভারতে উগ্র হিন্দুরা ৪০০ বছরের পুরানো বাবরী মসজিদই শুধু নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি, শত শত মসজিদ ইসলাম বিরোধী কাজের আস্তানায় কনভার্ট করেছে অথবা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ বাংলাদেশসহ কোন মুসলমান দেশে মুসলমানরা অমুসলমানদের মন্দির, গুরুদোয়ারা, প্যাগোডা ইত্যাদি ধর্মীয় উপাসনালয় বন্ধ বা ধ্বংস করেনি। তাই আরও দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা বরং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যাপারে অনেক সম্প্রদায়ের তুলনায় উদাসীন। বাংলাদেশের মুসলমানরা আমার মনে হয় আরো বেশী উদাসীন বা চেতনাহীন।

সেদিনের ঐ অনুষ্ঠানে সৈয়দ আলী আহসান সাহেবও এই বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বরং কিঞ্চিৎ তিরস্কারও করেছিলেন। তবে তিনি একটি বিষয়ে কিছুই বলেননি বা বলতে চাননি। কেন? তা তিনি নিজেই জানেন। এবং সেই বিষয়টি হচ্ছে এই যে বাঙ্গালীত্ব এবং মুসলমানিত্ব এর মধ্যে যে বিরোধ বা সংঘাত আছে এবং বিরোধের কারনে দিল্লীর নির্দেশে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে মুসলমানিত্ব বহুলাংশে অস্বীকার করে বাঙ্গালীত্বকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল এবং যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৭২ থেকে শুরু হওয়া শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রমের বিস্তারিত অনেক কিছুতেই। এই বিষয়ে বিস্তারিত অলোচনার অবকাশ আছে। আরো আলোচনা করা জরুরী ঐ সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটির মৌলিক নীতিমালা নিয়েও। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত ঐ রিপোর্টটির মূলনীতি নিয়ে আমি তাই পরবর্তীতে আলোচনার আশা রাখি।

বর্তমান বিশ্বে যে কোন স্বাধীন দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি নির্ধারনে যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পায় তা হচ্ছে জাতীয় আদর্শ। জাতির বা রাষ্ট্রের প্রধান দিকদর্শন। জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য Goals Aims and Objectives। আধুনিক রাষ্ট্রে এইসব লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে লেখা থাকে। আছে যেমন আমেরিকার শাসনতন্ত্রে তেমনি আছে আরও অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রেও। রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক পর্যায় থেকে। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এবং যা দেশের সব আইনের উর্ধ্বে

www.pathagar.com

থাকে। অবশ্য মৌলিক অধিকার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আইন রীতি-নীতি, জাতিসংঘ সনদ ইত্যাদি বিষয় অলংঘনীয় ভাবে মেনে নিতে হয় যে কোন আধুনিক সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে। তাই বলে শাসনতন্ত্র অপরিবর্তনীয় নয় এমনটিও নয়। দেশের সার্বভৌম জাতীয় সংসদ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অথবা দেশে গণভোট বা Referendum করার মধ্য দিয়ে। এবং যদি এমন কিছু করা হয় তাহলে তাও শাসনতন্ত্রের অংশবিশেষ বলে গণ্য হয়। সংশোধনের বিস্তারিত যাই হোক না কেন দেশের যে শাসনতন্ত্র তার নীতিমালার ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষানীতি নির্ধারিত যেমন হয় তেমনি সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধনও হতে পারে। এমনটি হওয়া কোন অশুদ্ধ বিষয় নয়। বরং জনগণের চাহিদা এবং সমসাময়িক প্রেক্ষিতে যদি পরিবর্তন দাবী করে তা হলে তা করাই বরং জরুরী এবং বাঞ্ছনীয়ও বটে।

বাংলাদেশে যে আধুনিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা মূলতঃ ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রবর্তিত ব্রিটিশ উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু কিছু উপকার এদেশের কিছু কিছু মানুষ পায় নাই তা আমি বলতে চাই না। কিন্তু এই ব্যবস্থা এই দেশে এবং সারা ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের কি পরিমান ক্ষতি করেছিল তাও আসলে কিঞ্চিৎ কোন কিছু ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ১৮৫৭ এর সিপাহী বিপ্লবের বিধ্বস্ত অবস্থার পর স্যার সৈয়দ আহমদ খান যদি আলীগড় শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষে শুরু না করতেন এবং তার প্রভাব বাংলা প্রদেশেও না লাগত এবং এই অঞ্চলে সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ, নওয়াব সলিমুল্লাহ, এ কে ফজলুল হক সেই আলীগড় আন্দোলনে প্রভাবিত না হতেন, তাহলে বোধ করি আজ নাগাদ সারা ভারত উপমহাদেশে পূর্ণ হিন্দুরাজ এক বিপাক শক্তিধর সাম্রাজ্য স্থাপন ও সংহত করত। এবং সংখ্যালঘু মুসলমানরা এক পশ্চাদপদ গরীব জনগোষ্ঠী নিপীড়িত দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দু ভারতের নাগরিক বৈ অন্য কিছুই হত না। দু'চারজন মুসলমান যদি বৃহৎ সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ পুষ্ট হত তা হতে পারত তা হত ভিন্ন বিষয়, ব্যতিক্রম বিষয় মাত্র।

পাঠক আমাকে নিয়ে কে কি ভাবেন বিশেষ করে ইংরেজদের উপনিবেশিক শিক্ষায় আমি যেভাবে সমালোচনা শুরু করছি-তাই এখানে আমার নিজের কিছু পরিচয় দেয়া সমীচীন মনে করছি। আমি ইংরেজদের শিক্ষায় শিক্ষিত। ব্রিটিশ শাসন আমলেই আমার স্কুল শিক্ষা জীবনের শুরু। এবং সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ যাই বলুন আমার উচ্চতর শিক্ষার পাঁচ পাঁচটি বিদেশী ডিপ্লোমা ডিগ্রীর চারটিই আমি অর্জন করেছি ব্রিটেনের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যটি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। ইংল্যান্ডে প্রাপ্ত আমার চারটি সনদই শিক্ষা বিষয়ের উপর। শিক্ষার দর্শন, ইতিহাস কারিকুলাম, প্রশাসন, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। অতএব আমি অন্ততঃ এতটুকু বলতে চাই যে ব্রিটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষা নিয়ে কিঞ্চিৎ হলেও আমার অভিজ্ঞতা খেলনা নয়।

www.pathagar.com

আলীগড় শিক্ষা আন্দোলন কিভাবে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছিল তা আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারলে ভাল হত। প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি আরও পরিস্কার করা যেত। কিন্তু আমি নিবন্ধ যেহেতু সংক্ষিপ্ত করতে চাই, সে কারনে আলীগড় বিষয় নিয়ে আর বিস্তারিত এখানে বলছি না। তবে অন্ততঃ একটি বিষয় না বললেই নয়। সৈয়দ আহামদ খানের সেই আন্দোলন না হলে ভারতে মুসলমান প্রধান দুটি দেশ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এর কোন একটি স্বাধীন দেশের উদ্ভব হত না। এই দুই দেশই বৃহৎ ভারতের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ বা রাজ্য হত মাত্র। আর তাহলে আজ নাগাদ কি হত? কাশ্মীরি মুসলমানদের সংগ্রাম এবং পাঁচ দশক ব্যাপী হাজার হাজার মানুষ শহীদ হবার বিষয় বাদ দিলেও দক্ষিণ ভারত সংলগ্ন শ্রীলংকার তামিলদের কিংবা পূর্ব ভারতের নাগাদের, মিজোদের, আহমীদের, বোডোদের কিংবা অনুরূপ অন্যসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার সংগ্রামরত দুরবস্থা এবং তাদের উপর দিল্লীর শাসক এবং সেনাবহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন ইত্যাদি অসহনীয় অবস্থা থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা ভিন্নতর কোন কিছু হত কি? হত না। বিস্তারিত ওসব এখন বাদ যাক। আমরা আওয়ামী লীগ হাসিনা সরকারের শিক্ষানীতির ১৯৯৬ এর প্রসঙ্গাদির কথাতেই আবার ফিরে আসি।

এই সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকেই কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের শিক্ষা পুনর্বিন্যাসে ফিরে যাবার কথা বলেছেন। প্রায় ২৫ বছরের সেই পুরাতন রিপোর্টটি এই সময়কালে কতটুকু প্রাসঙ্গিক আছে? ওই রিপোর্টের বিস্তারিত বলতে গেলে এই নিবন্ধের কলেবর এত বাড়তে পারে যে তা একটি মধ্যম সাইজের বইয়ের আকার হতে পারে। তাই অতসব বিস্তারিত ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি শুধু ওই রিপোর্টের মূলনীতির উপর প্রাসঙ্গিক আলোচনাতেই এই নিবন্ধের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছি। এখন আসুন দেখা যাক ঐ রিপোর্টে শিক্ষার মূলনীতি বিষয়ে কি কি বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঐ রিপোর্টের এক নং অধ্যায় শিক্ষার ভূমিকা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনাতে বলা আছে "বাংলাদেশের জনগনের বঞ্চিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য আমূল পুনর্গঠিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দানের আহ্বান জানান শেখ মুজিবুর রহমান (পৃঃ ১)। সরকার প্রধান হিসাবেই যে তিনি এই আহ্বান ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধনী অধিবেশনে জানিয়েছিলেন তা ঐ অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টেই (১৯৭৩) উল্লেখ আছে। প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখিত উদ্দেশ্যেকে পথ নিদের্শনা ধরে নিয়ে কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিয়ে আরো উল্লেখ করেন যে 'সমাজতান্ত্রিক' সমাজ সৃষ্টি 'জাতীয়তাবাদ', 'সমাজতন্ত্র' 'গণতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (পৃঃ ২)। শিক্ষার আরো কিছু সাধারন বা অবিতর্কিত উদ্দেশ্যের বিষয় রির্পোটটিতে উল্লেখ করলেও রাষ্ট্রীয় তখনকার সেই মুল চারনীতিই যে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রধান পথ নির্দশক ছিল তা বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। তার মাঝে আবার ধর্মনিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য শিক্ষা

www.pathagar.com

ব্যবস্থার পাঠ্যক্রম নির্ধারনই ছিল বলা যায় কোর (Core) বিষয়। এইক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র এই দুই নীতিকে সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে উত্তরণের সহায়ক হাতিয়ার হিসাবেই সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। ভবিষ্যতের প্রজন্ম যেন নিজেদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধর্ম নিরপেক্ষ বা শুধুমাত্র পার্থিব বিষয়ে ট্রেইনড হন সেই দিকেই রির্পোটে লক্ষ্য রাখার বিষয় চিন্তা করার তাগিদ ছিল। নৈতিকতা বা মানবতার বিষয় শিক্ষা কমিশনের রির্পোটে উল্লেখ করা হলেও নৈতিকতা বা মানবতার মূল ভিত্তি কিভাবে একজন ছেলেমেয়ের মনে গ্রথিত হতে পারে তার কোন কিঞ্চিৎ বিস্তারিত সুপারিশ বা দিক নির্দেশনা রিপোর্টে ছিল না। রির্পোটটি পড়ে দেখলে যে কারো মনে হবে যে নৈতিকতাবোধ বা মানবিক মূল্যবোধ স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে না থাকলেও তা আপনা আপনিই সকলের মনে সৃষ্টি হবে। এবং তাই হয়ত কমিশনের জনমত যাচাই এর প্রশ্নমালায় মোট ৯০ টি প্রশ্নের মধ্যে ৩টি মাত্র মাদ্রাসা শিক্ষা সমন্ধে থাকলেও এ নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক সুপারিশ কমিশন রির্পোটে উপস্থিত ছিল না।

মুসলমানদের মাদ্রাসা শিক্ষা যেমন ব্রিটিশ আমলের শাসকরা ধ্বংস করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন, শেখ মুজিবের আমলে যেন তেমনটি হতে চলেছিল বলে দেখা যাচ্ছিল। কোন কোন মন্ত্রীতো প্রকাশ্যে এই ধর্মীয় নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা সমূলে বন্ধ করে দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে বক্তৃতা বিবৃতি পর্যন্ত দেয়া শুরু করেছিলেন ১৯৭১ উত্তর এই মুসলিম বাংলাদেশেই। শিক্ষা কমিশনও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদ মুলনীতিদ্বয়ের ক্ষমতা বলে মুসলমানদের নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের ঐতিহাসিক এই মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে নিশ্চুপ থেকে ছিলেন, এ নিয়ে যেন তাদের কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য কোনটিই ছিল না। কমিশনের কাজ বিষয়ভিত্তিক ভাবে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ২৬টি অনুধ্যান বা এক্সপার্ট কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। যে সব কমিটিতে দেশের বিভিন্ন পেশার দক্ষ ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ করা হয়েছিল। তারা যার যার বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে নিজ নিজ গ্রুপের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষার রূপ রেখা এবং কাঠামোর জন্য। কিন্তু দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য বিষয় ছিল এই যে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য এরূপ কোন কমিটি নিয়োগ করা হয় নাই। মাদ্রাসা শিক্ষকদের কোন প্রতিনিধিত্ব মূল কমিশনের সদস্য হিসাবে নেয়া হয় নাই। অথচ সাধারণ স্কুল সিষ্টেমের পাশাপাশি তখন কয়েকলাখ ছেলেমেয়ে দেশের হাজার হাজার মক্তব মাদ্রাসায় লেখাপড়া করত। কয়েকটি সরকারী মাদ্রাসায়ও হাজার হাজার শিক্ষার্থী এই শিক্ষা গ্রহণ করত। অনেক উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ মাদ্রাসার শিক্ষকও সরকারী কোষাগার থেকেই বেতন ভাতাদি পেতেন। অথচ শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার এবং তাদের গঠিত শিক্ষা কমিশন এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুম্পূর্ন চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু কেন? দেশের সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা নীতির অনুসরণের কারণে শেখ মুজিবুর সরকার বাংলাদেশের প্রায় ৩০ হাজার প্রাইমারী স্কুলের বেশীরভাগকেই সরকারী করণের জন্য গর্ব করেছিলেন এখনো শেখ

www.pathagar.com

হাসিনা করছেন কিন্তু মুসলমানদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী কমিউনিটি এবং প্রাইভেটলি ম্যানেজড মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষাকে ঘৃণাভরে ওই সরকার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কেন? এই শিক্ষাকে সময়োপযোগী করার জন্যই বা ঐ সরকার কি করেছিলেন? কিছুই না। কেননা তাদের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নাকি প্রধান শত্রু ছিল এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা। এর আগেও আওয়ামী লীগ যখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্বপ্নকাল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যখন শিক্ষা বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ার ছিল তখনও তারা উন্নত ধরনের যুগোপযুগী নিউস্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উৎখাত করেছিলেন। এখানে বলা দরকার যে এই নিউস্কিম ব্যবস্থা অনেকটা আলীগড় মডেলের স্কুল শিক্ষার মত ছিল। এবং এখান থেকে পাশ করে গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সহজ সুযোগের আশা করতে পারত। কিন্তু ভারতের কংগ্রেস সরকারগুলি পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ঐ দেশে যা মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে সাহস পায় নাই, আওয়ামী লীগ এদেশে তার অনেক বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন ১৯৫৪-৫৫ সালে, ১৯৭২-৭৫ এবং এখনও যেন তেমনি অপকর্ম করতে চাইছেন এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে। এবং মুসলমানদের ঐতিহ্য ধ্বংসের লক্ষ্যে। আর কুদরাত-ই-খুদা কমিশন আওয়ামীদের বোধ করি বেদ পুরাণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে চলেছে। তা না হলে যেখানে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এখন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে আইনসিদ্ধ উপায়ে নির্বাসিত তখন আবার ১৯৯৬ সালে সেই ১৯৭২-এর ঐ দুটি ভিত্তির উপর নির্ধারিত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রির্পোটের প্রসঙ্গ আদৌ উঠে কিভাবে? কোন ভিত্তিতে? নাকি শেখ হাসিনার সরকার ধরেই নিয়েছেন যে ঐ দুটি রাষ্ট্রীয় মুলনীতি তারা ক্ষমতায় বসার সাথে সাথেই পুনঃ বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে সংযোজিত করা হয়ে গেছে?

শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করে এই সরকার প্রাসঙ্গিক যেসব বক্তব্য দিচ্ছেন তাতে শুধুমাত্র জনগণের মনে বিভ্রান্তি এবং সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে সন্দেহ বাড়ছেনা বরং তারা দেশের শাসনতন্ত্রের লংঘন করার দোষেও দুষ্ট হচ্ছেন। যদি তারা সামাজিকীকরনের জন্য দেশে সত্যি সত্যি ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য কুদরাতে শিক্ষা কমিশনের ২৫বছরের পুরাতন রিপোর্টে ফিরে যেতে চান তাহলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন, পাশ এবং সংযুক্তিকরণ। কিন্তু তা না করে এই সরকার ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ছেন কেন? কোন সৎ উদ্দেশ্যে? নাকি বিভ্রান্তি গভীরতর করার জন্য? এভাবে সৎ ও সুস্থ সামাজিকীকরন লক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব?

কে না জানে যে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে প্রকাশ্যে দুরে সরে না আসলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজের বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রত্যাহার করেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিই এখন তাদের প্রাসঙ্গিক দর্শন বলেই ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ শিক্ষা নীতি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সামাজিকীরণের কথা হচ্ছে কেন? মুক্তবাজার অর্থনীতির কারনে যে শিক্ষাদর্শণ পশ্চিমা বিশ্বে প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য

www.pathagar.com

একই শিক্ষাদর্শণ বহুলাংশেই প্রযোজ্য নয়। মুক্তবিশ্বের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে যে মানুষ গড়ে তোলা হয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে হুবহু সেই দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ গড়ে তোলা হয় না। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ একথা যদি আমি নাও বলি তাহলে আমাদের স্বীকার না করে উপায় নাই যে এই দুই ধরনের মানুষের মধ্যে পেশাগত ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈষয়িক মিল থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের মধ্যে ব্যাপক গরমিল শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যক্রমের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। শিক্ষাবিদদের ভাষায় এই সব পৃথক পৃথক দৃষ্টি ভঙ্গির মানুষকে বলা হয় যেমন বৃটেনের ক্ষেত্রে 'খৃষ্টান ভদ্রলোক', আমেরিকার মানুষের জন্য 'প্রগতিবাদী খৃষ্টান ভদ্রলোক', রাশিয়ার ক্ষেত্রে (সোভিয়েত) 'মার্কসলিস্ট ম্যান', চীনের বেলায় 'রেড এন্ড এক্সপার্ট' (Red And Expart) বা লাল এবং দক্ষ মানুষ ইত্যাদি। এখানে লাল বলতে নাস্তিক কমিউনিষ্টকে বুঝানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে কি করতে চান? কোন ধরনের বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের বানাতে চান? দেশে সবাইকে শিক্ষিত বানান, নিরক্ষরতা দূর করুন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, প্রশাসক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, আইনবিদ যা খুশী যত খুশী পারেন বানান কিন্তু ওদেরকে একই সাথে মানুষ বানাবেন তো? নাকি মূল্যবোধহীন মাস্তানবাহিনী বানাবেন? কোন্ মুল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষিত মানুষকে সামাজিকীকরন করবেন? ভাল মানুষ, ভাল মুসলমান নাকি ভিন্ন কিছুর?

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক গলদ আছে। গলদ আছে পাঠ্যক্রমে পাঠ্যপুস্তকে, শিক্ষাদান পদ্ধতিতে, শিক্ষা প্রশাসন ইত্যাদি প্রায় সব কিছুতেই এর অনেক কিছুই পরিবর্তন সংশোধন ও সময়োপযোগী করণ জরুরী সন্দেহ নাই। কিন্তু বোধ করি সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজন তা হচ্ছে আমরা এদেশে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সঠিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরী করতে চাই কিনা। সরকার তা চায় কিনা? আর সরকার তা যদি চান, তাহলে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সেই ২৫ বছরের পুরানো এবং ইসলামী মূল্যবোধ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে থাকা শিক্ষা ব্যবস্থার দাওয়াই নিয়ে ভাল কিছু এদেশে হবে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। আর তাই সরকারের ঐ নিয়ে না বুঝে কথা বলা বন্ধ করলেই ভাল হয়।

(৩) শিক্ষার নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

জাতীয় শাসনতন্ত্রিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছাড়াও শিক্ষার নিজস্ব কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। যেমন শিক্ষাবিদরা বলেন এবং অন্য অনেকেই জানেন এই সব উদ্দেশ্যবলী যার মধ্যে আছে অক্ষর জ্ঞান বা পড়তে পারা শেখা, লিখতে পারা, পড়ে বুঝতে পারা, গণনা শেখা বা সহজ প্রাথমিক পাটি গণিতের জ্ঞান লাভ। বর্তমানকালে পরিবেশজ্ঞান, স্বাস্থ্যজ্ঞান, সমাজ নিয়ে নূন্যতম তথ্যাদি জানা থাকাও মৌলিক বা প্রাথমিক শিক্ষা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ। মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষার আরো কতগুলি বাড়তি উদ্দেশ্য আছে যেমন সমাজ এবং পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে সঠিক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির লাভ, ভাল মন্দের বা মূল্যবোধের সীমানার সাথে সঠিক

www.pathagar.com

পরিচিত সমাজ সচেতনতা, পেশাগত দক্ষতা অর্জন, কাজের প্রতি অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা সৃষ্টি, দুষ্ট বিষয়াদির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি, অপরের জন্য ভালবাসা সহানুভূতি সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়াদি। এই বিভিন্ন বিষয়াদির সবই যে আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমের ভিতর দিয়ে শেখা যায় এমনটি নয়। ছেলে মেয়েরা অনেক কিছুই শিখে বাপ-মা এবং পরিবার থেকে। শিখে সহপাঠীদের কাছে। তাছাড়াও শিখে অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ থেকে। বস্তুতঃ এই দুনিয়াতে মানুষের শিক্ষার শেষ নেই। ইসলামে যাকে বলে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিখবার সময় প্রতিজন বুদ্ধিমান মানুষের। গড়পড়তা প্রতিজন মানুষই এইভাবে শিখতে পারে দীর্ঘ সময় ব্যাপী। অবশ্য যারা স্বল্পসংখ্যক প্রায় কোন কিছুই শিখতে অপারগ (Sub Normal) তাদের কথা আলাদা। শিক্ষাকে বাস্তব জীবন বুঝবার এবং মোকাবিলা করবার প্রস্তুতি হিসাবেও গণ্য করা হয়। এটিও অন্যতম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এ কারণেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রতিজন মানুষকে কর্ম উপযোগীতার ট্রেনিং দেয়া হয়। একে কেউ কেউ বলেন, ভকেশনাল বা বৃত্তিমূলক বা পেশামূলক প্রস্তুতি বা ইংরেজীতে যাকে বলে Vocational Preparation । কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, আইনজীবী, কাঠের মিস্ত্রি, ড্রাইভার, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি ধরনের বৃত্তিতে যে বিশেষ ধরনের এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রদান এই সবই সেই Vocational Preparation! বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথেই এই ধরনের বৃত্তিমূলক অসংখ্য ক্ষেত্রে জনসম্পদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা অতি জরুরী বলে প্রতিটি সভ্য দেশেই স্বীকৃত। এইসব বৃত্তিমূলক বিষয়ে ট্রেনিং এর বিস্তারিত নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিশেষ কোন ভিন্নমত দেখা যায় না। কিন্তু শিক্ষার বিষয় শেখাতে গিয়ে যেখানে ভিন্নতা তা হল কোন সমাজের জন্য কোন রাষ্ট্রের জন্য কোন্ ধরনের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ তৈরী করা হবে তার বিস্তারিত পাঠ্যক্রম নিয়ে। পাঠ্যক্রমের বিস্তারিত নিয়ে, এই পাঠ্যক্রম প্রশাসন নিয়ে। শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে। শিক্ষকদের মন-মনন এবং বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। পাঠ্য-পুস্তকের উপস্থাপনার ধরণ নিয়ে। ভাষার ধারণ এবং ভাষার শব্দ চয়ন নিয়েও। শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাই বৃত্তিমূলক বা বৃত্তির জন্য ট্রেনিং দেয়ার সাথে সাথেই একজন মানুষকে আবার বিশেষ সমাজের সংস্কৃতির আলোকে গড়ে তোলারও চেষ্টা করা হয়। শিক্ষা যেমন সংস্কৃতি কে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি সংস্কৃতিও শিক্ষার গতি বিধি নির্ধারণ করে। তাই শিক্ষা যেমন একদিকে সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে তেমনি সামাজিক নিয়ন্ত্রণও শিক্ষা দিয়ে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। তাই বলা হয়ে থাকে যে শিক্ষা বৃহত্তর সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন বিষয়বস্তু নয়। তবে আমি আগেও যেমন বলেছি আবার বলতে চাইছি যে গণতান্ত্রিক মুক্ত বিশ্বের শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সাথে নিয়ন্ত্রিত বা অথরিটিয়ান শিক্ষা পাঠ্যক্রমের কোন কোন বিষয়ে ব্যাপক ভিন্নতা বিদ্যমান। এই ভিন্নতা যার যার সমাজ ব্যবস্থার দর্শনগত ভিত্তির জন্য। এই ভিত্তিকে রক্ষা করার জন্য। সংহত এবং মজবুত করার কারণে। ভাষা এই দর্শনগত ভিত্তি মজবুত করতে বাহন হিসাবে কাজ করে। তবে ভাষার শব্দ বিন্যাস আবার হয় দর্শন থেকে উদ্ভুত। ভাষা সংস্কৃতিরও অন্যতম বাহন। কিন্তু সংস্কৃতির সব কিছুই ভাষা ভিত্তিক নয়। মানুষের জীবিকার ধরণ,

www.pathagar.com

উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক বিন্যাস ও কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভৌগোলিক পরিবেশ, ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়াদি দেশ বিদেশের সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হিসাবে কাজ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাংলাদেশে এক বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস গত ২৫ বছরে (এ বইটি প্রকাশের সময়কাল হিসাবে-৩৫বছরে) এদেশের অনেকের বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, শুধুমাত্র, বাংলা ভাষাই বাংলাদেশের সংস্কৃতির সবকিছু। এই ভাষার বাইরে যেন এদেশের সংস্কৃতির কোন উপাদান নাই। আওয়ামীলীগারদের অব্যাহত মিথ্যাচার বিষয়টিকে আরও জটিলতর করেছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি হচ্ছে বাঙ্গালী সংস্কৃতি। এদেশের মানুষও নাকি জাতিতে বাঙ্গালী। দুর্ভাগ্যের আরও বিষয় এই যে, কুদরতে খুদা কমিশনও যেন এই বাঙ্গালীত্বের নড়বড়ে ভিত্তির উপর এদেশের মানুষের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার মূল দর্শন নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। 'বাঙ্গালী' মুল্যবোধের উপর এদেশের ভবিষ্যত সকল বংশধরদের গড়ে তুলতে সুপারিশ পেশ করেছিলেন। অথচ সত্যি বিষয় এই যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বেদ উদ্ভূত বাঙ্গালী সংস্কৃতি নয়। বাংলা ভাষী একটি মুসলমান সংস্কৃতি। কেননা, এদেশের মূল্যবোধ মূলতঃ ইসলাম ভিত্তিক।

এই পর্যায়ে প্রশ্ন করা যায় বাঙ্গালী মূল্যবোধ কি? বাঙ্গালী মূল্যবোধ কি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল্যবোধ? বাঙ্গালী মূল্যবোধের সাথে মুসলমানদের মূল্যবোধের মিল অমিল কতটুকু? বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশ কি কোনদিন একটি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশ হিসাবে দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারবে?

পিছনের ইতিহাস কিঞ্চিৎ কষ্ট করে এবং উন্মুক্ত মন নিয়ে খুঁজে দেখলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সকল অঞ্চলের কোন মুসলমানরাই নিজেদেরকে ভাষা এবং ভৌগোলিক পরিচিতির চেয়ে মুসলিম উম্মাহর এক একটি অংশ বিশেষ, এই পরিচয়ই ছিল তাদের প্রথম এবং প্রধান পরিচয়। বাংলাভাষী মুসলমানরাও এর থেকে কোন ব্যতিক্রম ছিল না। তবে হ্যাঁ ইতিহাসের এক পর্যায়ে পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমানরা নিজেদের মাতৃভাষা বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে আপতিত হয় তার ফলে নিজেরা বাঙ্গালীত্বের দাবীদার হবার কারণ খুঁজে পায়। তবে ঐ পর্যায়ে এটি নিজেদের মুসলমানিত্ব অস্বীকার করার কোন বিষয়বস্তু হয় নাই। ১৯৫৪ সালে যখন বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বা কেন্দ্রীয় ভাষা হিসাবে আইন পাশ করা হয় প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে ১৯৪৭ সালেই আইন পাশ হয়েছিল এবং তার দু'বছর পর পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রে বাংলাভাষাকে শাসনতান্ত্রিকভাবে অন্য কেন্দ্রীয় ভাষা উর্দুর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে দেয়া হয়, তারপর এই ভাবাবেগী ইস্যুটা সমাধান হয়ে গিয়েছিল। বাংলাভাষার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রে এবং প্রদেশসহ সকল পর্যায়ে বিভিন্ন বোর্ড, বাংলা একাডেমী, পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা শেখানোর ব্যবস্থাদি করা হয় তখন বাংলাভাষা নিয়ে আর নতুন ভাবাবেগ সৃষ্টি অহেতুক বৈ অন্য কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু যখন দ্বিতীয়বার দেশের

www.pathagar.com

নেতৃত্বের অকৃতকার্যতার জন্য ১৯৭১ সালে পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে ভারতের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়, তখন আবার সেই পুরানো ইস্যুকে টেনে এনে নতুন করে তৈরী করা হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত এবং তাদের এদেশীয় দোসররা বিভিন্ন ধরনের প্রপাগান্ডার মধ্যে এও বলা শুরু করে যে এই বাংলাদেশের মানুষ প্রথমে বাঙ্গালী এবং শেষেও বাঙ্গালী। মুসলমানিত্ব বলে শত শত বছর ব্যাপী যে স্বাতন্ত্র্য বা IDENTITY মুসলমানরা সযতনে সংরক্ষণ করেছিলেন তার সবই নাকি ভুল ছিল। বাঙ্গালী হলে তবেই আমাদের জাতপাত ঠিক হবে। বাঙ্গালী হলেই সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। তাই বাঙ্গালী বানাবার জন্য যত ধরনের কসরত তা আওয়ামী সরকার এদেশে চালাতে লাগল। তথাকথিত জাতীয় শাসনতন্ত্রের মূলনীতিও বস্তুতঃ দিল্লী সেভাবে ঢাকার উপর চাপিয়ে দিল। আর সেই লক্ষ্যেই আজীবন কংগ্রেসী ডঃ কুদরত-ই-খুদাকে চেয়ারম্যান করে শেখ মুজিবের সরকার জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করলেন। ডঃ খুদা একজন নামী দামী বিজ্ঞানী ছিলেন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি শিক্ষা বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তাছাড়া তার সেক্যুলার কংগ্রেসী রাজনীতিতে বিশ্বাস এবং আনুগত্য তাকে ভারত এবং আওয়ামীদের কাছে গ্রহনযোগ্য করলেও বাংলাদেশের ইসলামী ঐতিহ্য সচেতন মানুষ তার প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস রাখতে পারেনি। জনগণের সেই অবিশ্বাসের প্রমাণ তিনি রেখেছিলেন কমিশনের সুপারিশমালায়-একদিকে মাদ্রাসা মক্তব মুসলমানি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা নিয়ে তিনি যেমন কোন কিছুই সুপারিশ রাখেননি তেমনি অন্যদিকে যে রিপোর্ট তিনি এবং তার দলবল দিয়েছিলেন তা সেই ব্রিটিশ প্রবর্তিত দু'শ বছরের পুরাতন ব্যবস্থার শুধুমাত্র কিঞ্চিৎ এক অধুনা পরিশোধনের সুপারিশমালা ছিল মাত্র। ঐ সুপারিশমালা তখনকার জন্য কতটুকু যুগোপযোগী ছিল সে বিষয়ে যদি কিছু আমি না বলি তবুও এতটুকু বলা দরকার যে একটি মুসলিম জাতি সত্ত্বার নতুন যাত্রা শুরুতে ওটি তেমন কোন আহামরি কিছু ছিল না। তবে ভারতীয়করণের একটা সহায়ক বস্তুবিশেষ ছিল। এখানে বোধ করি উল্লেখ করা জরুরী যে মুসলমান জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা পার্থিব বিষয়ে অবশ্যই জোর দিবে। সেক্যুলার বা পার্থিব জ্ঞানের অবশ্যই চর্চা করবে। বস্তুগত বিষয় বিবর্জিত হবে না মুসলমানদের শিক্ষা। কিন্তু বস্তুই সবকিছু হবে না। বস্তুর সাথে সাথেই থাকবে আধ্যাত্মিক বিষয়াদির অনুশীলন বা চর্চা। বস্তু এবং আধ্যাত্ববাদকে বলা যায় Interwoven করা হয়েছে, মুসলমানদের শিক্ষায় এবং পাঠ্যক্রমে। শেখ মুজিব নিজে যদিও বাংলাদেশকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান দেশ হিসাবে শুরুতেই (১০-১-১৯৭২) উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু খুদা-কমিশন সেদিকে তিলমাত্রও ভ্রুক্ষেপ দেননি। আর এ কারনেই রিপোর্টটি বাংলাদেশে শেখ মুজিব সরকারের পতনের পর বহুলাংশে অনুপযোগী বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। নতুন করে শিক্ষা কমিটি/কমিশন গঠন করতে হয়েছিল। মাদ্রাসা শিক্ষাকে বহুলাংশে উন্নততর এবং জাতীয় শিক্ষা সংগঠন এবং প্রক্রিয়ার ভিতর নিয়ে আসা হয়েছিল। জাতীয় পর্যায় থেকে অর্থ সংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখনও অনেক কিছু করবার বাকী আছে। কিন্তু ১৯৭২-৭৫ সালে যে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দু'ব্যবস্থাকেই এ রিপোর্টের দোহাই দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল সেখানে

www.pathagar.com

সেই নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যবস্থার দিকে এদেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষাকে কেন পুনঃ ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে শেখ হাসিনার আওয়ামীলীগ সরকার? বর্তমান বিশ্বে তথাকথিত সেক্যুলার বা ধর্ম নিরপেক্ষ বা একশ'ভাগ পার্থিব বস্তুগত লেখাপড়া করানোর শিক্ষা কিছু পার্থিব উন্নতি ছাড়া মানবতার পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন করছে কি? করছে যে না তার প্রমাণ ইউরোপ, আমেরিকাসহ ঐ সব দেশই। ঐসব দেশে সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানুষে মানুষে মৌলিক সু-সম্পর্কের অনেক অবনতি হয়েছে। যেমন পরিবার প্রথা ভেঙ্গে পড়ছে। যৌনতা সাধারণ পশুত্বের সাথে মানুষের প্রায় কোন ভিন্নতা আর নাই বললেই চলে। যৌনতা পুরুষ-মেয়ে সম্পর্কের বাইরে এখন সমকামীদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে উন্নীত হয়েছে। এলকোহলিকসরা এখন সমাজের বোঝা এবং এদের সংখ্যা পশ্চিমা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ। এইডস এখন দ্রুত প্রসার লাভ করছে পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে তাদেরই অনুসারী অমুসলমান দেশে। ভারতেও এইসব পাপাচার পাপরোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে দ্রুততর গতিতে। পশ্চিমা বিশ্বে তাই মূল্যবোধের জন্য নতুন কড়াকড়ির তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবার এবং পারিবারিক সুস্থ্য মূল্যবোধের উপর জোর দেয়া শুরু হয়েছে। ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা বৃটেনসহ অনেক দেশেই আবশ্যকীয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বা হচ্ছে। আমেরিকাতেও BACK TO BASICS মূল্যবোধে ফিরে যেতে চাইছে ওদেশের অনেক সমাজবিদ, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। এইসব সুস্থ্য TREND ইসলামী মূল্যবোধের প্রাবল্যের দিকেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। আবারও মুসলমানী শিক্ষা থেকে ওরা শিক্ষা নিতে চলেছে। সত্যি কথা যে মুক্তবাজার অর্থনীতির দেশে ধর্মীয় নৈতিকতার কোন স্থান নেই। যা লাভজনক বা অর্থ উপার্জনে কৃতকার্য তাই গ্রহনযোগ্য। তাই ভাল। কিন্তু না। এই অর্থনীতির লাগামহীন দর্শনকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও নৈতিকতার মানদন্ডে বেধে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। মদ বিক্রি করে লাভজনক ব্যবসা করা পশ্চিমা দেশে নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু অনেক দেশেই যৌন ব্যবসা আইনত নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি পর্যায়ে যৌনতাকে দুই ব্যক্তির ইচ্ছাধীন করে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছে যে কারণে পশুবৎ যৌনতার ছড়াছড়ি পশ্চিমা বিশ্বে রোধ করা যায়নি। তবে AIDS হয়ত কিছু নিয়ন্ত্রণ এমনিতেই আনতে পেরেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন মুসলমান দেশ বা সমাজ কি এদিকে যেতে পারে? পারে না বলেই হুবহু পশ্চিমা সবকিছু শিক্ষাক্রমে গ্রহন করতে পারে না এবং তাই মুসলমানদের শিক্ষা হচ্ছে নিজস্ব। এর পাঠ্যক্রম যেমন হবে বস্তুগত বিষয়াদিতে সমৃদ্ধ তেমনি ধর্মীয় নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। কুদরতে খুদা কমিশনে দুর্ভাগ্যজনকবশতঃ এই ধরনের কোন সমন্বয় নেই। তাই এদেশের জন্য ওটি গ্রহনযোগ্য হতে পারে না।

০৮/০৮/১৯৯৬ইং দৈনিক দিনকাল, ১৯/০৮/১৯৯৬ইং এবং ২১/০৮/১৯৯৬ইং, দৈনিক শক্তি, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রতিহিংসার রাজনীতি দেশের ধ্বংস ডেকে আনবে

প্রতিহিংসার শেষ থাকে না। প্রতিহিংসা নুতন প্রতিহিংসা জন্ম দেয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিহিংসা গৃহযুদ্ধের উস্কানী দেয়।

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রতিহিংসা অনুপস্থিত থাকার কথা। কেননা, গণতন্ত্র হচ্ছে সহনশীলতার অপর নাম। সহনশীলতা গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত। সহনশীলতা থাকলে গণতন্ত্র টিকে থাকে। না থাকলে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার কথা বলা আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। আওয়ামী হাসিনার মাত্র পৌনে দুই মাসের 'গণতান্ত্রিক' (তারা অবশ্য গণতান্ত্রিক না বলে ঐক্যমত্যের কথাই বলেন) সরকার যেসব নমুনাদি দেশের মানুষকে দেখাচ্ছেন তাতে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের হতাশ হওয়া ছাড়া বুঝি আর কোন আশার পথ খোলা থাকছে না। শেখ হাসিনা ক্ষমতা দখলের আগে এবং অব্যবহিত পরে তারা প্রতিহিংসার রাজনীতি করবেন না বলে যে ওয়াদা করেছিলেন এবং যে ওয়াদায় অনেকে বিশ্বাসও করেছিল এবং শেখ হাসিনাকে 'একটিবার মাত্র' ক্ষমতায় বসার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেসব ওয়াদা, বিশ্বাস, আশাবাদ সবই কি এত শীগগীর ফুটা বেলুনের মত চুপসে গেল।

দেশের মানুষের যারা সচেতন অন্ততঃ আওয়ামীলীগের অতীত ইতিহাসের খবর রাখেন তারা শেখ হাসিনার ওই ধরনের ওয়াদা কোনভাবেই বিশ্বাস করেন নাই। কেননা, ১৯৬০ এর দশকে শেখ মুজিব নিয়ন্ত্রিত আওয়ামীলীগ আর যাই ছিল না ছিল, গণতান্ত্রিক ছিল না। গণতান্ত্রিক সহনশীলতা শেখ মুজিবের চরিত্রে এক দুর্লভ বস্তু ছিল। একই স্বভাবের ছিল তার কিছু অনুগত বাহিনীও এবং এই কারণেই এদেশে সেই অন্ততঃ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্ত ভিত নিতে ব্যর্থ হয়েছে। যারা শেখ মুজিবের সংসদের ভিতরে চেয়ার ছুড়ে মারার খবর রাখেন এবং স্পীকার সাহেদ আলী হত্যার (১৯৫৭) খবর জানেন তারা আওয়ামীলীগের অসহিষ্ণু মনোভাব ও চরিত্র সম্বন্ধে অস্বচ্ছ ধারণায় থাকার কথা নয়। এরপর ১৯৭১ এর মার্চ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক মীমাংসা ফর্মূলায় শেখ মুজিবের অগণতান্ত্রিক প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের জন্য দেশে গণতন্ত্র বারবার ধ্বংস হয়েছে। অবশ্য ব্যক্তি মুজিবের প্রতিহিংসার স্বভাবটা এতই জঘন্য ছিল যে তিনি খোদ একবার বলেছিলেন, দরকার হলে আমি খাল কেটে কুমীর আনব। এদেশে যেমন একটা কথা প্রচলিত আছে যে স্বামীর থালায় বিষ্ঠা খাব ঠিক যেন তেমনই। মহিলা বিষ্ঠা খেলেন তাতে তার কোন কিছু ক্ষতি হল না, কিন্তু সতীনের থালাটা তো নষ্ট করতে পারল। পাঠক, আরও একটু খেয়াল করতে পারেন, শেখ মুজিব তার রাজনীতির জন্য চাঁদা নিতেন একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি হারুন প্রমুখ থেকে এবং ভারতীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের থেকেও। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি রাজনৈতিক কারনে গালি দিতেন শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানীদের। ভারতীয় মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ী শোষকদের তিনি জীবনে একদিনও পূর্ব পাকিস্তানের শোষক বলে, যাদের শোষণই ছিল ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম, দোষারোপ করেন নাই। পাঠক খেয়াল করুন কেন? ভারতীয়দের সাথে তার ক্ষমতার প্রতিহিংসা ছিল না-

www.pathagar.com

যতসব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিহিংসার রাজনীতি শেখতন্ত্র আওয়ামীদের ঐতিহ্যগত ভাবে মজ্জাগত। কিন্তু তবুও শেখ হাসিনার বিপরীতমুখী আশ্বাসে ১২জুনের আগে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন। এখন সেই বিশ্বাস আর মানুষ রাখতে পারছে না। শুধুমাত্র আওয়ামীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপিই প্রতিদিন আওয়ামী সরকারের প্রতিহিংসা নিয়ে ফিরিস্তি দিচ্ছে না, বরং অন্য আর যারা আওয়ামীদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী নন, তারাও ওদের প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন। কে জানে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই হাসিনা ঐক্যমত্যের সরকারের টোপ দিয়েছিলেন কিনা। কিসের জন্য আওয়ামীদের এসব প্রতিহিংসা? কাদের স্বার্থে যতসব প্রতিহিংসা প্রতিহিংসার কার্যক্রম?

কার না জানার কথা যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এর পকেট থেকেই বেরোনো তালিকা বৈ অন্য কিছু নয়। জ্ঞাতমহল জানেন যে RAW এর বৃহত্তম প্লানের অংশ হিসাবেই RAW হাসিনার সরকারকে দিয়ে অনেক কিছু অপকর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিহিংসার কার্যক্রমও অপারেট করাচ্ছে। কী সে RAW এর প্লান? লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য?

বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের আর সব ছোট ছোট দেশের জন্য RAW এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন। পাকিস্তান নিয়ে যে লক্ষ্য, একই লক্ষ্য শ্রীলংকাকে নিয়ে। নেপাল, ভুটানকে নিয়েও। বাংলাদেশ নিয়েও দিল্লীর ভিন্ন কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। তবে বাংলাদেশ নিয়ে সেইসব দেশকে নিয়ে সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াও ভারতের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে। এবং তা হচ্ছে এই সব ছোট ছোট দেশকে Contain করার সাথে সাথে বাংলাদেশের মুসলিম স্বাতন্ত্র্য এবং চরিত্র নিঃশেষ করা। যেমন করা হয়েছিল আলবেনিয়ায়, বসনিয়া, চেচনিয়া বা স্পেনে। বস্তুতঃ স্পেনে মুসলিম সভ্যতা কিভাবে নিশ্চিহ্ন করেছিল পশ্চিমা বিশ্ব তার উপর গবেষণা করেছিলেন ১৯৭০ এর দশকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দীরা গান্ধী। তিনি ভারতের চারজন সর্বোচ্চ মেধার স্কলারকে দিয়ে ঐ গবেষণা করে তার ফলাফল রেখে গেছেন। RAW সেই সব ফলাফল এখন আস্তে ধীরে সুযোগ বুঝে ব্যবহার করছে। ব্যবহার করছে বাংলাদেশে কিভাবে স্পেন, আলবেনিয়া ইত্যাদি দেশের মত ইসলামি স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য ধ্বংস করা যায়। কারো কারো মনে থাকার কথা যে, মরহুম মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এই কারনেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কায়েম করতে চেয়েছিলেন। ভারতের লেজুড় বা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের আজ্ঞাবাহী গোলাম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার তিনি বিরোধিতা করেছিলেন ১৯৭০-৭১ সময়কালের যুদ্ধকালীন দিনগুলিতে পর্যন্ত। সে যাই হোক না কেন, মুসলিম ঐতিহ্যের বাংলাদেশ দিল্লীর কাছে যে গ্রহনীয় কোন বস্তু নয় তা এদেশ ১৯৭১ এ স্বাধীন হবার পরও বার বার দিল্লীই প্রমাণ করেছে। তাদের কাছে গ্রহনীয় হচ্ছে দিল্লীর পূর্ণ আজ্ঞাবাহিতা এবং বিশেষ করে তথাকথিত এক জাতীয়তা যার কিনা ভিত্তি হচ্ছে বেদ, পুরান এবং মহাভারত। পুরান ও মহাভারতের 'বং' থেকে উদ্ভুত হয়েছে তথাকথিত যে জাতীয়তা এবং যে জাতীয়তা এদেশে মুসলমানী যে কোন অতীত

www.pathagar.com

ইতিহাস ও ঐতিহ্য একটি ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে সদা উদ্যত। এগুলো সবই RAW এর সেই পরিকল্পনার অংশ বিশেষ। কেননা, বাংলাদেশে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য যতদিন সবলে টিকে থাকবে ততদিন বর্ণবাদী হিন্দু-ভারত স্বস্তি পাবে না। ভারতের সাথে দ্বন্দ্ব, বিরোধ এবং সংঘাত লেগেই থাকবে। তাই দ্বন্দ্বের অবসান চায় দিল্লী এবং RAW কোন ধরনের শান্তিপূর্ণ মহাবস্থানের জন্য নয় বরং বাংলাদেশকে বা বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষকে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শন ও আচারে Assimilate করার জন্য। পুরোপুরি খেয়ে ফেলা বা ধ্বংস করার জন্যও যদি আপাততঃ নাও হয় তবুও এখন Contain করে পরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। নিজ দেশে দ্বিতীয় বা এমনকি তৃতীয় শ্রেনীর পতিত নাগরিক বানানোর জন্য। দুভার্গজনক হলেও সত্যি বিষয় এই যে আওয়ামীলীগ কোনদিনই নিজেদের অজ্ঞতা এবং প্রতিহিংসার কারণে এই অতি সত্য ঐতিহাসিক উপলব্ধিতে পৌছতে পারে নাই। কেননা, প্রতিহিংসা মানুষের বুদ্ধি বিবেককে ধ্বংস করে দেয়। অন্ধ করে দেয় তাদের মনের চক্ষুকে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হাসিনা সরকার RAW এর পাতানো খেলা খেলছেন। তারা বাংলাদেশ শুধু বিক্রিই নয় বরং এদেশের মানুষকে দিল্লীর ব্রাহ্মণ্যবাদের পুরোপুরি গোলাম বানাতেই ওদের খেলাই খেলছেন। দেশে নুতন করে প্রতিহিংসার সুড়সুড়ি দিয়ে বৃহত্তর প্রতিহিংসার অবারিত দ্বার খুলে দিতে চাইছেন। অগণতান্ত্রিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়েছেন। মনে রাখা ভাল যে দিল্লীতে যে সরকারই প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন বাংলাদেশকে সফল আয়ত্ত্বে রাখার জন্য ওদের দলীয় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়ে পলিসির কোন হেরফের নাই। এই মূহুর্তে বাংলাদেশে একটি গৃহযুদ্ধ বাধানোর দিল্লীর খুবই প্রয়োজন। তামিল টাইগারদের দিয়ে ভারত যেমন শ্রীলংঙ্কাকে কোনরকম শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না যে তামিল ইস্যু খোদ ইন্দিরা গান্ধীই সৃষ্টি করেছিলেন-ওদেরকে উস্কিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক একই কায়দায় বাংলাদেশেও দিল্লী এই ১৯৯৬ সাল শেষ হবার আগেই একটি গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে তৎপর আছে। কেননা ১৯৯৭ সালের ১৮ই মার্চ যে ২৫ বছরের গোলামী চুক্তিটির মেয়াদকাল শেষ হবার কথা এবং যা শেষ হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন বিষয় নিয়ে দিল্লীর হস্তক্ষেপের অবকাশ বা সুযোগ কমে যায়, তাই সেই সময়ের আগেই দিল্লী এদেশে একটা গৃহযুদ্ধ বাধাতে পারলেই, তারা অতি সহজেই সেনা Intervention করতে পারে। আর সেই কারনে RAW শেখ হাসিনাকে দিয়ে প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করিয়েছেন কি না কে জানে। তবে মনে রাখা ভাল যে এই ধরনের প্রতিহিংসা দিয়ে আর যাই হোক দেশের মঙ্গল হবে না। হতে পারে না।

২৫/৮/১৯৯৬ইং, দৈনিক শক্তি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

মিথ্যা ইমেজ টিকে থাকবে না

বিতর্কিত এবং দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে ধিকৃত শেখ মুজিবের একটি মিথ্যা ইমেজ কেন নতুন করে সৃষ্টি করার ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছে আওয়ামীলীগ সরকার? এই প্রশ্নটি সম্প্রতি অনেকের মনেই উঁকি দিচ্ছে। কেন দেশের মানুষকে এই মৃত ব্যক্তিটিকে নিয়ে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে? দেশে ১৫ই আগষ্ট পালন নিয়ে সরকারী ভাবে অতি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তা দেখে যেকোন সুস্থ্যমনা মানুষের মনে ঐসব প্রশ্ন না জেগে পারে না। পারে না অন্ততঃ এই কারণে যে, দেশের অধিকাংশ মানুষ শেখ হাসিনা সরকারের তথাকথিত জাতীয় শোক দিবসে ঐদিন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেনি। করতে পারে না। শুধুমাত্র সরকারী বাড়াবাড়িতেই কিছু হয়েছে। মানুষ নিজ থেকে কোন কিছুই করেনি।

শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্ত্বা নিয়ে কারো কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। আমাদেরও নেই। কিন্তু তিনি সত্যিকার অর্থে কি ছিলেন, তা নিয়ে কোন ঐকমত্য নেই। এদেশের কিছু মানুষ তাকে একজন ভাল মানুষ বলে জানেন। এখনো যদি একটি নিরপেক্ষ সার্ভে করা যায় তাহলে নিশ্চিতভাবেই ধরা পড়বে যে, ঐ মানুষটি ভাল ছিলেন না। নিজের অন্ধ Ego ছাড়া তার কোন উন্নততর মানবিক গুণ ছিল না। ব্যক্তি পর্যায়ে যদি তার দুচারটি ভাল বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়াও যায় তাহলে যে পর্যায়ে তার আসল পরিচিতি অর্থাৎ রাজনৈতিক লেভেল সেখানে শেখ মুজিব ছিলেন অপদার্থ ও বস্তুতঃ দেশদ্রোহী মীরজাফর। দেশের মানুষের সাথে তার মোনফেকীর নজির ইতিহাসে বিরল।

এই পর্যায়ে কয়েকটি ঘটনা এবং বিষয়ের কথা আমার মনে পড়ছে। ১৯৫০-এর মাঝামাঝির কথা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। একদিন আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু যিনি কিনা কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন এবং সেই কারণে তার খুব ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন, দেখা করতে এসেছিলেন তার সাথে। এক পর্যায়ে শেখ মুজিবও সেখানে আসেন। তখন আমার সেই বন্ধুটি শেখকে দেখিয়ে বলেন, আপনার (সোহরাওয়ার্দী) পরে শেখই তো দেশের নেতা হবে-কি বলেন? সোহরাওয়ার্দী সাহেব তিল পরিমাণ সময় অপেক্ষা না করেই তড়িৎ গতিতে মুজিব সম্বন্ধে একটি ইংরেজী বাক্য বলে ফেলেন। বাক্যটি ছিল এই যে, "If Mujibur Rahman becomes the top leader of this country, God forbid, he will first destroy the country and then will destroy himself, as well." এর বাংলা তরজমা করলে এরূপ দাড়ায় "মুজিবুর রহমান যদি কোনদিন দেশের শীর্ষ নেতা হয়, তাহলে আল্লাহ না করুন, সে প্রথমে এই দেশটি ধ্বংস করবে এবং পরে সে নিজেও ধ্বংস হবে।" আমার সেই বন্ধুটি এখনও বহাল তবিয়তে, যদিও তার বয়স প্রায় ৭৪-এর কাছাকাছি-বেচেঁ আছেন। তবে এদেশে নয় লন্ডনে। কেউ যদি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের উক্ত উক্তিটি চেক করতে চান তাহলে আমি তাকে আমার সেই লন্ডনী বন্ধুটির ঠিকানাটি দিয়ে দিতে পারি। মরহুম

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিব সম্বন্ধে আরো অনেক বিশেষন ব্যবহার করতেন, যেমন-Uper chamber খালি বা মস্তিস্কবিহীন মাথার মুজিব, My Illiterate Graduate আমার নিরক্ষর গ্রাজুয়েট ইত্যাদি মজার মজার শব্দাবলী অথচ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ সমষ্টি।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই দেশ বা আমাদের দেশ বলতে ১৯৪৭ এর পর পাকিস্তানকেই বুঝাতেন। পাকিস্তানের অখন্ডতা এবং সম্মান তার কাছে ছিল এক অতি অমূল্য সম্পদ। অখন্ড পাকিস্তান ছাড়া এই উপমহাদেশের মুসলমানদের বৃহত্তর মঙ্গলের কথা তিনি কোনভাবেই চিন্তা করতেন না। তাই একবার যখন আইয়ূব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখলের পর পরই ১৯৬২ সালে তাকে বন্দী করে করাচি জেলে আটকিয়ে রাখেন তখন তিনি জেলখানা থেকে আইয়ুব খানকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

East Pakistan stands in the greatest danger of being overwhelmed and destroyed and annexed by police action if it secedes, How can anyone who is a Muslim can think of place in East Pakistan in the that of Hindu India? ..... For Muslims Pakistan is one and indivisible ..... (Dr. A.M. Chowdhury, Operation Bangladesh Entresits Final Phase, London, 1996, pp-1-2)

এই কয়েকটি বাক্যের বাংলা তরজমা এমন হতে পারে, "পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে ভারত শক্তি প্রয়োগ করে এই অঞ্চলকে পরাজিত ও ধ্বংস করার পর অঙ্গীভূত করতে পারে। কোন মুসলমান কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দু ভারতের গোলামীতে বা দয়ার উপর ছেড়ে দিতে পারে? মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান এক এবং অলংঘনীয়ভাবে অখন্ডনীয়।" পাঠক, একটু খেয়াল করে দেখুন, মরহুম সোহরাওয়ার্দী কত গভীরভাবে পাকিস্তানের অখন্ডতা কামনা করতেন। কত ভালবাসতেন সেই দেশকে। শুধু ভালবাসার কথা বলব কেন-অখন্ডতার শক্তির উপরও তার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং এই শক্তির প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন বেশী করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের জন্য। কেননা তুলনামূলকভাবে বৃহৎ ভারতের মোকাবিলায় এই অঞ্চলটি ছিল অনেক অনেক বেশী Vulnerable বা নাজুক অবস্থানে।

সে সব বিস্তারিত যাই হোক না কেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সহ পূর্ব পাকিস্তানে যেসব শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী বা গভীর প্রজ্ঞা সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা ১৯৫০-৭০ এর শুরু পর্যন্ত জীবিত বা রাজনীতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিলেন তাদের কেউই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে আস্থাবান ছিলেন না। রাজনৈতিক সাংগঠনিক একজন কর্মীর উপরে তাকে কোনরূপ স্থান দেয়া উচিত বলে ওনারা কেউই ভাবতেন না। এমনকি আমেনা বেগম, আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান এরাও মুজিবকে জাতীয় নেতা বলে মেনে নিতেন না। সালাম খান একান্তে অনেক

www.pathagar.com

বিষয়ে মুজিবকে ভৎর্সনা করতেন। একবার তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, আমি জানতাম মুজিবুর ভারতের সাথে গোপন যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানপক বিচ্ছিন্ন করতে জড়িত কিন্তু তবুও আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য তার পক্ষে উকিল হিসাবে আমার সর্বোত্তম সামর্থ্য ও মেধা কাজে লাগিয়েছিলাম। তবুও যেহেতু এগুলো সবই দেখি পাকিস্তান আমলের বিষয়াদি এবং এদেশ এখন আর পাকিস্তানের অংশ নয় এবং বাংলাদেশ নামে পূর্ব পাকিস্তনের মাটিতে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে অবস্থান নিয়েছে এবং যেহেতু শেখের এই বিষয়ে কিছু অবদান আছে স্বাধীনতা যুদ্ধে কোনকিছু প্রত্যক্ষ অবদান না থাকা সত্ত্বেও। তাই দেখা যাক তিনি বাংলাদেশের মানুষের জন্য সম্মানজনক কোন কাজটি করেছিলেন। কোন স্বাধীনতা তিনি এদেশের মানুষকে উপহার দিয়েছিলেন বলে তার সমর্থকরা দাবী করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় বিজয়ী বাহিনীর ঢাকা দখলের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার স্বাধীনযাত্রা শুরু করে বলে বাহ্যতঃ অনেকেই জানেন। এর সাড়ে তিন সপ্তাহ পর শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে এসে ১০জানুয়ারী '৭২ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসেন। বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধে তার কোন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল না। দেশের স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ তিনি আদৌ চেয়েছিলেন কিনা তা এখনো রহস্যাবৃত। কিন্তু তবুও তাকে আওয়ামীলীগাররা এক রকম God Father বানিয়ে তুললো। বাংলাদেশের তিনিই হলেন সর্বেসর্বা কর্তা। একচ্ছত্র নেতা। অবিসংবাদিত নেতা। তার কথাই হল আইন। তার আঙ্গুলি নির্দেশই চলত সবকিছু। দেশের আইন, আইন পরিষদ ইত্যাদি সবই গৌণ বিষয় হয়ে পড়ল। তার দল আওয়ামী লীগ এবং ঐ দলের নেতা, পাতি নেতা, কর্মী এবং সর্বোপরি শেখের নিকট আত্মীয়-স্বজনরা সবাই এক একজন বিরাট বিরাট ক্ষমতাধর হয়ে বসলেন। দেশে যেন এক ধরনের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কসরৎ শুরু হয়ে গিয়েছিল। শাসনতন্ত্র, নির্বাচন ইত্যাদি গণতান্ত্রিক খাতায় থাকলেও তার কোন কার্যকারিতা থাকলো না। দেশের শিক্ষা, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা সবই শুধুমাত্র দলীয়করণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না হলো পারিবারিকীকরণও। শেখের extended পরিবার এবং তাদের সথে জড়িত ব্যক্তি এবং পরিবাররা হলো দেশের হর্তা, কর্তা, মালিক, মোকতার সবকিছু। অদক্ষ দলীয়করণ প্রশাসনের হাতে নিগৃহিত হতে থাকলো সাধারণ মানুষ। অনাহার, অর্ধাহার ও দুর্ভিক্ষের হাহাকার যদিও চলছিল দেশ জুড়ে তখনই অন্যদিকে আবার শেখের 'চাটার দল' যত সব অর্থ সম্পদ লুটপাট করে রাতারতি নব্য ধনী হয়ে উঠল। তারা ধরাকে সরাজ্ঞান করতে শুরু করলো। দেশের সীমান্ত ভারতীয় পুঁজিপতি বেনিয়া মাড়োয়ারীদের কাছে খুলে দিয়ে দেশকে 'তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি'তে পরিণত করল। শেখের সরকার এরপর চালালো শ্বেত সন্ত্রাস। লাল, নীল, সাদা প্রাইভেট বাহিনীর অত্যাচারে মানুষ নির্বাক হয়ে গেল। শেখের ছেলে, ভাগ্নে, ভাই এবং যতসব গুন্ডা প্রকৃতির আত্মীয়-স্বজন যেভাবে পারল মানুষ গুম-হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি চালাতে লাগল নির্বিচারে। ১৯৭৪-৭৫ সালে নজিরবিহীন দুর্ভিক্ষে মারা গেল দেশের প্রায় ২৭লাখ দরিদ্র দুস্থ মানুষ। লাশ দাফনের জন্য অনেকেরই আত্মীয়দের খুঁজে পাওয়া গেল না। কাফন দেবার কাপড় জুটলো না অনেক মুর্দার ভাগ্যে। আঞ্জুমানে

www.pathagar.com

মুফিদুল ইসলাম নামে বেসরকারী সাহায্য সংস্থাকেই এইসব লাখ লাখ লাশের বেওয়ারিশ দাফন করতে হয়েছিল। শেখের প্রশাসনে এই সব ভয়ানক চিত্র মানুষকে বোবা বানিয়ে দিয়েছিল। আর এই সব বোবাদের অনেকেই আবার শেখের প্রাইভেট বাহিনী তথাকথিত রক্ষী বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত নির্যাতিত ও কমপক্ষে ৩৭,০০০ এর মত প্রাণও দিতে বাধ্য হয়েছিল। এইসব নিহত মানুষের অনেকেরই লাশ পর্যন্ত রক্ষীরা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের পর্যন্ত ফেরত দেয়নি।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ শেখের নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণের তিন বছরের মাথায় তিনি দেশে গণতন্ত্রের কিঞ্চিত অংশটুকুও খতম করলেন। একদলীয় দানবীয় বাকশাল প্রবর্তন করলেন। তথাকথিত দ্বিতীয় বিপ্লব এর নামে তিনি আরও এক ডিকটেটরের মত সর্বময় ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। শাসনতন্ত্রের গণতান্ত্রিক চেহারা উপড়ে ফেললেন। বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করে মারাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রন করা শুরু করলেন। দেশে ৪টি বাদে বাকী সব দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করে দিলেন। সর্বকিছু সরকারী বা শেখের খোদ নিয়ন্ত্রনে বেঁধে দিলেন। মানুষের ন্যুনতম স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকার রুদ্ধ করা হলো। দিল্লী আর মস্কো শেখকে মদদ দিল তার এই সব গণতন্ত্র বিরোধী কাজে। স্বাধীন ও মুক্ত বিশ্ব শেখের এই সব অপকর্মের জন্য তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া শুরু করল। এইসব দেশে বাংলাদেশের সম্মান বলতে আর কিছুই বাকী থাকলো না। ইতিমধ্যে ১৯৭২ সালে ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী গোলামী চুক্তি করার কারনে বাংলাদেশ দিল্লীর আশ্রিত রাজ্য হয়েছিল তা ছিল অন্য আর এক দিক।

এমনি এক অস্তিত্বকর এবং স্বাধীনতাহীন অবস্থায় যখন বাংলাদেশের মানুষ পুনঃস্বাধীনতার স্বাদ পাবার জন্য অস্থিরতায় দিন কাটাচ্ছিল, আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছিল, ঠিক তখনই এসেছিল ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের সুবহে সাদেক। শেখের জালিম শাহীর উৎখাত করা হয়েছিল এই শুভক্ষণে। দেশের মানুষ পুনঃ স্বাধীনতার স্বাদের আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল। আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করেছিল। আর সেই থেকে বিগত ২১ বছর যাবত সে ১৫ই আগষ্ট স্মরণে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ দিনটিকে নাজাত দিবস বা Day of Deliverance হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করে আসছে। ১৯৯৬ সালের ১৫ই আগষ্ট শেখ হাসিনার সরকার দিনটির ইতিহাস উল্টো খাতে চালাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আওয়ামীরা Raw-এর প্রত্যক্ষ মদদে যতই ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরানোর অপচেষ্টা করুন না কেন-ইতিহাস আবার তার নিজ গতি সঠিক পথেই চালিয়ে নিবে। শেখ মুজিবকে গোয়েবলসীয় কায়দায় যতই এদেশে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হোক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ১৫ই আগষ্ট '৭৫ শেখকে উৎখাত করে এদেশে শুধু একদলীয় একনায়কত্ববাদী শাসনেরই অবসান ঘটানো হয়নি, বরং দেশের মানুষকে দিল্লী মস্কোর দাসত্ব থেকেও মুক্ত করা হয়েছিল। সেই মুক্তির স্বাদ থেকে আওয়ামীরা যদি পুনঃ এদেশের মানুষকে বঞ্চিত করতে তৎপর হয় তাহলে মানুষ তা রুখবেই রুখবে। মুজিবের মিথ্যা ইমেজ এদেশের দেশ প্রেমিক ঈমানদাররা কোনভাবেই গ্রহন করবে না। কেননা, মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী এবং সত্যই দীর্ঘস্থায়ী।

০৯/৯/১৯৯৬ইং, দৈনিক শক্তি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা দেশের সম্ভ্রম খেয়েছেন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে ভাষণ দিতে গিয়ে তার পিতা শেখ মুজিবের হত্যার বিষয় উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়টি অনেকের মত আমার একজন আত্মীয় সংবাদ পত্রে পড়ে দেখার পর আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন- নিজের পিতার হত্যার বিষয় জাতিসংঘের ভাষনে উল্লেখ করে তিনি আমাদের দেশের জন্য কোন ভাল কাজটি করেছেন? দেশের সুনাম বাড়িয়েছেন নাকি দেশের ভাবমূর্তি অন্যের কাছে খাঁটো করেছেন? যাদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তারা কি বিষয়টি জানতেন না? জাতিসংঘে উপস্থিত সদস্য প্রতিনিধিগণ কি এতই বোকা-সোকা যে তারা মুজিবের হত্যার বিষয় না জেনে, এ নিয়ে মুজিবের হত্যার কারণাদি নিয়ে কোন কিছুই পূর্বাপর খোঁজখবর না নিয়ে শুধুমাত্র হাসিনার পিতৃহত্যার ভাবাবেগের কথাতেই বিশ্বাস করবে? শেখ মুজিব হত্যার বিষয়টি অনেক পুরানো ঘটনা নয়। ২১ বছর আগের একটি ঘটনা মাত্র। তাই মুজিবের হত্যার বিষয়টি যেমন, তেমনি যেসব অবশ্যম্ভাবী কারণে তার পতন হয়েছিল তাও দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের স্মৃতিতে তাজা থাকার কথা। বিশেষ করে জাতিসংঘে যারা এই ১৯৯৬ সালে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের স্মৃতিতে বিষয়টি পূর্বাপর যে উজ্জ্বল আছে তা ধরে নেয়া যায়। তাছাড়া যারা হয়ত কিছুটা স্মৃতিভ্রমে থাকতে পারেন তারাও হয়ত বিষয়টি আর্ন্তজাতিক মিডিয়ার ফাইল খুলে সঠিক তথ্যাদি জেনে নিতে পারেন। আর যখন ঐ সদস্যগণ শেখের উত্থান-পতনের পূর্বাপর ঘটনাদি আর্ন্তজাতিক মিডিয়া থেকে জেনে নিবেন তখন তারা পুনঃ শুধু শেখ মুজিবের জন্যই নতুন ঘৃণা পোষণ করতে বাধ্য হবেন না, বরং তারা হাসিনা এবং সেই সাথে বাংলাদেশের প্রতিও ঘৃণা ছুঁড়ে দেবেন বৈ অন্য কিছু করবেন না।

সন্দেহ নেই যে শেখ মুজিবের প্রায় বিশ্বব্যাপী ১৯৭০-৭২ সময়কালে একটি ভাল ইমেজ (IMAGE) ছিল। আরো বলা যায় যে, পশ্চিমা মিডিয়াই শেখ মুজিবকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে এক বিরাট কিছু বানিয়েছিল । তাদের সমর্থনের জন্যই বাংলাদেশ এবং মুজিব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এই পরিচিতি এবং ইমেজের সময়কাল সবচেয়ে পিক (PEAK) এ ছিল শেখ মুজিব যতদিন পশ্চিম পাকিস্তানে কারাবন্দী ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ চলছিল। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী এই দশ মাস সময়কাল। বলা যায় শেখের ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ বন্দী জীবন থেকে খালাস পেয়ে দেশে ফেরত না আসা পর্যন্ত। দেশে ফেরার পথে অর্থাৎ ইসলামবাদ থেকে লন্ডন-দিল্লী হয়ে ঢাকা ফেরার সময় থেকেই শেখের প্রতি পশ্চিমা সংবাদ সংস্থাসমূহে বা মিডিয়াম্যানদের অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। যেমন-১৯৭২ সালের ৯ই জানুয়ারী তিনি ইসলামাবাদ থেকে পিআই-এর এফ বিমানে লন্ডন পৌঁছেন তখন কিছু সাংবাদিক অনেক কিছুই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। একজন জিজ্ঞাসা করেন 'পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার নাকি মিয়ানওয়ালী জেলে আপনার সেলের সামনে আপনার জন্য কবর খুড়েছিল, এ কথা কি ঠিক? মুজিব উত্তর

www.pathagar.com

দেন 'অবশ্যই'। এই উত্তর শোনার পর ঐ একই সাংবাদিক দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন, আপনি যে পাইপ টানছেন তাতে আপনি কোন্ তামাক ব্যবহার করেন? মুজিব উত্তর দেন 'কেন এরিনমোর টোব্যাকো'। এরপর নাছোড় সাংবাদিক তৃতীয় প্রশ্ন করেন, এই টোব্যাকো আপনি সেই মফঃস্বল শহর জেলে পেতেন কোত্থেকে? মুজিব অনেকটা চটপট উত্তর দেন, কেন পাকিস্তান সরকারই খোদ আমার পাইপের জন্য এরিনমোর টোব্যাকো বিদেশ থেকে এনে সাপ্লাই করতেন। এরপর ঐ নাছোড়বান্দা সাংবাদিক চতুর্থ প্রশ্ন করেন যে, পাকিস্তান সরকার যে আপনার জন্য সেলের সাথে কবর খুড়ে রেখেছিল, তারা কেন বিশ্ববিখ্যাত এরিনমোর টোব্যাকো আপনার পাইপের জন্য এনে দিবে বলে বিশ্বাস করা যায়? কোনটা সঠিক, কবর খোড়া নাকি টোব্যাকো? তখন মুজিব ছিলেন লা জবাব। ভাবাবেগের জোরে তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারেননি। সাংবাদিক যা বুঝবার তাই বুঝেছিলেন। ভাবাবেগ দিয়ে যে মিথ্যাচার ঢাকা যায় না তা অন্তত বুদ্ধিমান যারা তারা ঠিকই বুঝেন। এরপর মুজিবের অসংখ্য মিথ্যাচার মুক্ত বিশ্বের ওয়াকফেহাল মহলের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। মুজিবের কাগুজে বাঘ ধরনের ইমেজ সবার কাছে পরিস্কার হতে থাকে। মিথ্যাচার ভাবাবেগ, দেশ শাসনে অপারগতা, গ্রাম্য মাতব্বর টাউটদের মত একগুঁয়েমি স্বভাব, চাটুকারদের আবদারীতে দেশের স্বার্থ নিয়ে যা-তা করা ভারতকে খুশি করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজান। নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য দেশের সেনাবাহিনীর বিপক্ষে রক্ষীবাহিনী সংগঠন ইত্যাদি জনবিরোধী কাজ কাম করা তিনি যখন শুরু করেন তখন দেশের ভেতরে সচেতন দেশপ্রেমিকরা যেমনি তেমনি মুক্ত বিশ্বের সচেতন মিডিয়াম্যান সবাই শেখ মুজিবকে খোলাখুলিভাবেই ধিক্কার দেয়া শুরু করেন। প্রশাসনিক অদক্ষতার ফলে দেশে সর্বগ্রাসী এক দুর্ভিক্ষ নেমে আসে ১৯৭৪ সালের শেষে। প্রায় ২৭ লাখ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায়। শুধুমাত্র প্রশাসনিক অদক্ষতার কারনেই যে ঐ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল তা দুনিয়ার মানুষ জানে। অথচ এই মুজিব দেশের দুর্ভিক্ষকে তার গলাবাজি দিয়ে ফুৎকারে উড়াবার চেষ্টা করেছিলেন প্রথম প্রথম। শেষ পর্যন্ত দেশে লঙ্গরখানা খুলবার হুকুম দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ততদিনে লাখ লাখ মানুষ অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সময়মত ঐ লঙ্গরখানা খুললে হয়ত অনেকের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হত। এই দুর্ভিক্ষের ফলে এমন মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে ঢাকার রাস্তায় মৃতদেহ কুড়িয়ে সংগ্রহ করার জন্য আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামকে গলদঘর্ম হতে হত। বেওয়ারিশ লাশ দাফনের জন্য ঐ সংগঠন আর পেরে উঠছিল না। এই সময়ের কিছু কিছু দৃশ্য আমি বিবিসি টিভিতে দেখেছিলাম। আমার মত হয়ত আরো অনেকে দেখেছেন। ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৭৪) এর বিবিসি টিভিতে দেখানো একটা দৃশ্য আমার এখনো মনে পড়ে। ঐ দিন আমি বৃটেনের ম্যানচেষ্টারে এক বাড়িতে বিকেলে দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম। আমার হোষ্ট-এর বউ তখন তার প্রেগন্যান্সীর এডভানসড ষ্টেজ-এ। বিবিসি টিভিতে আমরা যখন বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের, অনাহারে কঙ্কালসার অসংখ্য মানুষের রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহ ইত্যাদির দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলাম, তখন ঐ মহিলা গভীর কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। তার ডাক্তার স্বামী এবং আমি দুজনে মিলে তার ভাবাবেগকে সামলাতে

www.pathagar.com

পারছিলাম না। বিবিসি টিভিতে ওটি কোন বিছিন্ন ঘটনার দৃশ্য ছিল না। বৃটিশ মিডিয়ায় সেই সময় অনেক কাহিনী প্রচার হচ্ছিল এবং তার সবই ছিল শেখ মুজিবের অকর্মন্যতা, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অরাজকতা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ইত্যাদির অসংখ্য কাহিনী নিয়ে। এরপর যখন মুজিব দেশে গণতন্ত্রের কবর রচনা করে একদলীয় দানবীয় বাকশাল গঠন করেন ১৯৭৫ এর জানুয়ারীতে তখন আর মুজিবকে নিয়ে মুক্ত বিশ্বে আর কোন উৎসাহ ছিল না। ছিল শুধু করুনা এবং যৌক্তিক ঘৃণা। এই সময় এক বিবরণে খৃস্টান সাংবাদিক এন্টনি ম্যান কারেনহাস যিনি কি না ১৯৭১-৭২ সালে মুজিবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, তিনি ১৯৭৫-এ মুজিবের অবস্থা বর্ণণা করেছেন, একজন সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসাবে। শেখ মুজিবের দুঃশাসন নিয়ে অন্ততঃ পশ্চিমা বিশ্বে অসংখ্য তথ্য মজুদ আছে। সময়ে সেগুলো কেউ কেউ ভুলে গেলেও উৎসুক প্রতিজনের জন্য পুরানো ফাইল, ডকুমেন্ট, লাইব্রেরী, আরকাইভস ওসব দেশে কেউ ধ্বংস করে দেয় নি। উন্নত বিশ্বে পুরানো তথ্যাদি কীভাবে বা কত গভীর যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয় তা শেখ হাসিনার জানা না থাকতে পারে এজন্যে যে মহিলা উন্নত বিশ্ব থেকে তেমন কোন শিক্ষিত কেউ নন-কিন্তু বাস্তব এবং সত্য বিষয় হচ্ছে এই যে, শেখ মুজিবের যতসব অপকর্ম ও দুষ্কর্মের তথ্যাদি মুক্ত বিশ্বের সচেতন মানুষ একটু মেহনত করলেই ওসব পেতে পারেন। আর তা হাতে পেলে হাসিনার ভাবাবেগী হাস্যকর বাগাড়ম্বর ফুটা বেলুনের মত চুপসে যাবেই ।

কথা সংক্ষেপ করার জন্য অন্ততঃ এতটুকু বলতে হয় যে, শেখের ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা থেকে পতনের পরপরই পশ্চিমা দুনিয়ার বিভিন্ন নামী দামী পত্র-পত্রিকাগুলো কী কী ধরনের মূল্যায়ন তাকে করেছিল তা পড়ে দেখলে ঐ ব্যক্তিটির একটা সঠিক চেহারা পাওয়া যায় এবং সেই সঠিক চেহারাটি হচ্ছে এই যে তার পতনকে মুজিব নিজেই অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিলেন। তার মৃত্যু এবং পতনের জন্য তিনি নিজেই দায়ী। যে মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭১ সালে অতি ভালবেসে মরণপন যুদ্ধ করেছিলেন, তারাই অতি উৎসাহী হয়ে জীবনপন করে সেই শেখকে উৎখাত করেছিলেন। শেখের বাকশালী অটোক্র্যাসী খতম করেছিলেন। শেখের পরিবারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিলেন। দেশের মানুষ সত্যিকার স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ হলেও স্বাদ পেয়েছিলেন। কেউই শেখের জন্য প্রতিরোধে দাঁড়ায়নি। তার ২৭ হাজার সদস্যের শক্তিশালী রক্ষীবাহিনীও নয়। কেউই তার জন্য দোয়াও পড়েনি। চীন ও সউদীসহ যেসব রাষ্ট্র মুজিবের সরকারকে সাড়ে তিন বছরেও স্বীকৃতি দেয়নি তারাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের অভুত্থান পরবর্তী সরকারকে ত্বড়িত স্বীকৃতি দিয়েছিল। অস্বীকৃতি দেয়নি-কোন দেশই কোন সরকারই। ১৫ই আগস্টের ১৯৭৫ এর পরদিন লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক গার্ডিয়ান পত্রিকায় মার্টিন উলাকট এক দীর্ঘ নিবন্ধে এক পর্যায়ে মন্তব্য করেন, মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস এই যে পাকিস্তানীরা তাকে হত্যা করেনি তার দেশবাসীই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায় কত দ্রুত বাংলাদেশের আশার উচ্চশিখর থেকে হতাশা ও নৈরাজ্যের অতল গহব্বরে নেমে এসেছিল যার ফলে এই সামরিক অভুত্থান ঘটেছে।

www.pathagar.com

একই দিন অর্থ্যাৎ ১৬ই আগষ্ট লন্ডনের টাইমস (দৈনিক) এ কেভিন রেফারটি মন্তব্য করেছিলেন, "যখন লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মরেছে তখন মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচরেরা রাতারাতি ধনী হয়ে উঠেছে..... একটা পারিবারিক বাদশাহীর ভীত গড়ে তোলা হচেছ....."।

১৭ই আগষ্ট লন্ডন টাইমস- এ এন্টনি ম্যানকারেনহাস এক স্থানে মন্তব্য করেছিলেন, মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, 'চার বছরের কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চতম মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ দুশমনে পরিণত হয়েছিলেন'। ফিরিস্তি বাড়িয়ে আর কি হবে? এই সব তথ্যাদি এখন ইতিহাসের বস্তু। বাংলাদেশে হয়ত আমরা এইসব বিষয়াদি জানি না বা ভুলে গেছি বা আমাদের নিকট থেকে গোপন করা হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে সত্য সত্যই রয়ে গেছে।

এইসব তথ্য সচেতন সবাই জানেন। জাতিসংঘে উপস্থিত সদস্য প্রতিনিধিদের অনেকেই জানেন। শেখ হাসিনা যদি তাদের সবাইকে তার মিথ্যাচার না হলেও আধাসত্য বক্তব্য দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি যেমন নিজের অজ্ঞতার জাহির করেছেন বলে নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায়, তেমনি তিনি তার এই ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত বিষয়াদি উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে আলবৎ দেশের সুনাম অবশ্যই ক্ষুন্ন করেছেন। দুর্ভাগ্য এই দেশের হতভাগা মানুষ যে অজ্ঞ আর কুপমন্ডুকরাই এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছেন। আল্লাহই জানেন কবে কখন এই কুয়ার ব্যাঙদের থেকে আমরা রেহাই পাব।

০৫/১১/১৯৯৬ইং, দৈনিক সকালের খবর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

১৭৫৭ এবং ১৯৭২-এর চুক্তি দু'টির একটি পর্যালোচনা

এই সময়ে অর্থ্যাৎ অক্টোবর ১৯৯৫-এর শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ১৭৫৭ সালের মীরজাফর-ক্লাইভ চুক্তিটিতো অনেক দূরের কথা ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ সম্পাদিত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি নিয়ে বেশী আলোচনা করার প্রয়োজন তেমন একটা নেই বলে অনেকের কাছে মনে হতে পারে। যারা এই অপ্রয়োজন নিয়ে যুক্তি দেন তাদের মোদ্দাকথা হচ্ছে এই যে ঐ ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তিটি তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। এবং হারিয়ে ফেলেছে বলেই সরকারী এবং প্রধান বিরোধীদল ঐ চুক্তিটি নবায়ন না করার স্বপক্ষে তাদের নিজ দলের অঙ্গীকারের কথা ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু যেহেতু এই সব রাজনৈতিক দলকে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী খুব কমই বিশ্বাস করে, তাদের অঙ্গীকারকে মিথ্যাচারিতা বলেই জানে, সেই কারণে ঐ গোলামী চুক্তিটি নিয়ে তারা যে ওয়াদা করেছেন তা মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। তাই চুক্তিটি নিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পাবলিক ডিবেট চালু থাকা জরুরী। জরুরী এজন্য যে জনগণকে আড়াল করে পরবর্তী সরকার এই চুক্তিটি যদি নবায়ন নাও করে তবু তারা অনুরূপ কোন নতুন গোলামী চুক্তি ভারতের সাথে করবেনা এমন নিশ্চয়তা নেই। কেননা, এসব দলের ইতিহাস ওয়াদা খেলাফের ইতিহাস। এদের ইতিহাস বেঈমানীর ইতিহাস। এদের কর্মকান্ড ভারতের লেজুড়বৃত্তির এবং আজ্ঞাবাহিতার দীর্ঘ ফিরিস্তির ইতিহাস। এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় জনগণের সদা জাগ্রত অবস্থায়ই মাত্র অপমানজনক এই চুক্তিটির মত গোলামীর যে কোন অপচেষ্টার শিকল ছিড়ে ফেলতে পারে। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ও বঙ্গবন্ধু চুক্তি নামের ঐ চুক্তিটি করা হয়েছিল একটি বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৭১ এর বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই। এমন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সাধারণ দৃষ্টিতে দোষণীয় কোন বিষয় নয়। বরং দুটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যেই এমন চুক্তি হতে পারে। হয়েও থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারত প্রশ্নে বিষয়টির একটি বিশেষ প্রেক্ষিত আছে। সে প্রেক্ষিত একদিকে যেমন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অন্যদিকে তেমনি আবার বেদনাবহুল। যে অভিজ্ঞতা এবং বেদনা সুদীর্ঘ যা কিনা জন্ম দিয়েছে অবিশ্বাসেরও। ১৯৪৭ পূর্ব সময়কালে যারা কিনা পূর্ব বাংলার মানুষের নুন্যতম ন্যায় গণতান্ত্রিক অধিকারের পর্যন্ত কোন আমলই দিতে রাজী হয়নি তারাই কিনা ১৯৭১ এর নয়মাসের যুদ্ধের সময়ে আমাদের সর্বোত্তম বন্ধু হয়ে বসে ছিল। কেন? যুদ্ধ অবস্থায় এই সব বিষয় স্বাভাবিক ভাবে গৌণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ যখন পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়, ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে পাক-সেনাবাহিনীকে আত্মসর্মপনে বাধ্য করল, বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাংখার সাথে ভারতীয় শাষকগোষ্ঠীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য মিল হল না। বাংলাদেশের মানুষ চাইল সত্যিকার আজাদী কিন্তু দিল্লী ঢাকাকে তা দিতে প্রস্তুত ছিল না। বাংলাদেশকে ঐ মূহুর্তে তারা

www.pathagar.com

ভারতের একটা প্রদেশে পরিণত করতে চাইলেও তা করা গেল না। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ তখন স্বাধীনতার উল্লাসে ছিল মত্ত। এ অবস্থায় কোন মানব গোষ্ঠীর উপর বিদেশী শাসন চাপিয়ে দেয়া সম্ভব হয় না। দিল্লী এই সত্যিটি বুঝেই আস্তে ধীরে বাংলাদেশকে কব্জা করার পথ ধরে। ২৫ বছরের ঐ চুক্তিটি সেই লক্ষ্যেই সম্পাদিত হয়। বলা বাহুল্য যে, ঐ চুক্তিটি সবকিছুই ছিল না। ওটির সাথে সাথেই বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ কাঠামো, শিক্ষা বিন্যাস ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ও দিল্লীর ইচ্ছা মাফিক বিবেচিত হয়। দেশের শাসনতন্ত্রতো দিল্লীই ডিকটেট করে দেয়। বাংলাদেশ তখন তাই স্বাধীন দেশ, সরকার, পতাকা ইত্যাদি পেলেও কার্যতঃ হয়ে পড়ে দিল্লীর একটি আজ্ঞাবাহী বা করদ রাজ্যে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী এবং নামমাত্র নবাব মীর জাফর আলী খানের মাধ্যমে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক সেই অবস্থায় শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ সরকার এবং দিল্লীর মধ্যে সম্পর্কের। নবাবের অবস্থা যেমন হয়েছিল নাজুক শেখ মুজিবের সরকারের অবস্থাও ছিল তেমনি দুর্বল। দিল্লী নিয়েছিল ঢাকা রক্ষকের ভুমিকা। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী যে বাংলাদেশকে আস্তে ধীরে পুরোপুরি ভারতমুখী করতে সচেষ্ট ছিল তার কারন ছিল সবল। একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে, এই বাংলাদেশেরই মানুষ ১৯৪৭ সালের পূর্বে পাকিস্তান কায়েমে সবচেয়ে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছিল। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান প্রদেশের তুলনায় পূর্ব বাংলার বৃহত্তর সিলেট জেলা সহ মানুষ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে অনেক অধিকহার (৯৮%) পাকিস্তান কায়েমকে সমর্থন করেছিল। এদেশেই পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রনী দল মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০৬ সালে এবং এই ঢাকা শহরেই। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ তার যথা সর্বস্ব সম্পদ নিঃশেষ করে মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন করেছিলেন। সারা ভারতের গণ্যমান্য মুসলমান নেতাদের এই মুসলিম লীগে টেনে এনে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। পাকিস্তান কায়েমে যে বাংলার মানুষের এত বিপুল ত্যাগ কোরবাণী তাদেরই পরবর্তী জেনারেশন কেন কিভাবে কোন লক্ষ্যে কোন মোটিভিশনে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন হল '১৯৭১' সালে তথা অনেকের মতে ভারতীয়দের কাছে এক আর্শ্চয ও অকল্পনীয় বিষয় ছিল। তাই বাংলাদেশের মানুষ স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে ভারতমুখী হবে কি না এই নিয়ে ভারতীদের মনে যে সন্দেহ ছিল তার কারণেই ওরা বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়া বেশি যুক্তিযুক্ত ভেবেছিলেন। পঁচিশ সালা চুক্তিটি এই কৌশলেরই অন্যতম অংশ ছিল।

ঐ চুক্তির বারোটি শর্তের প্রতিটিই খারাপ এই কথা আমি বলতে পারি না। এই বারোটি শর্তের বলা যায় ৯টিই নির্দোষ। মাত্র তিনটিই হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য দুষ্ট। আর এই তিনটি হচ্ছে ৮,৯ এবং ১০ নম্বর ধারা। যাহোক এই সব বিস্তারিত আলোচনার আগে চুক্তিটি কোন্ রাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষাপটে রচিত এবং সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন। ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে যাবার পর ভারত এবং পাকিস্তান ঐতিহাসিক কারনে দুটি পরস্পর বিরোধী দেশ, জাতি এবং শত্রুতে পরিণত হয়। ১৯৪৮, ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালে এই দুই শক্তি তিন তিনটি ছোট-বড় যুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

কিন্তু বলা যায় কোন পক্ষই বিজয় বা পরাজয় কোনটিই লাভ করে নাই। তবুও তাদের বৈরীতা চলতে থাকে। এই বৈরীতার এক পর্যায়ে আসে ১৯৭১ সাল। পাকিস্তানে এসময় দেশব্যাপী এক সাধারণ নির্বাচন শেষে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে এক চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। এই উত্তেজনা এক গৃহযুদ্ধেরও সৃষ্টি করে। কেউ কেউ পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার জন্যে পদক্ষেপ নেয়। অনেকে দেশ ছেড়ে ভারতের পশ্চিম বাংলায় এবং ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে চলে যায়। কিছু পূর্ব পাকিস্তানী সেনা বিদ্রোহও করে বসে। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু নির্বাচিত সংসদ সদস্য ভারতের আশ্রয় নিয়ে একটি প্রবাসী সরকারও গঠন করে। তবে প্রধান নেতা শেখ মুজিব তার অন্যতম সহচর ডঃ কামাল হোসেনসহ স্বেচ্ছায় পাক সরকারের বন্দীত্ববরণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে অন্তরীণ থাকেন, এদিকে শেখের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন করার লক্ষ্যে একটি মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। প্রথমতঃ ভারতীয় সরকার এইসব মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। এবং তাদের কেউ কেউ দেশের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস, বোমাবাজি, গুম, খুন, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ, ব্যাংক লুট, রাস্তাঘাট ধ্বংস, পুল উড়িয়ে দেয়া, থানা লুট, আর্মিদের উপর গেরিলা আক্রমণ ইত্যাদি সন্ত্রাসী কাজ করতে থাকে। ১৯৭১ এর জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় নয় মাস ভারত বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের নিজস্ব লোক দিয়ে এসব বিধ্বংসী কাজ চালায়। এরপর তারা সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে এক জোট বাঁধে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশের নামে একটি আশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। বাংলাদেশকে এক আশ্রিত ও আজ্ঞাবহ রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে দিল্লী প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীনকে দিয়ে এক দাসখত লিখে নেয়। এই দাসখত বহুকাল বা এতদিন প্রায় ২৫ বছর যাবত গোপন থাকলেও এখন জানাজানি হয়ে গেছে। এবং সেই দাসখত ছিল ৭ দফা সম্বলিত। এই সাতদফা চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে দিল্লী যেন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সেনা পাঠিয়ে জবরদখল করে, পাকিস্তান আর্মিকে ওখান থেকে বন্দী করে এবং তার সরকারকে বাংলাদেশে বসিয়ে দেয়। দিল্লী এইসব রিস্ক নিতে অত সহজে রাজী হয়নি। তবে অবশেষে রাজি হয়েছিল এমন শর্তে যে, বাংলাদেশ যেন দিল্লীর সম্পূর্ণ আজ্ঞাবাহী একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই লক্ষ্যে ভারতের চাপিয়ে দেয়া শর্তাদির মধ্যে ছিল যেমন বাংলাদেশের কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী থাকবে না। বাংলাকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সাথে হুবহু সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক নীতি ইত্যাদি সবকিছু হবে ভারতীয় জাতীয় নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এতদিনে অনেকেরই জানা কথা এই যে, তাজুদ্দীন যখন অনেকটা এককভাবে এই দাসখত দিল্লীর কাছে লিখে দিয়েছিলেন তার খবর জানার সাথে সাথেই বাংলাদেশ সরকারের তখনকার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম মানসিক আঘাত পেয়ে মুর্ছা গিয়েছিলেন। তিনি যে মুর্ছা গিয়েছিলেন সে বিষয়টি অন্যতম বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের সাবেক সদস্য ও এরশাদ সরকারের একসময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে পস্টাপস্টিই বলে দিয়েছিলেন। যা হোক দিল্লী তাদের কথা রেখেছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে তারা এখানে তাদের

www.pathagar.com

সর্বাত্মক সেনা আক্রমন করেছিল। পাকিস্তান আর্মির পূর্ব কমান্ডারকে পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসর্মপণ করতে বাধ্য করেছিল এবং তাজুদ্দীনগংদের বাংলাদেশ সরকারের গদিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব ছিলেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী বা অন্তরীণ। এরপর যখন শেখ মুজিবকে পাক সরকার বাংলাদেশে স্বাধীন মানুষ হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি ঐ ৭ দফা চুক্তির বিষয় জানতে পেরে নাকি তাজুদ্দিনকে বলেছিলেন, তাজুদ্দিন তুমি দেশটি দিল্লীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছো? শেখের এই ধরনের মন্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করা এখন মুশকিল। কেননা তারা কেউই এখন আর বেঁচে নেই। তবে শেখকে বিশ্বাস করা যায় না একারনে যে তিনি আবার এর কিছুদিন পর ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ ইন্দিরার সাথে যে ২৫ বছরের চুক্তিটি করেছিলেন তা ঐ ৭দফা চুক্তি থেকে ভাল বা সম্মানজনক কিছু বলে দেখা যায় না। বরং এটিও বাংলাদেশের জন্য শুধুমাত্র অসম্মানজনকই নয় বরং দিল্লীর কাছে এদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব বন্ধক রাখার একটি সুক্ষ্ম দলিল মাত্র। চুক্তিটির সবগুলো শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই নিবন্ধটি অনেক দীর্ঘ হতে পারে। অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে। অনেক শ্রোতার/পাঠকের ধৈর্য্যচুত্যি ঘটতে পারে। তাই ওই চুক্তিটির যে তিনটি শর্ত বা আর্টিকেল বিশেষভাবে বাংলাদেশের জন্যে অপমানজনক এবং সার্বভৌমত্ব হরণ করার অস্ত্র বিশেষ-অর্থাৎ ৮, ৯, এবং ১০ ধারা তিনটির উল্লেখ এবং আলোচনা করা যাক।

ধারা ৮, ৯ এবং ১০ এই তিনটিই নীচে পরপর উল্লেখ করা হল।

Article 8: In accordance with the this of friendship existing between the two countries each of the High Contracting parties solemnly declares that it shall not enter into or participate in any military alliance directed against the other party. 'Each of the High contracting parties shall retrain from any aggression against the other party and shall not allow the use of its territory for committing any act that may cause military damage to or constitute a threat to the security of the other high contracting party.'

Article 9: Each of the high contracting parties shall retrain from giving any assistance to any third party taking part in an armed conflict against the other party. In case of either party is attacked or threatened with attack, the high contracting parties shall immediately enter into mutual consultations in order to take appropriate effective measures to eliminate the threat and thus ensure the peace and security of their countries.'

www.pathagar.com

Article 10: Each of the High Contracting parties solemnly declaires that it shall not undertake any commitment security or open toward one or more states which may be incompatible with the present treaty. (Ref-Pam-India-Ans-288817: SOAS-London).

পাঠক, আশা করি এই তিনটি ধারার বাংলা তরজমা নিজেরাই করে নিতে পারবেন। এখানে আমি শুধুমাত্র এই তিনটি ধারার মূল বা ক্রিটিক্যাল বিষয়ের উপরই আলোচনা ও মন্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। তার আগে অবশ্য দু'টি বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা দরকার। প্রথমটি হচ্ছে ভারতের মোকাবিলায় বাংলাদেশের ভৌগলিক সামরিক দুর্বলতা এবং অপরটি হচ্ছে বাংলাদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের ভারতের কাছে নিজেদের অসহায় অবস্থায় সারেন্ডার করার মনোভাব।

বাংলাদেশ যে ১৯৭১ উত্তরকালে ভৌগলিক কারণে ভারতের মোকাবিলায় খুবই দুর্বল এবং অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েছে তা বোধ করি জ্ঞানী-গুনী মানুষকে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। বৃহৎ ভারতের তুলনায় এবং চারদিক দিয়ে ভারত পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ এবং জনসংখ্যার চাপের কারণে বাংলাদেশ বস্তুত এক লিলিপুট ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ১৯৭১ সালে ভারত শুধুমাত্র পাকিস্তানকেই 'কাট টু সাইজ' করে নাই। বাংলাদেশকে করেছে 'কাট টু অলমোস্ট নো এনটিটি'। যদি কোন এনটিটি ভারত বাংলাদেশকে মনে করে তা হচ্ছে ভারতের বৃহৎ এনটিটির একটা অঙ্গ এনটিটি। এর প্রমাণ তাজুদ্দীনের ৭ দফা চুক্তি। জেনারেল আরোরার কাছে জেনারেল ওসমানীর কাছে নয়। পাক ইষ্টার্ন কমান্ডের জেনারেল নিয়াজীর সারেন্ডার করার দলিল, ১৯৭১ উত্তর সরকারের সম্পূর্ণ ভারতমুখী নীতি অনুসরণ, ২৫ বছরের চুক্তিটির অন্ততঃ এই তিনটি শর্ত ইত্যাদি।

অন্য বিষয়টি যা উল্লেখের দাবী রাখে তা হচ্ছে এই যে, ইসলামাবাদ সরকার নাকি পূর্ব পাকিস্তানকে পুনঃদখল করার জন্য তাদের টার্গেট সেট করেছিল যার কারনে নাকি ঢাকার সরকার ঐ পঁচিশ সালা প্রতিরক্ষামূলক চুক্তিটি দীল্লির সাথে অনেক কাকুতি মিনতি করে সম্পাদন করেছিলেন। বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা এবং সাবেক পাক পি এফ এস এর সদস্য হালে এক ইংরেজী নিবন্ধে সেই কথাই উল্লেখ করেছেন। এই চুক্তিটি যে হাস্যকর তা একটু চিন্তা করলেই ধরা পড়ে। কেননা, এটা এতদিনে সকলের জানার কথা যে, পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বিশেষ প্রভাবশালী মহল ১৯৭১ এর গৃহযুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই চাইছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হোক। এই কারনে তাদেরই কারসাজিতে যেমন ২৫শে মার্চের '৭১ এর আত্মঘাতী এবং দেশধ্বংসী আর্মি অপারেশন চালানো হয়েছিল, তেমনি আবার ডিসেম্বরের তিন তারিখ থেকে ১৬ তারিখ '৭১ পর্যন্ত যুদ্ধ যুদ্ধ এক ছেলে খেলা চালানো হয়েছিল। বস্তুতঃ এই চৌদ্দ দিন পশ্চিম পাকিস্তানের সেনারা কোন প্রতিরোধ যুদ্ধই করে নাই। তারা বরং বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উইথড্র করে ঢাকায় জমায়েত হয়ে আত্মসর্মপন করার জন্য সময় ক্ষেপন করছিল। অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান যে পশ্চিম পাকিস্তানের এক বোঝা ছিল, তা

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানের তথ্যাভিজ্ঞ মহলের সবাই জানতেন। তাই তারা পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা হয়ে যাবার জন্য যা কিছু সম্ভব সব কিছুই করেছিলেন। এমতাবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে পুনঃ দখল করার কথা যারা বলেন তারা যে সত্য বলেননা বা অযথা ভূত দেখেন, তা বোধ করি আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। এই অপ্রয়োজনীয় কাজটি না করে বরং এখন প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করা যাক। এই ধারা তিনটির মূলকথায় ফিরে আসা যাক।

আট নম্বর ধারার মূল বক্তব্য বা সারকথা হচ্ছে এই যে, চুক্তিকারী দুটি পক্ষের মধ্যে কেউই অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোন চুক্তিতে প্রবেশ বা অংশগ্রহন করবে না। নয় নম্বর শর্তের প্রধান বিষয় হচ্ছে এই যে, কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধে কোন তৃতীয় শক্তির জন্য কোন পক্ষই কোনরূপ সামরিক সাহায্য করবে না। দশ নম্বর শর্তটি আরও কঠিন। এখানে শর্ত দেয়া আছে যে এই চুক্তির সাথে সামাঞ্জস্যহীন এমন কোন বিষয়ে অন্য আর কোন দেশের সাথেই কোনরূপ গোপন বা প্রকাশ্য ওয়াদা কেউই করতে পারবে না।

পাঠক, এই সব শর্তের মূল বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন। আর তা করলে দেখতে পাবেন যে বাংলাদেশ এবং ভারত কোনভাবেই আলাদা দুটি সত্তা নয়। আলাদা দেশ নয়। এদের সার্বভৌমত্ব এক এবং অভিন্ন। একজনের ইচ্ছাই অন্য আর একজনের ইচ্ছা। একজনের ভালই অন্য আর একজনের ভাল। একজনের মন্দ বা অকল্যাণ অন্য আর একজনের অকল্যাণ। একজনের শত্রু অন্য আর একজনের শত্রু। একজনের মিত্র যেন অন্য আর একজনের মিত্র। আর যদি এমনি হবে তাহলে তারা আলাদা দুটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ও জাতি হয় কিভাবে? দেশে দেশে জাতিতে বন্ধুত বা শত্রুতা কি চিরন্তন হয়? হতে পারে? পারে না। কিন্তু ঐ চুক্তিটিতে তাই করার চেষ্টা আছে। চুক্তিটির শুরুতেই একই লক্ষ্যে বলা আছে : Inspired by common ideas of peace, secularism, democracy, socialism and naitonalism ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের সাথে সাধারণ আদর্শ বলতে বাংলাদেশের কোনকালেই প্রায় কোন কিছুই ছিল না। সমাজতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদির মিলের তো প্রশ্নই উঠে না। এমনকি শান্তি ও গণতন্ত্রের মত বিষয়েও দুইয়ের হুবহু মিল ছিল এমন কথা জোর দিয়ে বলা মুশকিল। বস্তুতঃ ভারতীয় জাতীয়তা, স্বাতন্ত্র্য চেতনা, ঐতিহ্য, ইত্যাদির সাথে বাংলার মানুষের মিলের চেয়ে গরমিল অনেক বেশী। আর এই গরমিলের জন্যই ১৯৪৭ সালে এ দেশের মানুষ আলাদা রাষ্ট্র তৈরী করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক সামরিক কারনাদি সেই স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করে নাই। বরং তাকে আরো সুদৃঢ় এবং সংহত করেছে। এই সংহতির কারনেই ১৯৪৭ সালে যে আন্তর্জাতিক ভৌগলিক সীমারেখা চিহ্নিত ও কায়েম করা হয়েছিল সেই সীমারেখাই বাংলাদেশের সীমারেখা। এই সীমারেখা যতদিন অটুট থাকবে এবং যা চিরদিন থাকবে-ততদিন ভারতীয়দের সাথে Common ideas বা সাধারণ আদর্শেব অনুপ্রেরণাবোধের প্রশ্ন তোলা বাতুলতা মাত্র। ওরা ভারতীয় আর আমরা

www.pathagar.com

বাংলাদেশী। ওদের মূল প্রেরণা বৈদিক এবং বাংলাদেশের তাওহীদ। এই পার্থক্যের ধারা নতুন কিছু নয় বরং হাজার বছর কালের পুরাতন।

সত্যি কথা এই যে, ভারত ১৯৭১ এর নয়মাসের যুদ্ধের পরপরই অর্থাৎ ১৭ই ডিসেম্বর '৭১ থেকে ভারত বাংলাদেশের বন্ধু নয় বরং শত্রুতে পরিণত হওয়া শুরু করে। ভারতকে ছেড়ে বাংলাদেশ নতুন বন্ধুর সন্ধান করতে থাকে। কেননা, বৃহৎ ভারতের মোকাবেলায় ক্ষুদ্র বাংলাদেশের নিজের সার্বভৌমত্ব টিকে রাখার সংগ্রাম এক কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ভারত এই বিষয়টি বুঝতে পেরেই ভারতের একান্ত মানুষ মুজিবকে দিয়ে ঐ ২৫শালা চুক্তিটি সই করিয়ে নেয়। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বন্ধকী শর্তে দীল্লি আটক করে রাখে। আর এই কারনে আট, নয় এবং দশ নম্বর শর্ত তিনটির অবতারণা। আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের শত্রুদের বাংলাদেশেরও চিরস্থায়ী শত্রু বানিয়ে রাখার এমন জঘন্য অপচেষ্টা সমসাময়িক সভ্য জাতিসমূহের ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

তবে হ্যাঁ, এমনটি এদেশে আর একবার ঘটেছিল। এখন থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে। সঠিক করে বলতে হলে, দুইশত আটত্রিশ বছর আগে ১৭৫৭ সালে।

বাংলা বিহার উড়িষ্যা একত্রে তখন ছিল একটি স্বাধীন দেশ। নবাব সিরাজদ্দৌলা তখন সবেমাত্র নবাব হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়ী বেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছিলেন এদেশে। নবাব দুষ্টমতির জন্য শায়েস্তা করতে তৎপর ছিলেন। এতে কোম্পানী অসন্তুষ্ট হয়ে নবাবকে উৎখাতের চেষ্টায় তৎপর ছিল। তারা নবাবেরই প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খানকে হাত করে নিয়েছিলেন। এবং নবাবকে সরিয়ে দিয়ে তাকে নবাবের গদীতে বসানোর জন্য ব্যবস্থাদি পাকাপোক্ত করেছিলেন। নবাবের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মীর জাফর আলী খান বরং কোম্পানীর পক্ষে সমর্থন করেন। তার জন্য এক চুক্তিনামাও পূর্বাহ্নে তারা সই করিয়ে নিয়েছিলেন। এই চুক্তিনামাটি ১১৭০ হিজরী সালের ১৫ই রমজান মীরজাফর আলী খান সই করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন যে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল তার মাত্র অল্প কিছুদিন আগে ওটি চুড়ান্ত হয়েছিল। বারোটি মূল শর্তের (তবে পরে ১৩ নম্বর একটি শর্ত যোগ করা হয়েছিল) মধ্যে ২নং ধারাটি এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। এই ধারাটিতে (মূল দলিল ছিল ফার্সী ভাষায় এবং এর ইংরেজী অনুবাদ আছে Charles Stewart এর History of Bengal বইয়ের ৫৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় বলা আছে যে, 'The enemies of the English are my enemies, whether they be Indians or Europeans'-অর্থ্যাৎ 'ইংরেজদের শত্রুরা ভারতীয় বা ইউরোপীয়ান যারাই হোকনা কেন তারাই আমার শত্রু'।

পাঠক লক্ষ্য করুন, শেখ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির যে তিনটি ধারা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে এই মীর-জাফর আলী খান এবং কোম্পানীর ক্লাইভ-ওয়াটসন প্রমুখের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটির এই ধারাটির কত বা কি পরিমান হুবহু মিল। শেখ-ইন্দিরা চুক্তিতে যেমন ভারতের শত্রুরাই বাংলাদেশের শত্রু বলে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয়া হয়েছে, মীরজাফর-ক্লাইভ চুক্তিতেও ব্রিটিশের শত্রুদেরকে মীরজাফরের একেবারে

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত শত্রু হিসাবে ধরে নেয়ার জন্য চুক্তিনামায় শর্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস স্বাক্ষী যে, মীরজাফর আলী খান নিজের ক্ষমতার লোভে যে অধীনতামূলক চুক্তি করেছিলেন, সেই পথ ধরেই এদেশে বিদেশী বেনিয়া ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হয়েছিল। সেই ব্রিটিশদের থেকে রেহাই পেতে এদেশের মানুষের ১৯০ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সীমাহীন ত্যাগ আর জান-মাল কোরবানী করতে হয়েছিল আমাদের পূর্ব-পুরুষদের। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান কায়েমের মধ্য দিয়েই মাত্র আমরা ওদের থেকে আজাদ হয়েছিলাম। সেই পাকিস্তানে আমরা থাকি নাই সেটা বড় বিষয় নয়, বড় কথা হচ্ছে এই যে আমরা ভারতীয়দের অনুগৃহীত হয়েও থাকতে রাজী নই। আমরা আমাদের মতই থাকবো। আলাদা স্বাধীন এবং যথার্থ অর্থে স্বার্বভৌম হয়েই থাকতে চাই। অখন্ড ভারতের অংশ হিসাবে বাংলাদেশের মানুষ কোনদিনই বাঁচবার কথা ভাবে না। ভাবতে পারেও না। এবং তাই পঁচিশসালা চুক্তিটির অবসান চায়। এই কারনেই এই চুক্তির বিরুদ্ধে এদেশের জনমত সোচ্চার। আর এই জনমতের দৃঢ়তার কথা বুঝতে পেরেই অতি জানা ভারতপন্থী দলটি পর্যন্ত এই চুক্তিটি মেয়াদ শেষে (১৯৯৭ এর মার্চ) নবায়ন না করার স্বপক্ষে ওয়াদা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমি আগে যেমনটি বলেছি এটি নবায়ন না করে যদি এর অনুরূপ আর কোন চুক্তি প্রতিষ্ঠিত সরকার করে ফেলে তার বিরুদ্ধে জনগনের জন্য একইভাবে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন আছে। ২৫ সালা চুক্তিটির মারাত্মক আরও যে শর্তটি নিয়ে এদেশের মানুষ সঙ্গত কারনেই ভয় পায়, তা হচ্ছে, এই কারনে যে প্রতিষ্ঠিত সরকার ছুতানাতা অজুহাতে "Effective measure" নিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী এদেশে ডেকে পাঠাতে পারে। এবং তা যদি করে তার চুড়ান্ত ফলাফল যাই হোক না কেন, সাময়িকভাবে এদেশের ভারতবিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ধরে নিয়ে নির্বিচারে হত্যা করতে ওরা দ্বিধাবোধ করবে না-যেমন কিনা ভারতীয় হানাদার সেনারা করছে প্রায় ৪৮ বছর যাবৎ ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে। ১৭৫৭ সালের সেই ঘৃণ্য চুক্তির শর্তে মীরজাফর কোম্পানীর সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সিরাজের পরাজয় অবধারিত করেছিল। নিজে ক্লাইভদের পুতুল নবাব সেজেছিল। ১৯৭২ সালের চুক্তিটির শেখ মুজিবকে একইভাবে ভারত তার পুতুলে পরিণত করেছিল। ভায়োলেন্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মাত্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট শেখের ডিকটেটরশীপকে খতম করার পরই মাত্র দিল্লীর গোলামী থেকে আজাদ হবার একটা শুভ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তবে যেহেতু এর পরের কোন সরকারই ভারতের মোকাবিলায় দৃঢ়ভাবে দাড়াতে পারে নাই, তাই ঐ গোলামী চুক্তিটি বাতিল করার শক্তি বা সাহস কোনটিই পায় নাই তারা কেউই। তবুও জনমতের চাপে বৃহৎ-ছোট নির্বিশেষে প্রতিটি দলই ভারতের সাথে এই চুক্তিটি মেয়াদশেষে আর নতুন করে নবায়ন না করার অন্ততঃ প্রকাশ্য ওয়াদা করেছে। এমনকি যারা ১৯৭২ সালে এই চুক্তিটি করার জন্য পূর্ণ দায়ী তারাও এটি নবায়ন করবে না বলে ওয়াদা করেছে। অবশ্য ওদের ওয়াদা কতটুকু বিশ্বাস করা যায় তা অন্য কথা। একটি দৃষ্টিকোন থেকে ১৯৭২ সালের চুক্তিটি ১৭৫৭ এর চুক্তিটি থেকে আরও ভয়ংকর এবং সুদুরপ্রসারী কুফলে পূর্ণ। এবং সেটি হচ্ছে এটির ২৫ বছর মেয়াদকাল এবং নবায়নযোগ্যতার

www.pathagar.com

সংযোজিত ধারা। ভারত তার দূর-লক্ষ্যেই এই দীর্ঘ মেয়াদকাল বেধে দিয়েছিল। এই পঁচিশ বছর সময়কালে তারা একটি নতুন জেনারেশনকে তাদের ভাবধারায় গড়ে তোলার পর একটি নতুন প্রেক্ষিত নিয়ে হাজির করার দূরভিসন্ধি ছিল। এবং তা স্পষ্টতঃ এই যে, বাংলাদেশের নতুন জেনারেশন যেন ভাবতে শুরু করে যে তারাও আলাদা কিছু নয় বরং বৃহৎ ভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই লক্ষ্যেই ভারত ১৯৭২ সালে ঐ চুক্তিটি করেই চুপ করে বসে থাকে নাই। তারা এদেশের শিক্ষা কারিকুলামে সূক্ষ্মভাবে ভারতীয় আদর্শকে সবকিছুর উর্দ্ধে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়। ইতিমধ্যেই দেশের নতুন প্রজন্মের একটি অংশ নিজেদের আলাদা ভাবতে চাইছে না। ভারতেরই একটি অংশ ভাবছে নিজেদের। শুধু তাই না, এদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শিক্ষক ইতিমধ্যেই ভারতীয় হয়ে পড়েছে। নজীরবিহীনভাবে ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে বর্তমান বাংলাদেশেরই মেধাবী প্রায় এক লাখ ছাত্র-ছাত্রী। তারা যদি বা যখন দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হবে তখন তারা কিভাবে চিন্তা করবে? একটু ভেবে দেখুন। ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তিটির এই মারাত্মক জেনারেশন গ্যাপ সৃষ্টির দিকটি নিয়ে আমরা কি আদৌ সচেতন আছি?

১৯৭১ সালের সামরিক বিজয়ের পর থেকে আজতক গত ২৪ বছরে ভারত এদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের কায়েমী স্বার্থবাদী গ্রুপ সৃষ্টি করেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে ছাড়াও আমলাতন্ত্রে, ব্যবসায়ী মহলে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশী ভারতীয়দের সংখ্যা এখন কম না। অর্থনীতিতে ভারতীয় বান্দীবাজারে পরিণত হয়েছে এদেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভারতীয় অর্থনীতি এবং মুক্তবাজারের কারনে বেশুমার বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশে আসা সত্ত্বেও বলা যায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এসব ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে ভারত এযাবৎ ব্যয় করেছে এদেশে শত শত কোটি টাকা। আর এতসব কিছুর উপরে আছে এদেশে চিরস্থায়ীভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করে রাখার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রম। কেননা, ভারত জানে যে, বর্তমান চুক্তিটির মেয়াদ ১৯৯৭ সালের ১৮ই মার্চ শেষ হবার আগেই বাংলাদেশে তাদের একটি মরণ কামড় দেয়া একান্ত প্রয়োজন। আর সেই মরণ কামড় এর লক্ষ্যেই ১৯৯৫ এর শেষে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা কে জানে!

নভেম্বর-১৯৯৬ইং, ঢাকা, বাংলাদেশ। (সংযুক্তি দেখুন)

সংযুক্তি-ক ঃ

Treaty Of
Friendship, Cooperation and Peace
Between
The People's Republic of Bangladesh
And
The Republic of India

www.pathagar.com

Treaty of Friendship, Cooperation and Peace between the People's Republic of Bangladesh and the Republic of India

Inspired by common ideals of peace, secularism, democracy, socialism and nationalism.

Having struggled together for the realisation of these ideals and cemented ties of friendship through blood and sacrifices which led to the triumphant emergence of a free, sovereign and independent Bangladesh.

Determined to maintain fraternal and good neighbourly relation and transform their border into a border of eternal peace and friendship.

Adhering firmly to the basic tenets of non-alignment, peaceful co-existence, mutual cooperation, non-interference in internal affairs and respect for territorial integrity and sovereignty.

Determined to safeguard peace, stability and security and to promote progress of their respective countries through all possible avenues of mutual cooperation.

Determined further to expand and strengthen the existing relations of friendship between them.

Convinced that the further development of friendship and cocperation meets the national interests of both states as well as the interests of lasting peace in Asia and the world.

Resolved to contribute to strengthening world peace and security and to make efforts to bring about a relaxation of international tension and the final elimination of vestiges of colonialism, racialism and imperialism.

Convinced that in the present day world international problems can be solved only through cooperation and not through conflict or confrontation.

Reaffirming their determination to follow the aims and principles of the United Nations Charter.

The People's Republic of Bangladesh, on the one hand, and the Reopublic of India, on the other, have decided to conclude the present Treaty.

Article 1

The High Contracting Parties, inspired by the ideals for which their respective peoples struggled and made sacrifices together, solemnly declare that there shall be lasting peace and friendship between their two countries and their peoples. Each side shall respect the independence, sovereignty and territorial

www.pathagar.com

integrity of the other and refrain from interfering in the internal affairs of the other side.
The High Contracting Parties shall further develop and strengthen the relations of friendship, good-neighbourliness and all-round cooperation existing between them on the basis of the above-mentioned principles as well as the principles of equality and mutual benefit.

Article 2
Being guided by their devotion to the principle of equality of all peoples and states irrespective of race or creed the High Contracting Parties condemn colonialism and racialism in all their forms and manifestations and reaffirm their determination to strive for their final and complete climination.
The High Contracting Parties shall cooperate with other states in achieving these aims and support the just aspirations of peoples in their struggle against colonialism and racial discrimination and for their national liberation.

Article 3
The High Contracting Parties reaffim their faith in the policy of non-alignment and peaceful co-existenec, as important factors for easing tension in the world, maintaining international peace and security and strengthening national sovereignty and independence.

Article 4
The High Contracting Parties shall maintain regular contacts with each other on major international problems affecting the interests of both States, through meetings and exchanges of views at all levels.

Article 5
The High Contracting Parties shall continue to strengthen and widen their mutually advantageous and all-round cooperation in the economic, scientific and technical fields. The two countries shall develop mutual cooperation in the fields of trade, transport and communications between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and the most favoured nation principle.

www.pathagar.com

Article 6
The High Contracting Parties further agree to make joint studies and take joint action in the fields of flood control, river basin development and the development of hydro-electric power and irrigation.

Article 7
The High Contracting Parties shall promote relations in the fields of art, literature, education, culture, sports and health.

Article 8
In accordance with the ties of friendship existing between the two countries each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not center into or participate in any military alliance directed against the other Party.
Each of the High Contracting Parties shall refrain from any aggression against the other Party and shall not allow the use of its territory for committing any act that may cause military damage to or constitute a threat to the security of the other High Contracting Party.

Article 9
Each of the High Contracting Parties shall refrain from giving any assistance to any third party taking part in an armed conflict against the other Party. In case either Party is attacked or threatened with attack, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consultaions in order to take appropriate effective measures to eliminate the threat and thus ensure the peace and security of their countries.

Article 10
Each of the High Contracing Parties solemnly declares that it shall not undertake any commitment, secret or open toward one or more states, which may be incompatible with the present Treaty.

Article 11
The present Treaty is signed for a term of twenty-five years and shall be subject to renewal by mutual agreement of the High Contracting Parties.
The Treaty shall come into force with immediate effect from the date of its signature.

www.pathagar.com

Article 12
Any differences in interpreting any article or articles of the present Treaty that may arise between the High Contracting Parties shall be settled on a bilateral basis by peaceful means in a spirit of matual respect and understanding.
Done in Dacca on the Nineteenth Day of March, Nineteen Hundred and Seventy-two.

(Sheikh Mujibur Rahman)
Prime Minister
For the people's Republic of Bangladesh

(Indira Gandhi)
Prime Minister
For the Republic of India

Pam. India AS: School of Oriental and African Studies (SOAS), Univresity of London, UK.

সংযুক্তি-খ ঃ

Appendix, No. XIII (referred to in p.522.)
Treaty with Jaffier Ally Khan.

*I swear, by God and the Prophet of God, to abide by the terms of this treaty whilst I have life.
Meer Mahomed Jaffier Khan Behauder
Servant of King Aalum Geer.
Treaty made with the Admiral, and colonel Clive (Sabut Jung Behauder) Governor Drake and Mr. Walls.

Aritcle I
Whatever articles were agreed upon in the time of peace with the Nabab, Serajah Dowla Monsoor ul Mulk Shah Kuly Khan Behauder, Hybut Jung, I agree to comply with.
Aritcle II
The enemies of the English are my enemies, whether they be Indians or Europens.

---

* These words were written in his own hand.

www.pathagar.com

Article III
All the Effects and Factories, belonging to the French, in the province of Bengal (the Paradise of nations) and Bahar, and Orissa, shall remain in the possession of the English, nor will I ever allow them any more to settle in the Three Provinces.

Aritcle IV
In consideration of the losses which the English Company have sustained, by the capture and plunder of Calcutta, by the Nabob and the charges occasioned by the maintenance of the forces, I will give them one crore of rupees.

Article V
For the effects plundered from the English inhabitants of Calcutta, I agree to give fifty lacks of rupees.

Article VI
For the effects plundered from the Gentoos, Mussulmen, and other subjects of Calcutta, twenty lacks of rupees shall be given.

Article VII
For the effects plundered from the Armenian inhabitants of Calcutta, I will give the sum of seven lacks of rupees. The distribution of the sums, allotted the natives, English inhabitants, Gentoos, and Mussulmen, shall be left to the Admiral and Colonel Clive (Sabut Jung Behauder) and the rest of the Council, to be disposed of by them to whom they think proper.

Article VIII
Within the ditch, which surrounds the borders of Calcutta, are tracts of land belonging to several Zemindars; besides this, I will grant the English Company six hundred yards without the ditch.

Article IX
All the laying to the South of Calcutta, as for as Culpee, shall be under the Zemindarry of the English Company, and all the officers of those parts shall be under their jurisdiction. The revenues to be paid by them (the company) in the same manner with other Zemindars.

www.pathagar.com

Article X
Whenever I demand the English assistance, I will be at the charge of the maintenance of them.

Article XI
I will not erect any new fortifications below hughley, near the River Ganges.

Article XII
As soon as I am established in the Government of three Provinces, the aforesaid sums shall be faithfully paid.

Dated the 15th Ramzan, in the 4th Year of the Reign. A.D. 1757. A.H. 1170.

Additional Article- ARTICLE XIII

On condition that Meer Jaffier Khan Behauder shall solemnly ratify, confirm by oath, and execute all the above Articles, which the underwritten, on belalf of the Honourable East India Company, do declaring on the Holy Gospels, and before God, that we will assist Meer Jaffier Khan Behauder with all our force, to obtain the Soubahship of the province of Bengal, Bahar, and Orissa; and further, that we will assist him to the utmost, against all his enemies whatever, as soon as he calls upon us for that end; provided that he, on his coming to be Nabob, shall fulfil the aforesaid Articles.

(N.B. The last two numbers are taken from a Book, entitled "Treaties and Grants from the Country Powers to the East-India Company", Published A.D 1774)

Ref : Charles Stewart, History of Bengal (SOAS FC 81.61), 1813, PP.547 & 548.

www.pathagar.com

কোন্ হত্যার বিচার হবে আর কোন্ হত্যার বিচার এড়ানো যাবে

আওয়ামীলীগ ইতিবাচক কিছু করার বা দেশের বৃহত্তম মঙ্গলের জন্য তারা বিগত বছরগুলোতে কিছু করতে না পারলেও দেশের মানুষকে তারা একটার পর একটা সংকটে ঠেলে দিয়েছিলেন বারবার এবং এই ধরনের সংকট নিজেরা সৃষ্টি করে তার দোষ আবার চাপিয়ে দিয়েছিলেন বারবার নন্দঘোষের ঘাড়ে। নিজেরাই দুর্নীতি করে আবার নিজেরাই ভাল মানুষ সাজতে চায়। আওয়ামীলীগের সকল কুকর্ম-অপকর্ম দেশধ্বংসী যতসব কার্যকলাপ নিয়ে আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। শুধু সাম্প্রতিক একটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করতে চাই।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন অর্থাৎ ধিকৃত পলাশী দিবসে 'র' এর পূর্ণ মদদে ঢাকায় দেশের ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসার পর শেখ হাসিনার আওয়ামীলীগ সরকার এ যাবৎ কোন ইতিবাচক কাজই করতে পারেননি। যা করেছেন তার সবই বাগাড়ম্বর। ফলে দেশের সাধারন খেটে খাওয়া মানুষের কষ্ট বেড়েই চলেছে। কেননা, বাজার দর লাগামহীন ঘোড়ার মত উর্ধ্বগতিতে ছুটেই চলেছে। অন্যদিকে আবার কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত পন্য যেমন-পাট তার সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। গ্রাম থেকে লাখ লাখ মানুষ কাজের আশায় যৎকিঞ্চিত আয়ের সম্ভাবনা চিন্তা করে শহর-বন্দরে ছুটে আসছে। ঢাকা শহরে বস্তিবাসীর সংখ্যা সর্বোচ্চ রেকর্ড ৩৫ লাখ এ পৌঁছেছে। প্রতিদিন এ সংখ্যা বাড়ছে। দেশে চলছে এক দিকে আওয়ামী সন্ত্রাস অন্যদিকে নীরব দুর্ভিক্ষ। এসব অতি জরুরী মানবিক সমস্যার দিকে হাসিনা সরকারের কোন সঠিক পদক্ষেপ নেই। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বর এর হত্যাকান্ডের বিচার করা। তাদের ফাঁসিতে ঝুলানো। নিরপরাধ যে কোন মানুষের হত্যা অবশ্যই খারাপ বিষয়। এমন হত্যার অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু তা হতে হবে আইনসম্মত উপায়ে। আইনকে শ্রদ্ধা করে। আইনকে পাশ কেটে নয়। আইনকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে নয়। আইনের অপব্যবহার করে নয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে নয়।

১৯৭৫এর ১৫-ই আগষ্ট বা তার সূত্র ধরে ক্যু, কাউন্টার ক্যু ইত্যাদি যা কিছু হয়েছিল বা তার মধ্যে যে সব ইত্যাদি হয়েছিল তার সবই কি সাধারন অর্থে হত্যা ছিল? সফল সামরিক অভ্যূত্থানের কোন হত্যাকে কি হত্যা বলা যায়? এই তথাকথিত হত্যার কি বিচার করার অবকাশ আছে দেশী বা আন্তর্জাতিক কোন আইনে? সফল সামরিক অভ্যূত্থান বা গণঅভ্যূত্থান যাই বলুন না কেন, তা কি শুধুমাত্র ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে হয়েছিল না কি আরও অনেক দেশে হয়েছে এবং যে সব দেশে সফল অভ্যূত্থান হয়েছে তার জন্য কি অভ্যূত্থানকারীদের পরে বিচার করা হয়েছিল?

www.pathagar.com

ইংল্যান্ডের উদাহরণ থেকেই কথা বলা শুরু করা যাক। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন চার্লস-১। তার রাজত্বকালে কিছু সংখ্যক (চারজন) সংসদ সদস্য বা হাউস অব কমনস্-এর এমপি রাজার কিছু দুর্নাম বা বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। রাজা চার্লস-১ সেই খবর জানার পর ঘোড়ায় চড়ে সংসদে ঢুকে ঐ চারজন এমপিকে পাকড়াও করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাজার দুর্ভাগ্য ছিল এই যে, ঐ এমপিরা আগাম সে খবর জানতে পেরে পিছনের কোন এক দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে পাকড়াও থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন এবং এই নিয়ে পরে সংসদে কথা উঠে। রাজাকে সংসদ অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। শুধু তাই নয়। রাজা চার্লস-১ কে পরে সংসদের সামনে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। এটি ছিল ১৬৪৯ সালের ঘটনা। অর্থ্যাৎ আজ থেকে প্রায় ৩৪৭ বছর আগের বিষয়। আমরা নাকি বৃটিশ ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্রের সূত্রপাত করেছিলাম ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রে। তা বহুলাংশে সঠিক। এবং যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী শেখ মুজিব যে ১৩ মিনিটের একটি সেসনের মধ্যদিয়ে সেই সংসদের অবমাননা করে একদলীয় দানব বাকশাল কায়েম করেছিলেন, তার জন্য মুজিবের কি কোন শাস্তি পাওনা হয়েছিল? রাজা চার্লস থেকে তা ভিন্ন কিছু কি? চালর্স-এর সেই হত্যার কি বিগত সাড়ে তিনশত বছরে কেউ বিচার দাবী করেছেন? নাকি তিনি ধিকৃত রাজা হিসাবে ইংল্যান্ডে চিহ্নিত হয়ে আছেন? লন্ডনের সংসদ ভবনের সামনে যে পাথর মূর্তি আজতক দাঁড়িয়ে আছে তা তার ধিকৃত স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য। অন্য কোন কারনে নয়। তাকে বেঈমান হিসাবে স্মরন করে রাখার জন্য। মহান কোন কিছু হিসাবে নয়।

এর পর ধরা যাক ফরাসী বিপ্লবের রাজা লুই ষোল (১৬)-এবং তার রানীসহ গিলোটিনে হত্যা হবার ঘটনা। বিপ্লবের এক পর্যায়ে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী বিপ্লবী জনগণ কর্তৃক অত্যাচারী ঐ রাজা এবং রাণী নিহত হয়। এরপর স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো হয়। ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। আজ থেকে প্রায় দুইশত তিন বছর আগে ঐ বিপ্লবী হত্যাকান্ড ঘটেছিল ফ্রান্সে। এই দুই শতাব্দীকাল সময়ে কেউ কি ওদের হত্যাকান্ডের বিচার চেয়েছে? ওটিকে কি কোন দেশ প্রেমিক ফরাসী রাজা বা রাণী হত্যা বলে নিন্দা করেছে বা করে? করেনি। করার প্রশ্নও উঠে নাই।

কেননা বিপ্লব বিপ্লবই। বিপ্লবে যা ঘটে তা আপনা আপনিই আইন সিদ্ধ হয়। আর একেই আন্তর্জাতিক আইনের ভাষায় বলে Factum valet যার মূল কথা হচ্ছে এই যে, 'ক্যু ইজ ক্রাইম ইফ ইট ফেইলস' (Coup D Etat is crime if it fails?) ক্যু বিফল হলে তা দোষণীয়, সফল হলে দোষণীয় নয়। সফল হলে বরং তা এমনিতেই ক্ষমতা এবং আইনের উৎস হয়। সফল ক্যুকে ভিত্তি করে আইন রচিত হলে তা সিদ্ধ হয়। অসিদ্ধ হয় না। আন্তর্জাতিক আইনের এই মেক্সিম অনুযায়ী বাংলাদেশে সংঘটিত ১৯৭৫এর ১৫ই আগষ্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থানের সামরিক বেসামরিক নেতাদের কোন ধরনের বিচার করার প্রশ্ন শুধু অবান্তরই নয়-আইনতঃ অসিদ্ধও বটে। এবং হাসিনার সরকার যদি পেশী শক্তির বলে তেমন কিছু করার চেষ্টা করেন-যা তারা করতে চাচ্ছেন তাহলে তারাও সময়ে কাঠগড়ায় দাড়াতে বাধ্য হবেন। ন্যায় বিচার কারো একার এক্সক্লুসিভ

www.pathagar.com

প্রিরোগেটিভ নয়। ক্ষমতার হাত বদলের সাথে সাথেই ফরিয়াদীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়ানো অসম্ভব কিছু নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি উদাহরন বোধ করি দেওয়া যায়। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইয়ুব খান যখন পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল এবং সামরিক আইন জারি করেন তখন কোর্টের স্বাভাবিক ফান্‌কশনিং শুরু হবার সাথে সাথেই মার্শাল 'ল' এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটা মামলা হয়েছিল। কিন্তু সেই মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। প্রধান বিচারপতি মুনীর মার্শাল 'ল' জারিকে বৈধ বলে রায় দিয়েছিলেন। সেই রায়ের বিস্তারিত আইনগত ভিত্তির চেয়েও বড় কথা ছিল এই যে সেই মার্শাল 'ল' সারা দেশে এবং বিশেষ করে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত প্রদেশ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নিরংকুশ জনসমর্থন পেয়েছিল। অনেকের মনে থাকার কথা যে, একইভাবে বাংলাদেশে নিরংকুশ জনসমর্থন পেয়েছিল কর্ণেল ফারুক, রশীদ পরিচালিত ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের মুজিব উৎখাতের সফল সামরিক অভ্যুত্থান। আমরা ভুলে যাইনি যে, ঐ সময় শেখ মুজিব ছিলেন দেশের সবচেয়ে নিন্দিত ব্যক্তি। আর অন্যদিকে ফারুক, রশীদ ছিলেন দেশের সবচেয়ে প্রশংসিত সিপাহসালার। মুজিবের জন্য কেউই স্বাভাবিক মৃতদের জন্য নির্ধারিত দোয়া ইন্নলিল্লাহি পড়েননি, কিন্তু ফারুক-রশীদের জন্য প্রাণ ভরে আল্লাহ্‌র কাছে অনেকেই মোনাজাত করেছেন। মুজিবকে লোকজন বলেছে গাদ্দার-মীরজাফর আর ফারুক-রশীদকে প্রশংসা করেছে দেশের রক্ষাকর্তা হিসেবে।

মনে রাখা ভাল যে, এই ফারুক-রশীদরা ১৯৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য তাদের ত্যাগের তুলনায় মুজিব বরং মিয়ানওয়ালী জেলে বসে আয়েশ করে এরিনমোর তামাক টেনেছেন-তার পাইপে। এই জানবাজ সেনা অফিসার মুক্তিযোদ্ধাদের '৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের সফল অভ্যুত্থানকে গুটিকতেকের বিছিন্ন ঘটনা বলে তুচ্ছ করে দেখতে চাইলে অনেকেই তো একথাও বলতে পারেন যে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বস্তুতঃ ভারতীয়দের এবং তাদের সেনাবাহিনীর পাকিস্তান ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার এক ষড়যন্ত্রেরই বাস্তব ফসল। আমরা কি এই যুক্তি মানতে পারি? না পারলে, যেমন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, তেমনি '৭৫এর ১৫ই আগষ্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থান। ৭১-এ যেমন অনেক হত্যা হয়েছে তেমনি একই ভাবে কিছু হয়েছে '৭৫-এও। এ হত্যা-পরিবর্তন বা বিপ্লব যাই বলুন তারই বাই প্রডাক্ট। আমি যেমন আগেও বলেছি নিরপরাধ যে কোন হত্যা নিন্দনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু অপরাধীদের এবং ক্ষমতায় বসে অত্যাচারীদের হত হবার ইতিহাস শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং সারা দুনিয়াব্যাপী বাস্তব ঘটনা।

তারপরও কথা আছে। '৭৫এর ১৫ই আগষ্ট ক্যুর নেতারা কেউই মুজিবকে হত্যা করতে চাননি। তাকে তারা এরাডিকেট বা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে যখন শেখের বাড়ির ভেতর থেকে ক্যু এর অংশগ্রহনকারী সেনাদের উপর কে বা কারা অবিরাম গুলি বর্ষণ শুরু করে এবং তার ফলে সেনাদের অনেকে মারা যায়, তখনই কেবল ক্যুকারীদের পক্ষ থেকে গুলি করা হয়। এইভাবেই ঘটনাটির বিবরণ দেশ-বিদেশের অনেক পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছে এবং আমরা বিস্তারিত জানতে পেরেছি। এই গুলি পাল্টা গুলিতে অনেকেই মারা গেছেন। শেখ মুজিবও সেভাবেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে '৭৫এর ক্যু এবং কাউন্টার

www.pathagar.com

ক্যু-এর ফলে যারা নিহত হয়েছেন তারা কোন অর্থেই সাধারণ হত্যা নন। এসব হত্যাকে হত্যা বলা এবং সেসব হত্যার বিচার করার বাগাড়ম্বর করা পর্বতের মুষিক প্রসব ছাড়া অন্য কিছুই হবে না। এসব অযথা বিষয়ে শক্তি, সময়, অর্থ অপচয় অহেতুক বৈ অন্য কিছুই হতে পারে না। যারা আইনের শাসনের দোহাই দিয়ে এসব অকাজ করতে উদ্যত হয়েছেন তারা আইনের শাসনের মূলনীতিগুলো সঠিক ভাবে বুঝেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ উস্কানিতে মহান দেশ প্রেমিক সিরাজ শিকদারের হত্যা, কিংবা একই ভাবে ঢাকা কারাগারে ফজলূল কাদের চৌধুরীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা এবং শেখের ইঙ্গিতে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক ১৯৭২-৭৫ সময়কালে রক্ষী বাহিনী কর্তৃক হত্যা ইত্যাদির দায় দায়িত্ব তিনি এড়াবেন কোন যুক্তিতে?

আর এই কারনেই কিনা, বর্তমান সংসদের মাননীয় স্পীকার ও বর্তমান আওয়ামীলীগ এর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী যখন আশির দশকে জাতীয় পার্টি করতেন এবং এরশাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন তার একটি বক্তব্য স্মরণযোগ্য। ১৯৮৯ সালে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সিলেট শহরের এক জনসভায় বলেছিলেন "শেখ মুজিবকে যদি একশ'বার ও হত্যা করা হয় তবুও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তখন শেখ মুজিবকে হত্যা করা ছিল জাতীয় কর্তব্য" (সুগন্ধা, ১ নভেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ ২৫)। যেমনটা আমি শুরুতেই বলেছি এবং প্রায় সবাই জানেন যে আওয়ামীলীগার এবং তাদের মেন্টররা গোয়েবলসকেও হার মানাতে পেরেছে এবং তাই অনেক সত্য বিষয় যা তাদের স্বার্থে স্যুট করেনা তা অনেক মানুষ আজ মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে। তেমনি একটি ঘটনা কিছু কিছু ওয়াকিফহাল মহল জানলেও তা প্রকাশ্যে বলা হয় না এবং তা ইতিহাসের পাতায় বাংলাদেশে হারিয়ে যেতে বসেছে। এবং তা হলো এই যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে স্বেচ্ছায় পাকিস্তান আর্মির কাছে সারেন্ডার করার আগে তিনি নাকি ওদের বলেছিলেন যে, তারা যেন তাকে নিয়ে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আটকিয়ে রাখে এবং তারপর কিছু কাল এদেশের অতিবিপ্লবীদের শায়েস্তা এবং ঠান্ডা করার পর তাকে ছেড়ে দেয়। তখন এক পরিবর্তিত শান্ত পরিবেশে ফেরত এসে তিনি দেশ চালাতে পারবেন। আমি এই ধরনের বক্তব্য যাদের কাছে শুনেছি তারা ঐ সময়কালে তদানীন্তন সরকারের এবং শেখ মুজিবের অতি ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। শুধু তাই নয় তাদের কেউ কেউ এ বিষয়টি কোন না কোন নিবন্ধে লিখে দেয়ার জন্য আমাকে বার বার অনুরোধ করেছেন। মুজিবের এই বক্তব্য যদি সত্য হয় এবং যা বিশ্বাস করার একশত একটা কারন আছে, তাহলে ১৯৭১ এর অগণিত হত্যার দায়িত্ব থেকে অনেকের মত শেখ মুজিবও কি রেহাই পেতে পারেন? পারেন না। অতএব '৭৫ এর হত্যার বিচারের প্রশ্ন উঠলে অন্যসব হত্যারও বিচারের প্রশ্ন এড়ানো যাবে না। বিচার এড়ানো যাবে না সিরাজ শিকদার হত্যা সহ রক্ষী বাহিনীর হাতে হত হাজার হাজার দেশপ্রেমিক কর্মীর হত্যার বিচার, তাদের বিচারও হতে হবে, হবেই।

২৮/১১/১৯৯৬ইং, দৈনিক আজকের প্রত্যাশা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

অন্নদাবাবু ও বিবিসি-এর কাছে নিবেদন

বিবিসি বাংলা বিভাগ তাদের কার্যক্রম সম্প্রতি অনেক সম্প্রসারিত করেছেন। ২৪ ঘন্টায় ৪ বার বাংলায় অনুষ্ঠান প্রচার করেন। কয়েক বছর আগে ছিল দু'বার ১৫-২০ মিনিটের অনুষ্ঠান। বছর দু'য়েক হলো ৩ বার। আর এখন হচ্ছে আধাঘন্টা করে ৪ বার। খবর ছাড়াও অনুষ্ঠানের ধরনাদির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার মাঝে বিশেষ প্রতিবেদন নামে সত্যি সত্যিই একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রচার করা হচ্ছে প্রতি সপ্তাহেই এবং এ প্রতিবেদনে যে কারনেই হোক বাংলাদেশ প্রাধান্য পায়। অনেক এমন প্রোগ্রাম শুনে আমার মনে হয়েছে যে, বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা চেতনাকে 'বিশেষ' খাতে বা লক্ষ্যে পরিচালনা করার জন্যই এসব অনেক প্রোগ্রাম করা হয়। আমার আরো স্পষ্ট করে বলতে ইচ্ছে করছে যে, বাংলাদেশী মানুষের মগজ ধোলাই বা BRAIN WASH করার জন্যই বুঝি এসব প্রোগ্রাম করা হয়। সন্দেহ নেই যে, যে কোন মিডিয়া বা গণমাধ্যমই এমন কাজ করতে পারে। করেও। কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে বিবিসি যেন একটু বাড়াবাড়ি করে। শুধু তাইই নয়। তারা যেন বাংলাদেশের মানুষকে পূর্ণ 'বাঙালী' দর্শনে মগজ ধোলাই করতে চায়। করতে চায় বাংলাদেশের মানুষকে মুসলমানিত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। চায় ভারত ও বাংলা বিভাগকে অযৌক্তিক প্রমাণ করতে এবং আরো চায় এ কাজটির জন্যে যতসব দোষ 'নন্দঘোষের' ঘাড়ে চাপাতে। লক্ষ্যনীয় যে, এসব কাজে বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ বুদ্ধিজীবীদের তারা যেমন ব্যবহার করে, তেমনি করে পশ্চিম বাংলার বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবিদের।

২৬শে ডিসেম্বর রাত সাড়ে দশটায় এবং পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় এক পুনঃপ্রচার অনুষ্ঠানে বিবিসি বাংলা বিভাগ বাবু অন্নদা শংকর রায়-এর এক সাক্ষাৎকার প্রচার করেন। তার সাক্ষাৎকার দিয়েই অনুষ্ঠানটি তারা শেষ করেন। অর্থাৎ তার বক্তব্যকে ফোকাস করার জন্যই ছিল অনুষ্ঠানটির বিশেষ প্রতিবেদনটি। যদিও অনুষ্ঠানটির অন্য বিষয়াদি ছিল ভারত ও পাকিস্তানের পঞ্চাশ বছর পূর্তি নিয়ে। বাবু অন্নদা শংকর রায় ভারত ও বাংলা ভাগের দুঃখজনক স্মৃতিচারণ করেছেন। গভীর মনোবেদনা নিয়েই তা করেছেন। তিনি বলেছেন আমরা ভাই ভাই এক ছিলাম, তাই ভাল ছিলাম। ভাগ হয়ে ভাল হয়নি। আমরা সবাই বাঙালী ছিলাম। দেশ ভাগ করে আমাদের আলাদা আলাদা করেছে। কিন্তু আমাদের সত্যিকার ভাগ করতে পারেনি। যেমন পারেনি নজরুলকে এবং আমাকেও। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলার বাঙালী আবার মিলিত হয়ে অখন্ড বঙ্গ প্রতিষ্ঠা করবে এ কথা তিনি উচ্চারণ না করলেও আকারে ইঙ্গিতে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ১৯৪৭-এর পার্টিশন যেহেতু 'ভুল' ছিল, তাই তা রহিত করা দরকার। তসলিমা নাছরিন যেমন বলেছিলেন 'রাবার দিয়ে দু' বাংলার সীমারেখা মুছে ফেলতে হবে। ঠিক যেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি। Two great men think alike নাকি 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' কোনটা সঠিক কে বলবে!

www.pathagar.com

সেই একই স্মৃতিচারণ বক্তব্যে অন্নদা আরো বলেছেন যে, দেশ বিভাগের পঞ্চাশ বছর পর তিনি ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে ঢাকায় এসে সেই দুঃখজনক Nostalgia-এর কথা বাংলাদেশের মানুষকে বলে গেছেন। ১৯৪৭-এর 'মহাভুলের' সংশোধন করার জন্য আকারে-ইঙ্গিতে অযাচিত উপদেশও খয়রাত করেছেন। বৃদ্ধ 'দাদা' এর উপদেশ কি ফেলনা হতে পারে? বাংলাদেশের বাঙালীরা নিশ্চয়ই ভাবে গদ গদ হয়েছেন। পশ্চিম বাংলার 'দাদা'দের সাথে কত কম সময়ে একাকার হওয়া যায় তা নিয়ে হয়তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের এই মনোবাঞ্ছনা পূরণের জন্য অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন হয়তো।

বাংলাদেশের বিশেষ মার্কা বাঙালীরা যাই করতে চান না কেন, এদেশের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কিন্তু 'অন্নদা' দেবদুলাল প্রমুখ দাদাদের 'শেখ ফরিদ' জপমালায় ভুলবে বলে মনে হয় না। কেননা, ওদের বগলে যে ইট সে কথা এদেশের নতুন প্রজন্ম না জানলেও বুড়োরা তা ভাল করেই জানেন। জানেন এ কারনে যে, তারা অন্নদার মতই কালের সাক্ষী। ১৯৪৭-এর বিভক্তির কারনাদি এখানকার বুড়োরা ভুলে যাননি। ইতিহাসের টুকিটাকি এখনো আমাদের অনেকেরই সুস্পষ্ট মনে আছে। সুস্পষ্ট আরো মনে আছে পূর্ব বাংলার মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের সকল মানুষের চরম বঞ্চনার বিষয়াদি। আর অন্যদিকে বৃটিশ বেনিয়া এবং তাদের দোসর উঁচু বর্ণের হিন্দু জমিদারদের শোষন ও নীপিড়নের বাস্তব ঘটনাদি। যেমনটি কিনা দেখা যায় বর্তমানে বৃদ্ধ বয়সে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে তার ছেলের সাথে বসবাসরত অন্যতম জমিদার হিন্দু নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর ভাষায়। পূর্ব বাংলার কিশোরগঞ্জের সেই নীরদবাবু তার এক স্মৃতিচারণে লিখেছেন, আমাদের মুসলমান প্রজাদের আমরা Domestic Animal বা গৃহপালিত পশুর ন্যায় বিবেচনা করতাম। তাঁর এই মন্তব্য ১৯৪৭ পূর্ব সময়কালে পূর্ব বাংলার সাধারণ মুসলমানদের প্রতি হিন্দু জমিদারদের শোষন-নিপীড়ন এবং দুর্ব্যবহারের একটি বাস্তব চিত্রের বর্ণনা মাত্র। ১৯৪৭-এর বিভাগ যদিও মুসলিম লীগ, জিন্নাহ বা মুসলমান নেতারা করতে চাননি বরং বস্তুতঃ কংগ্রেস এবং তাদের নেতা গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ প্রমূখরাই ১৯৪৭ পরবর্তী কোন এক সময়ে পূর্ব বাংলাকে পুনঃগ্রাস করার লক্ষ্যেই সে বিভাগ সাময়িক কারনে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, 'পোকায় খাওয়া' পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ সৃষ্টি করতে শেষ দিকে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, এসব বাস্তব ঘটনাদি এদেশের বুড়োরা এখনো পুরোপুরি ভুলে যায়নি। অন্নদারা কি এসব অস্বীকার করতে পারেন? নাকি এদেশের আমরা ক্ষীণ স্মৃতির মানুষ, তিনি বা তারা হয়তো ভাবছেন যে ওসব করুণ স্মৃতি আমরা সবই কি ভুলে গেছি? না, সবাই সবকিছু ভুলে যায়নি। কেবিনেট মিশন প্ল্যান যা কিনা অবিভক্ত ভারত/বাংলার অক্ষুন্ন রাখার সর্বশেষ ফর্মুলা মুসলিম লীগ ও জিন্নাহ গ্রহণ করেছিলেন-ক, খ,ও গ জোনের এক স্বাধীন ভারতীয় ফেডারেশন গঠন প্রায় চূড়ান্ত রূপ নিতে যাচ্ছিল-তা তো কংগ্রেস এবং নেহেরুরাই বানচাল করেছিলেন। নেহেরু তার ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই বোম্বাই-এর সংবাদ সম্মেলনে উদ্ভুত অগণতান্ত্রিক বক্তব্য দিয়ে এ সর্বভারতীয় একক অখন্ড ভারত

www.pathagar.com

প্ল্যানের পিঠে অপ্রত্যাশিত ছুরিকাঘাত করেছিলেন। কেবিনেট মিশন প্ল্যান ফর্মুলাকে নিজের মত করে বিশ্লেষনের দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি জোনের ফেডারেশন ব্যবস্থাকে শেষ বারের মত ধ্বংস করেছিলেন। কই তখন তো অন্নদারা ভিন্ন কিছু বলেননি। নেহেরুকে তিরস্কার করেননি। এমনকি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ যিনি কি না নেহেরুর বাল্যবন্ধু এবং আজীবন রাজনৈতিক 'কমরেড' ছিলেন, তিনিও তো তখন এটি চেপে গিয়েছিলেন। চেপে যে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন তার India Wins Freedom বই-এর পূর্ণ Version এ। ১৯৫৮-এর ভার্সনে তিনি তা গোপন রেখেছেন। ১৯৮৮- এর পূর্ণ ভার্সনে তা প্রকাশিত হয়েছে। নেহেরুকে তিনি গোপনে নিন্দা করেছেন। ততদিনে কাম শেষ। ভারত-বাংলা-পাঞ্জাব ভাগ হয়ে শেষ হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান আলাদা আলাদা ভাবে বৃটিশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে। অতএব দেশ বিভাগের Nostalgia যখন কাউকে পেয়ে বসে, তখন তার এ বিষয়ও সবার কাছে বলা উচিত যে, কেন কি কারণে সেই ১৯৪৭ এর বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। কারাই বা দোষী ও দায়ী ছিল সেই বিভক্তির জন্যে? সেই বৃটিশ আমলে যদি উঁচু বর্ণের ও ধনিক শ্রেনীর হিন্দুরা মুসলমানদের বিপক্ষে বৃটিশের চরম দালালী না করতেন তাহলে যেমন মুসলিম লীগ এবং জিন্নাহর পাকিস্তান আন্দোলন করার প্রয়োজন হত না, তেমনি প্রয়োজন হত না ভারত-বাংলা-পাঞ্জাব বিভক্তিরও। কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে কংগ্রেসী হিন্দুরা শেষ পর্যন্ত যে Point of no return এ হাজির করেছিল, তাতে বিভক্তি ছাড়া আর বিকল্প কিছুই বাকী ছিল না। অবশ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কিংবা সুভাষ চন্দ্র বসুর মত উদার হিন্দু নেতারা ১৯৪০-৪৭ সময়কালে যদি বেঁচে এবং ভারতের রাজনীতিতে উপস্থিত থাকতে পারতেন এবং যাদের সাথে জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগের তেমন কোন দ্বন্দ্ব ছিল না, তাহলে ভিন্ন কথা হতো। ইতিহাস ভিন্ন হতো। তবে সংকীর্ণমনা অন্যসব হিন্দু ও কংগ্রেসী নেতারাই যে চিত্তরঞ্জন দাসের ১৯২৫ সালে অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছিল এবং সুভাষ বসুকে চল্লিশ দশকের শুরুতে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল তা নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসবিদরা নিঃসংকোচে স্বীকার করবেন। অন্নদা বাবুরা কি বলছেন, আমি আন্দাজ করা থেকে এখন বরং বিরত থাকলাম। তবুও একটি কথা বলি। আমরা পিন্ডি ছেড়েছি। আপনারা কি দিল্লি থেকে আলাদা হবেন? স্বাধীন হবেন? এক বাঙালী হবেন? এরপর অনেক ঘটনাদি আছে। বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা গঠনের বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর ফর্মুলা এবং যে প্লানে জিন্নাহর অনুমতি ও অনুমোদন ছিল, তাও বানচাল করেছেন গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ ধরনের অতি বাঙালী শিক্ষাবিদ, রাজনীতিকরাই। এই বিষয়টি কি অন্নদা বাবুরা জানেন না- নাকি এখন সযতনে সত্য গোপন করছেন? অতএব ১৯৪৭ এর বিভক্তির Nostalgia নিয়ে আফসোস করলেই চলবে না, অন্য আর সব প্রাসঙ্গিক সত্যও বর্তমান প্রজন্মের কাছে বলে দেয়া দরকার। তাদের সব সত্যই জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন। আর তা হলে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তাদের করণীয় নিয়ে। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবিসি বাংলা বিভাগকেও তাদের নিজেদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার কারনে সামগ্রিক সত্য ঘটনাদির বিষয় নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতে হবে। ১৯৮৩-৮৪ সময়কালে বিবিসি বাংলা বিভাগে কাজ করার Nostalgia থেকে আমিও যে মুক্ত নই।

www.pathagar.com

৩১/১২/১৯৯৬ইং, দৈনিক সকালের খবর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা

সত্যি কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ৬০ দশকের শেষে ৬ দফা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা সাজতে পেরেছিলেন। আর এই আন্দোলনে মুলত জ্বালানি যুগিয়েছিলেন তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং তার প্রশাসনের কিছু শক্তিধর ব্যক্তি। যেমন সিএসপি আলতাফ গওহর এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা। অন্যদিকে শেখ মুজিবকে পরোক্ষভাবে মদদ জুগিয়েছিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (Raw)। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর বরং ভারত মরিয়া হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানকে 'উচিত শিক্ষা' দেয়ার জন্য এবং এই কারণেই ৬ দফা আন্দোলনে দিল্লীর মদদ ছিল প্রচুর। ভারতের গোয়েন্দা সূত্রের রির্পোট থেকেই এটি পরে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এসব বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠক 'র' এর কর্মকর্তাদের লিখিত দু'খানা বই পড়ে দেখতে পারেন। একটি এখন প্রয়াত জ্যোতি সেনগুপ্তের 'ফ্রিডম মুভমেন্ট অব বাংলাদেশ' (১৯৭৩) এবং অন্যটি অশোক রায়নার 'ইনসাইড র' (১৯৮২)।

৬ দফা আন্দোলনে ভারতের মদদ যে এ দেশের মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ছিল না তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট ছিল। কিন্তু মুজিব কতটুকু সচেতন বা যত্মবান ছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক রয়েই গিয়েছে। সে কারনে তিনি এখনো এক বির্তকিত ব্যক্তি। ছয় দফা আন্দোলনেরই একটি পর্যায়ে আসে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। বলা হয়ে থাকে বা আওয়ামীলীগ এখন দাবী করছে যে, শেখ মুজিব নাকি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দুপুর রাতে পাকিস্তান আর্মির হাতে গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেছিলেন। মজার ব্যাপার এই যে, মুজিব জীবিতকালে কোন দিনই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এমন কোন দাবী করেননি। কোন নির্ভরযোগ্য ডকুমেন্টও এই বিষয়ে নেই। বরং উল্টো ডকুমেন্ট মজুদ আছে।

বাংলাদেশের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা বা Unilateral Declaration Of Independence (UDI) তিনি না করলেও পরে শেখ নিজে ১৯৭২ সালের ৭জুন তার রমনা রেসকোর্স জনসভায় এক বক্তব্য দিয়ে যেন অনেককেই তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি জানতাম তোমরা পাকিস্তান আর্মির অত্যাচারে বর্ডারের ওপারে ভারত চলে যাবে, ভারত তোমাদের আশ্রয় দিবে, সাহায্য করবে, অস্ত্র দিবে, যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে দিবে। এসব কি এমনিতেই হয়েছে? আমি আগে থেকেই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম।" (দেখুন, দৈনিক সংবাদ, ঢাকা- ৮জুন, ১৯৭২) এই খবর প্রকাশের পর পরের দিন শেখ নিজে নন, তার তখনকার রাজনৈতিক বিষয়ক সেক্রেটারি এবং বর্তমানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহাম্মদ শেখের এই বক্তব্য কিঞ্চিৎ সংশোধনী করে দেন এই বলে যে, তিনি হুবহু 'আগে থেকে বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম' বলে যা প্রকাশিত হয়েছে তা বলেননি। অথচ কে না জানে যে, এখন আবার শেখ হাসিনাও তার কোন কোন সাঙ্গপাঙ্গ বলেন যে, আগরতলার

www.pathagar.com

মামলায় পাকিস্তান গভর্নমেন্ট গোয়েন্দারা সঠিক ভাবেই আসামীদের সনাক্ত করেছিলেন। এবং শেখ সহ অন্য সবাই ওই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। কোনটি সঠিক? কোনটি মিথ্যা?

১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর যখন পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় তখন শেখ মুজিবের দীর্ঘকালের বন্ধু আইনজীবী এবং তার '৭১ এর মামলার কৌসুলি এ কে ব্রোহী মিয়ানওয়ালী জেলে গিয়ে খবরটি মুজিবকে-জানান। মুজিব তৎক্ষণাত ব্রোহীর কাছে এই বলে প্রস্তাব করেন যে, ব্রোহী যেন ইয়াহিয়া খানকে (পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) তার পক্ষে প্রস্তাব দেন যে, শেখ নিজে পাকিস্তান টিভি-রেডিওতে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করতে চান। ব্রোহী যখন তার ইন্তেকালের আগে ১৯৮৮ সালে লন্ডনে শেষবারের মত এসেছিলেন, তখন তিনি নিজেই এই তথ্যটি লন্ডনের ইংরেজী পাক্ষিক Impact International-এর সম্পাদক জনাব হাসের ফারুকীকে জানান। হাসের ফারুকী এই খবরটি তার পত্রিকায় প্রকাশের আগে আমাকে একদিন টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি ওটি প্রকাশ করবেন কিনা। আমি উত্তরে বলেছিলাম, অবশ্য অবশ্যই করবেন। পরে তিনি ওই খবরটি অতটুকুই প্রকাশ করেছিলেন। ব্রোহী সত্যি সত্যিই বিষয়টি ইয়াহিয়ার গোচরে এনেছিলেন কি-না কিংবা কার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আর বিস্তারিত কোন কিছুই তিনি বলেননি। ফারুকীও ওর বেশী আর কিছু প্রকাশ করেননি।

মুজিবের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ার আরো নজির পাওয়া যায় তার অন্য আর একটি বক্তব্যেও। টেপ রেকর্ডেড তথ্যে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ৭ জানুয়ারী ১৯৭২ এই ১১ দিন ব্যাপী ভুট্টো-মুজিব যে একান্তে অসংখ্য বিষয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন তার ভিতরে। এই বক্তব্যের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত আমেরিকার ইতিহাসবিদ অধ্যাপক Stanley Wolpert তার ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত তথ্যবহুল ভুট্টোর রাজনৈতিক জীবনীগ্রন্থ Zulfi Bhutto of Pakistan: His Life and Times. ওখানে অন্য অনেক কিছুর মধ্যে মুজিব বলেছেন, " I want your help. Believe me, I never wanted the Indians". (পৃষ্ঠা ১৪৭)। আমি আপনার সাহায্য চাই। 'বিশ্বাস করুন, আমি কোনভাবেই ভারতকে চাইনা'।

চাইবার কথা নয়। কেননা, তিনি তো ভুলে যেতে পারেন না যে, তিনি ৪০-এর দশকের শেষে পাকিস্তান আন্দোলনের ভলান্টিয়ার বা রাজাকার ছিলেন। ছিলেন পাকিস্তানের নেতা, মন্ত্রী এবং '৭১- এ প্রধানমন্ত্রী হৈ হৈ করছিলেন মাত্র। এবং এমনও কেউ কেউ বলেন যে, শেখই ইয়াহিয়া খানদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পাক আর্মি যেন বিদ্রোহীদের ঠান্ডা করে এবং তারপর শান্ত পরিবেশে তিনি পাকিস্তানের ক্ষমতা বা প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহন করবেন। ইয়াহিয়া খানকে তিনিই মনোনয়ন দিয়ে পুনঃ প্রেসিডেন্ট পদে বসাবেন। মুজিবের এই প্ল্যান-এ-ভারত সোভিয়েত যৌথ সামরিক অভিযানেই নাকি বাদ সেধেছিল। এই দুই শক্তির হস্তক্ষেপ না হলে ইতিহাস যে ভিন্ন হত, তাতো অতি স্পষ্ট।

www.pathagar.com

১৯৭১-পূর্ব সময়কালে শেখ মুজিব যতই বাগাড়ম্বর করুন না কেন বাংলাদেশের রূঢ় বাস্তব অবস্থায় তাকে ভারতীয় সোভিয়েত যৌথ ডিকটেশনে একটার পর একটা নিত্য নতুন ঢেঁকি গিলতে বাধ্য হতে হল। এসব ঢেঁকির বিস্তারিত বিবরণ দেশের মানুষের এতদিনে জানাজানি হয়ে গেছে। তবুও একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৯৭২ সালের ১৯ শে মার্চ ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীর বেশে ঢাকায় এসে শেখকে দিয়ে এক অসম চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন। ২৫ বছর মেয়াদী তথাকথিত 'মৈত্রী ও বন্ধুত্ব চুক্তি'। বস্তুতঃ এই চুক্তিটির ১২টি শর্তের কয়েকটিতে হাই সাউন্ডিং বা গালভরা অবাস্তব শর্তাদি থাকলেও ক্রিটিক্যাল শর্ত ছিল তিনটি-আট, নয় এবং দশ নম্বর শর্ত। এই তিনটি শর্তের নির্যাসবক্তব্য, বস্তুতঃ ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ মীরজাফর আলী খানকে দিয়ে যে ১২টি শর্তের ওয়াদানামা লিখে নিয়েছিলেন তার ২ নম্বর শর্তের হুবহু যেন অবিকল নকল। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের মাত্র ক'দিন আগে স্বাক্ষরিত সেই ওয়াদানামার দুই নম্বর শর্তের ইংরেজী অনুবাদ (মুলটি ছিল ফার্সি ভাষায় লেখা) করলে এমনি দাঁড়ায় ঃ " The enemies of the English are my enemies, be they Europeans or Indians" অর্থাৎ যারা ইংরেজদের শত্রু- তারা ইউরোপীয়ান বা ভারতীয় যারাই হোক না কেন- তারা সবাই আমারও শত্রু। (দেখুন চালর্স ষ্টুয়ার্ট এর History of Bengal-Annexture)। ১৭৫৭ সাল থেকে ২১৫ বছর পর যেন ১৯৭২ সালের ১৯ শে মার্চ ঢাকায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। ব্রিটিশ বেনিয়াদের কাছে দেশ বিক্রির যে সূত্রপাত ১৭৫৭ সালে ঘটেছিল ঠিক সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন, শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ দিল্লীর কাছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ইজারা দিয়ে।

এরপর গেল বেরুবাড়ী, গেল দক্ষিণ তালপট্টি। এলো অর্থনৈতিক বিপর্যয়। ১৯৭১ পূর্ব অর্থনীতির ভিত পড়ল ভেঙে। সৃষ্টি হল মহাদুর্ভিক্ষ। লাখে লাখে মানুষ অনাহারে অসহায় লাশ হল। লাশ আর লাশ। বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা দুঃসাধ্য হল। আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম বেওয়ারিশ লাশ সংগ্রহ ও দাফন করতে হিমশিম খেতে থাকলো। অঢেল সাহায্য এলো বিদেশ থেকে। কিন্তু মানুষের দুর্দশার লাঘব হলো না। বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা এবং 'চাটার দল' যতসব বিদেশী সাহায্যের মালামাল লুট করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হল। মানুষ বুঝতে পারল, রুখে দাড়ানো দরকার। কিন্তু রক্ষীবাহিনী ও 'বাকশাল' কর্মীরা বেপরোয়া হয়ে সকল বিদ্রোহী ও প্রতিরোধকারীদের নিশ্চিহ্ন করতে লাগলো। অসহায় নিরুপায় মানুষ আল্লাহর দরবারে ওদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করতে লাগল।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের মহান সুবহে সাদেক-এ শেখ মুজিব শাহী উৎখাত হল। সাধারণ মানুষ সত্যিকার আজাদীর স্বাদ পেল। প্রাণ খুলে তারা নতুন নেতাদের জন্য দোয়া করল। শোকরিয়ার মোনাজাত করল আল্লাহর দরবারে। নিহত মুজিবের জন্য একটি প্রাণীও আফসোস করল না। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ তো দূরের কথা। না দেশে না বিদেশে। ঈমানদাররা কেউই মৃত ব্যক্তির জন্য অবশ্য পাঠনীয় 'ইন্নলিল্লাহি ..... ' পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। ১৯৭০-পূর্ব সময়কালে তিনি যে একজন

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ও নেতা বনেছিলেন তাও যেন মানুষ আর আমল দিতে চাইল না। উচ্চতর কোনো আদর্শিক চেতনা বর্জিত মানুষ বা নেতার ভাগ্যের বোধকরি এটাই স্বাভাবিক পরিণতি।

এরপরও এদেশের মানুষ ইতিহাসে শেখ মুজিবকে তার প্রাপ্য সম্মান প্রদানে কুণ্ঠিত হতো না এবং দেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিকের স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখত। কিন্তু শেখ হাসিনা তার ভাবাবেগের তাড়না দিয়ে যেসব উল্টাপাল্টা করে চলেছেন তাতে বোধকরি শেখ মুজিবের প্রাপ্য মর্যাদার আসন ধরে রাখাও আওয়ামীলীগারদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। এই কথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ২৫ বছরের চুক্তি দ্বারা শেখ মুজিব দেশের স্বাধীনতা বন্ধকী শর্তে আবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু হাসিনা তার চেয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন। যেমন, শেখ মুজিব ফারাক্কা বাঁধ চালু করার জন্য দিল্লীকে লাইসেন্স দিয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে। আর হাসিনা অসম পানি চুক্তি করে ৩০ বছরের জন্য গঙ্গার পানির উপর দিল্লীর আধিপত্য পাকাপোক্ত করার দাসখত লিখে দিয়েছেন। বহুপাক্ষিক পানি বন্টন ইস্যুকে তিনি দ্বিপাক্ষিকতার অবাস্তব বেড়াজালে আবদ্ধ করেছেন। ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে ভারত ২২ বছর যাবৎকাল বাংলাদেশের যে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি সাধন করেছে তার কোন প্রতিকার হাসিনা চাননি। যেমন ফেরত চাননি ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে লুটে নেয়া হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ।

তাছাড়া মুজিব ফারাক্কার নিয়ন্ত্রন চাবি যেমন দিল্লীর হাতে তুলে দিয়ে এদেশকে খরায় ও বন্যায় মারার উপক্রম করেছিলেন, হাসিনা তেমনি একইভাবে বিদ্যুৎ ভারত থেকে আমদানির পাঁয়তারা করে ওদেরই হাতে এদেশের কল-কারখানার চাবি তুলে দিতে উদ্যত হয়েছেন। ২৫ বছরের চুক্তির ১০ নম্বর শর্তের বলে এদেশে ভারতীয় সেনা অভিযানের পথ যেমন মুজিব খুলে দিয়েছেন তেমনি হাসিনা ট্রানজিট দিয়েও বাংলাদেশকে ভারতের যুদ্ধ ক্ষেত্র বানাবার সুযোগ করে দিতে চাইছেন।

মুজিব যেমন কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এদেশে ইসলামী স্বাতন্ত্র্য উৎখাত করতে তৎপর হয়েছিলেন, যা কিনা ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট সংগঠিত না হলে অব্যাহত থাকত, হাসিনাও সেই কমিশনের বস্তাপচা যতসব সুপারিশাদি পুনঃ ভারত এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় এদেশে বাস্তবায়ন করতে তৎপর হয়েছেন। দেশের শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামের মহানবীকে তারা ইতিমধ্যেই দোষসম্পন্ন সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখাবার ধৃষ্টতার নজির স্থাপন করেছেন।

এদেশের স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ আর কতদিন অবাক বিস্ময়ে শেখ হাসিনার আওয়ামীলীগের এসব দেশ বিরোধী অপকর্মের দিকে তাকিয়ে থাকবে? এই পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহের উচিত হবে সকল রকম ছোটখাট ভেদাভেদ ও বিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ বিক্রির এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। এ বিষয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি সমূহের ঐক্যের যে আহব্বান জানিয়েছেন তা একান্তভাবেই সময়োপযোগী হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

২৬/০৩/১৯৯৭ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

২৩ জুন বিটিভি'তে আরেক ধাপ্পাবাজী

সাজানো একটি নাটকে এক জঘন্য বিকৃতির নজির দেখেছেন ২৩ জুন বাংলাদেশের মানুষ। বাংলাদেশ টিভিতে ঐ দিন রাত ৮টা পয়ত্রিশ মিনিট থেকে ন'টা পঞ্চাশ মিনিট ব্যাপী সুদীর্ঘ আশি মিনিটের সেই অনুষ্ঠানটিতে।

সাজানো নাটক বলছি এইজন্য যে, প্রশ্নকারী, শ্রোতা, দর্শক, উপস্থাপক যাদের টিভির পর্দায় দেখে চেনা গেছে তারা সবাই ছিলেন একটি বিশেষ দল এবং লবির লোকজন। আর প্রশ্নগুলিতো ছিল একই ধাঁচের। একই লাইনের। অনুগত-অনুগামীদের। যেন Her majesty's loyal opposition-এর মতই। বলা যায় যে, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের উপর যে প্রশ্নটি করা হয়েছিল, তাছাড়া আর কোন প্রশ্নই দেশের জ্বলন্ত সমস্যাদির উপর ছিল না। যেমন পানি চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি প্রাপ্তির সঠিক তথ্য কেন জনগণকে জানতে দেয়া হচ্ছে না, কিংবা ভারতের 'র' বা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অফিস কেন ঢাকায় স্থাপন করতে দেয়া হল, কেন ভারতের জন্য রেলপথ, রাজপথ উন্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে, কেন করিডোর ভারতকে দেয়া হচ্ছে, কেন 'র' এর একজন খাস ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে, কেন এই সব বিষয়কে দিল্লীকে 'ভাসুর' বিশ্বাস করে দিল্লীর কাছে সরকার নতজানু থাকছে ইত্যাদি কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই। শিক্ষা বিষয়ে বরাদ্দ নিয়ে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তাও কোন মৌলিক বিষয় ছিল না কেন? দেশের ইসলামী তাহজীব-তমুদ্দন, ঐতিহ্য সঠিক ইতিহাস এবং এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে নিয়ে যে হাসিনা সরকার স্কুল পাঠ্যপুস্তকে অসত্য ও অশালীন তথ্যাদি সম্প্রতি (১৯৯৭ সালের জানুয়ারী থেকে) পরিবেশন শুরু করেছেন তার উপরও কেন কোন প্রশ্নই করা হয় নাই ২৩ জুনের বিটিভি'র 'দেশবাসীর মুখোমুখি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর' অনুষ্ঠানটিতে? অনুষ্ঠানটি কি আদৌ দেশবাসীর মুখোমুখি ছিল নাকি আওয়ামী লীগের মুখোমুখি ছিল?

অনুষ্ঠানটির প্রশ্নাদির ধরন, উত্তরের নমুনাদি নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। অনেক সমালোচনা করা যায়। ইতিহাস বিকৃতির ভুরি ভুরি নজির তুলে ধরা যায়। অতসব করার নিশ্চয়ই অনেকে আছেন। আমি শুধু মাত্র একটি বিষয়ে কিছু তথ্য দিতে চাই।

২৩ জুন আওয়ামী লীগের (আসলে আওয়ামী মুসলিম লীগের) প্রতিষ্ঠা দিবস। আর সেই দিনটি ছিল পলাশী দিবস। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। ঐ দিনেই এদেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন, ১০দিন পর ৩রা জুলাই নিহত হন। দেশ চলে যায় বস্তুতঃ ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। যদিও নামমাত্র নবাব পদে বসে ছিলেন মীর জাফর আলী খান। যে মীর জাফরকে উদ্দেশ্যে করে

www.pathagar.com

কোম্পানীর গভর্নর হেনরি ভানসিটার্ট যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন, 'We have a Nabab of our own' এখন আমরা এমন একজন নবাব পেয়েছি যে আমাদের নিজেদের লোক। সত্যি সত্যিই নিজের জন্য গদির লোভে এই মীর জাফর মোনাফেকী করেছিলেন মূল নবাব দেশের স্বাধীন শাসক নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফর সেনাবাহিনী প্রধান হয়েও দেশের শত্রুদের সাথে অর্থাৎ কোম্পানীর ক্লাইভ-ওয়াটসনের সাথে গোপন আঁতাত করেছিলেন। এসব ইতিহাস অনেকেরই জানা। শেখ হাসিনা ঐ অনুষ্ঠানে সেই ২৩ জুনের সাথে নিজের ২৩ জুন ক্ষমতায় আরোহনের তুলনা করেছিলেন। আরো তুলনা করেছিলেন সেই একইদিনে ১৯৪৯ সালে তাঁর দল আওয়ামী- লীগ গঠনের গোড়াপত্তনের-ঢাকার রোজ গার্ডেনে।

২৩ জুনের পলাশীর বিপর্যয়ে সিরাজ এবং মীর জাফর এই দুই চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিরাজ স্বাধীনতা রক্ষার প্রতীক। অন্যদিকে মীর জাফর আজাদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নজির। এভাবেই ইতিহাস আমাদের জানা। তাই সিরাজ হবার আকাঙ্খা গর্বের বিষয়। মীর জাফর নাম মোনাফেকীর সিমবল (Symbol)। শেখ মুজিব কোন্ প্রতীকের বেশী কাছাকাছি? সিরাজের নাকি মীর জাফরের? হাসিনা যেন তার সাক্ষাৎকরে বলতে চেয়েছেন যে তার আব্বাজান শেখ মুজিব সিরাজের ভূমিকায় অবতীর্ন ছিলেন। এবং সেই ১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন থেকেই যেদিন কিনা ঢাকায় আওয়ামীলীগের জন্মদান করা হয়েছিল। একটু যাচাই করে দেখা যাক হাসিনার এই দাবী কতটুকু যৌক্তিক। ধোপে টিকে কিনা?

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন যখন ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের/পূর্ববাংলার প্রাদেশিক রাজধানী। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের ১ বছর ১০ মাস পরের ঘটনা। মুজিব তখন কোন লিডিং ফিগার নন। বয়স তখন ২৮ বছর মাত্র। সবেমাত্র কলকাতায় থেকে ঢাকায় এসেছেন প্রায় অসহায় কপর্দকহীন এক যুবক হিসাবে। তাই তিনি তখন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটি সঠিক ধরে নেয়া যায় না। তবে হ্যাঁ যারা এই কাজটি করেছিলেন তাদের তিনি সহযোগী ছিলেন-সেই আওয়ামী মুসলিম লীগের সেদিন (১৯৪৯ সালের ২৩ জুন)। যিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পদে আসীন হয়েছিলেন তিনি ছিলেন তখনকার অন্যতম মুসলমানদের জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সেক্রেটারী জেনারেলের পদে বসানো হয়েছিল টাঙ্গাইলের প্রখ্যাত সন্তান শামসুল হককে। তখন এই লীগ ইয়ার মহাম্মদের অর্থানুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি বিরোধীদল হিসাবে (শেখ মুজিব যখন ছিলেন আটকানো ঢাকা কারাগারে) ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগের মোকাবিলায়, পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং আদর্শের প্রতি পুরো আনুগত্য রেখেই। তবে হ্যাঁ, এই দলের অভ্যন্তরে যে তখন কেউ পাকিস্তান আদর্শ বিরোধী বা

www.pathagar.com

মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিরোধী পঞ্চম বাহিনীর দু-জন কেউই ছিল না এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। মাওলানা ভাসানী, শামছুল হক, ইয়ার মহাম্মদ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান এবং আস্থাশীল।

কেননা, পাকিস্তান কায়েম করার জন্য তাদের অবদান, ত্যাগ করো চেয়ে কম ছিল না। বরং অনেকের তুলনায় অনেক অনেক বেশী ছিল। তবুও তারা মুসলিম লীগের মুখোমুখি অর্থাৎ যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান কায়েম করার জন্য অগ্রণী ভূমিকায় ছিল, তার বিপরীতে বিরোধী দলের শাসনতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করার জন্যই তখন গঠিত হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। ঢাকায় এই দলের যাত্রা শুরু হলেও অল্পদিনের মধ্যেই যখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই দলে যোগদান করেন এবং নেতৃত্ব দেয়া শুরু করেন, তখন এই দল পশ্চিম পাকিস্তানেও শাখা প্রশাখা গঠন করে নিখিল পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখা শুরু করে। পরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর শুধুমাত্র তখনকার এই পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশেই নয় বরং কিছুদিনের জন্য হলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রেও এরা সরকার গঠন ও পরিচালনা করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই কেন্দ্রেও এদের সরকার গঠন ও পরিচালনা করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রে আওয়ামীলীগ (ততদিনে মুসলিম শব্দ বাদ দেয়া হয়েছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের অল্প কিছুদিন আগে যুক্তফ্রন্ট বা হক-ভাসানী- সোহরাওয়ার্দী রাজনৈতিক জোট গঠন করার পূর্ব মুহূর্তে) দলের প্রধানমন্ত্রী পদে সমাসীন হয়েছিলেন। শেখ মুজিবও প্রাদেশিক মন্ত্রী বনেছিলেন। পরে দুর্নীতির দায়ে যখন অভিযুক্ত হয়েছিলেন, সোহরাওয়ার্দীর আইনগত কুট কৌশলের ফলেই যে বেঁচে গিয়েছিলেন তা জানা বিষয়।

যা হোক তবুও ওয়াকফেহাল মহল জানে যে, ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী (মুসলিম) লীগ এবং মধ্য ষাট দশক উত্তর শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগ এক বস্তু ছিল না। বাংলাদেশের শেখ হাসিনার আওয়ামীলীগ তো তেমন কিছু হবার প্রশ্ন অবান্তর মাত্র। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শেখের শুধু স্বেচ্ছাচারিতাই নয় বরং তার দেশধ্বংসী রাজনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সৎ, বিজ্ঞ, মেধাবী, দেশপ্রেমিক যারা দ্বিমত পোষন করতেন, শেখের অন্যায় দিক মেনে নিতে পারেন নাই তারা একে একে আওয়ামী লীগ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। আতাউর রহমান খান, আমেনা বেগম, আবদুস সালাম খান প্রমুখ সবাই শেখের দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন । মাওলানা ভাসানীতো সেই ১৯৫৫ সালেই আওয়ামীলীগ ছেড়ে দিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি গঠন করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর রহস্যজনক মৃত্যু শেখ মুজিবকে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে আসীন হতে যেমন সুযোগ করে দিয়েছিল তেমনি আবার তাকে পূর্ণভাবে ভারতীয় কংগ্রেসের একটি 'বি' টিম এর ভূমিকা পালন করতেও সুড়সুড়ি

www.pathagar.com

দিচ্ছিল। এই সময়ে সোহরাওয়ার্দীর যদি রহস্যজনক মৃত্যু বৈরুতে না হত (যে রহস্যজনক মৃত্যুর জন্য অনেকেই ভারতীয় এবং শেখ-এর যৌথ ষড়যন্ত্র ছিল বলে বিশ্বাস করেন) তাহলে আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নতর কিছু হত। যেমন আরও ভিন্নতর হত এদেশের ইতিহাস যদি আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল শামছুল হককে শেখ মুজিব গংরা চক্রান্ত করে 'পাগল' না বানাতেন, শামছুল হকের স্ত্রী আফিয়া খাতুনকে ঘরছাড়া ও দেশছাড়া না করতেন।

আফিয়া খাতুন বছর তিনেক আগে ঢাকায় এসেছিলেন তার বর্তমান বাসস্থান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সেখানে তিনি এখনও বার্ধক্যে পৌঁছেও ইংরেজী সাহিত্যের চর্চায় নিয়োজিত আছেন। ১৯৭২-৭৫ আওয়ামী লীগ সরকার যখন শামছুল হককে সংসদে 'মৃত' ঘোষনা করেছিলেন, তার অনেক পরেও আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেয়েছিলাম যে, তিনি এদেশেরই এক পীরের দরগায় খাদেম হিসাবে দিন কাটাতেন। শামছুল হকের কথা একটু বিস্তারিত বলছি এজন্য যে, তিনি ঐ মূল সংগঠনে টিকে থাকলে হয়তো আওয়মী মুসলিম লীগের 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করা কারো পক্ষেই সহজ কাজ হত না। আর যেদিন ঐ শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে সেদিনই ঐ দলটি ভারতের কংগ্রেসের 'বি' টিম-এ ঢোকবার প্রথম সোপান অতিক্রম করেছে। শেখ মুজিব দিল্লীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার খাতায় তার নাম পুরোপুরি লিখিয়েছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠক পড়ে দেখুন ওদেশের গোয়েন্দা 'জ্যোতি সেন গুপ্তে'র Freedom Movement of Bangladesh (১৯৭৩) এবং অন্য গোয়েন্দা কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত) 'অশোক রায়না'র Inside Raw (১৯৮২)। আর একাত্তরের যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহনের যৌক্তিকতার জন্য পাঠককে পড়তে হবে ভারতীয় প্রখ্যাত সাংবাদিক 'প্রান চোপড়া'র India's Second Liberation.

আমি এসব তথ্যাদি উল্লেখ করছি এজন্য যে, ১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ যা কিনা ১৯৫৫ সালের পর থেকে আওয়ামীলীগ হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে তার কার্যক্রম বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে খুব একটা স্বচ্ছতো নয়ই-এমনকি দেশের বৃহত্তর মঙ্গল এবং উন্নয়নের জন্য পর্যন্ত নিবেদিত ছিল বলে বিশ্বাস করা যায় না। ১৯৭০ পূর্ব এই দলের দেশ বিরোধী কার্যকলাপ যদি বিস্তারিত আলোচনা আমরা নাও করি, তবুও ১৯৭২-৭৫ সময়কালে তারা দেশের ক্ষমতা হাতে পেয়ে কি সব কাজ কেমন করেছিলেন তা এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীরা ৬-দফা নিয়ে প্রচারণায় নেমেছিল। সেই ছয় দফা বিস্তারিত অনেকের জানার কথা। সেই দফা গুলোর তাত্ত্বিক বিবরণ যাই

www.pathagar.com

ছিল না কেন-আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব দেশের সাধারণ মানুষকে যা বলেছিলেন, বুঝিয়েছিলেন এবং তাদের কাছে ওয়াদা করেছিলেন তার সারকথা ছিল কয়েকটি। প্রথমতঃ দেশের গরীব, নিঃস্ব সম্বলহীন খেটে খাওয়া বৃহত্তর অংশের মানুষের জন্য তিনি জীবনযাত্রা সহজতর করে দিবেন। আট আনা বা পঞ্চাশ পয়সা সের দামে চাল খাওয়াবেন। ছয় আনা দিস্তায় লেখার কাগজ দিবেন এবং অনুরূপ সস্তায় আর অন্য সবকিছু জীবনধারণ দ্রব্যাদি সরবরাহ করবেন। এবং এসব করতে গিয়ে যে সব টাকা পয়সাদি বা বাড়তি অর্থ প্রয়োজন হবে তা তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আদায় করবেন। কেননা, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ এই ২৩ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান যে সব অর্থ পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়ে গিয়েছিল সেসব তারা ফেরত দিলেই পূর্ব পাকিস্তান সোনার বাংলায় পরিণত হবে। দেশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়াও তিনি আর যে জিনিসটির বিষয়ে জোর দিয়ে বলেছিলেন তা ছিল এই যে, তিনি গণতন্ত্রের সাথে সাথে 'শক্তিশালী পাকিস্তান' এবং দেশে 'মদিনার ইসলাম' প্রবর্তন করবেন। নিখিল পাকিস্তানের মানুষের উপর থেকে শোষণ নিঃশেষ করবেন। এবং বিশেষ ভাবে পূর্ব পাকিস্তানে তার ভাষায় এদেশে 'সোনার বাংলা' কায়েম করবেন। দেশে সবাই আজাদ হবে। খাবে, দাবে, হাসবে, খেলবে-আর কি। মহাসুখে থাকবে সবাই।

দেশের সহজ সরল মানুষের অনেকেই শেখের কথায় এবং সুখের স্বপ্নের ওয়াদায় বিশ্বাস করেছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তাই অনেকে ভোটও দিয়েছিলেন। ভোটের বাক্সের ভিতর দিয়ে মানুষ নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বুকভরা আশা করেছিল। কিন্তু কি হয়েছিল তারপর? দেশের মানুষের উপর আওয়ামীরা এবং শেখ মুজিব একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা বলা যায় চুপচাপ থাকলেন। তার কিছু সাঙ্গপাঙ্গরা কলকাতায় হোটেলে বসে বিলাসী জীবন-যাপন করলেন-কেউ কেউ নোংরামিতেও নিয়োজিত থাকলেন। শেখ মুজিব নিজে পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী জেলে বসে অন্য আর সব আয়েশের মাঝে তার নিজের পাইপের জন্য ব্রিটিশ এরিনমোর টোব্যাকো কোম্পানীর দামী তামাক পর্যন্ত উপভোগ করলেন। যুদ্ধ করল দেশের দামাল ছেলেরা। প্রাণও দিল ওরাই। তবুও অনেকেই ভাবল যে স্বাধীন দেশে শেখ ফিরে আসলে তিনি নিশ্চয়ই সব ওয়াদা পূরণ করবেন। দেশের মানুষের জন্য আজাদী, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করবেন। এমনি সব ভেবে মানুষ নিজেদের অতীতের ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতে চাইলেন। কিন্তু কি করেছিলেন শেখ মুজিব, ১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারী ঢাকায় ফিরে এসে সরকার প্রধান হবার পর?

ঢাকায় ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই শেখ মুজিব ভারত, দিল্লী এবং ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে খুশি করার জন্য ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভাবখানা ছিল এই যে, ওরাই বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে। ইন্দিরাই তাঁকে ঢাকায় ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ইন্দিরার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার জন্য তিনি ১৯৭২-এর ১৯ মার্চ ঢাকায় তাঁকে দাওয়াত করে এনে এখানে বসেই ফরমাল দাসখত দিয়ে ২৫ বছরের জন্য বাংলাদেশকে এবং এদেশের সার্বভৌমত্বকে বন্ধক দিয়ে দিলেন। চুক্তিটি 'বন্ধুত্ব ও মৈত্রী' শিরোনামে ভূষিত করা হয়েছিল সত্য, কিন্তু ওটি যেন ছিল 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'। কেননা চুক্তিটির আট, নয় এবং দশ নম্বর শর্ত তিনটির মর্মার্থ যা ছিল তার সাথে হুবহু মিলে যায় ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের ক'দিন আগে মীর জাফর আলী খান এবং ক্লাইভের সাথের দেশ বন্ধক দেয়ার এবং বিক্রির জন্য প্রণীত চুক্তিটির দুই নম্বর শর্তটির মর্মার্থ। যে কারণে শেখ এর পরই এদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন ভারতকে। ভারতেরই নির্দেশে এবং নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য শেখ সব কিছু করেছিলেন। সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে দিয়ে তিনি ভারতীয় জেনারেল উবানের পরিকল্পনা এবং নির্দেশনায় তার একটি প্রাইভেট বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। 'রক্ষীবাহিনী' নামে পরিচিত এই বাহিনী একদিকে ছিল শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত, অন্যদিকে এটি নিয়ন্ত্রন করতেন তিনি নিজেই। হিটলারের গেষ্টাপো বা ইরানের শাহ-এর সাবাক বাহিনীর মত নির্মম, নিষ্ঠুর ছিল এরা। এবং কোনো ধরনের আইনের জবাবদিহিতা ছিল না এই বাহিনীর সদস্যদের অন্যায়, অত্যাচার, হত্যা, গুম, নিষ্ঠুরতার কোনো কিছুর জন্যই। এছাড়া ছিল শ্বেত-সন্ত্রাস বাহিনী। এদের ১৯৭২-৭৫ সময়কালের সাড়ে তিন বছরের নির্মমতা, হত্যা, হাইজ্যাক, ডাকাতি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি এখনো অনেকের কাছে বিভীষিকা হয়ে আছে। এরাই এই সময়কালে শুধুমাত্র নওজোয়ানদেরই বিনা বিচারে নির্বিচারে হত্যা করেছিল প্রায় ৩৭ হাজারের মত। এছাড়াও ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত শুধুমাত্র আদর্শিক কারনে হত্যা করেছিল অন্ততঃ আরো দশ হাজার পীর, মাশায়েখ, আলেম, স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক নেতা ইত্যাদি ধরনের খাঁটি দেশপ্রেমিককে দিল্লীর প্রয়োজনে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতকে খুশি করার জন্যই যে এসব জঘন্য মানবতা বিরোধী কুকর্ম ওরা করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দিল্লীকে বাড়তি খুশি করতে গিয়ে মুসলিম বাংলাদেশ থেকে যতোসব মুসলিম নিদর্শন, নমুনা, ঐতিহ্য ইত্যাদি ছিল তাও নিঃশেষ করতে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন শেখ মুজিব ও তার সরকার। ঐতিহাসিক রাস্তার নাম, কলেজের নাম, বিশ্ববিদ্যালয় হলের নাম ইত্যাদি সব কিছু থেকে ইসলাম ও মুসলমান নাম বাদ দেয়া হয়। এমনকি শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে ইসলামী অনুপ্রেরণার নমুনা কুরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনী ইলমা' 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক' পরিত্যক্ত হয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া হয়। অথচ নটরডেম কলেজ, হলিক্রস স্কুল ও কলেজ বা রামকৃষ্ণ মিশন, ভোলানাথ

www.pathagar.com

একাডেমী, ব্রজমোহন কলেজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তথাকথিত সেক্যুলারিজম এর কারনে কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। অন্যদিকে ভারতে বেনারস হিন্দু ইউনির্ভাসিটি বা আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সহ অনুরূপ কোন নাম-নমুনা-নিশানা ভারতে সেক্যুলারিজম এর দোহাই দিয়ে বদলিয়ে ফেলা হয় নাই। এমনকি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহর নামে যেমন ভারতে প্রতিষ্ঠানের নাম সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে তেমনি পাকিস্তানেও ভারতের গান্ধীর নামে সংগঠনের নাম আগের মতই রয়ে গেছে। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এই সব পুরাতন নাম-নিশানা বহাল রাখা জরুরি। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এই সব ইতিহাস বিরোধী পরিবর্তন শুধুমাত্র আমাদের দৈন্যের স্বাক্ষরই বহন করেনা বরং এই ধরনের আত্মঘাতী পথে চললে এদেশের মুসলিম স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ কার না জানা আছে যে, বাংলাদেশের অস্তিত্বের পূর্ব শর্ত হচ্ছে ইসলামী ঐতিহ্য এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের সর্বাত্মক সংরক্ষণ। আর তা না করলে এদেশ সিকিম বা কাশ্মীরের দুর্ভাগ্য বরণ না করে পারে না।

দেশের মানুষকে সুখ-শান্তির লোভ দেখিয়ে শেখ মুজিব তাদের ভাগ্যে ভারতের গোলামি এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের শিকার করেই ক্ষান্ত হন নাই, দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডও তিনি ভেঙে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। নিজের অজ্ঞতার জন্যই হোক, কিংবা ভারতের মোকাবিলায় অসহায়ত্বের কারণেই হোক, ১৯৭০ সাল পূর্ব এদেশের সবল অর্থনীতিকে তিনি দ্রুত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। হু হু করে জিনিসের দাম বেড়ে চলছিল। ১৯৭০-৭১ এর ৬০-৭০ পয়সা সের এর চাল যা কিনা তাঁর ওয়াদা ছিল ৫০ পয়সায় নামানোর এবং এই কমদামে সরবরাহ করার, সেই চালের বাজার তিনি দেশের মাটিতে ১০ জানুয়ারী '৭২ পা দেয়ার সাথে সাথে হু হু করে বাড়তে শুরু করল। প্রধান কারণ ছিল দেশে যে বর্ডার ছিল ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের সাথে প্রায় সিল করা, সেই বর্ডার ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে সর্ম্পূণ খুলে গেল। অরক্ষিত হল। ওপারে ভারতে যেহেতু চালের ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেশি ছিল তাই খোলা বর্ডার দিয়ে সবকিছু ওপারে চলে যাওয়া শুরু হল অবাধ গতিতে। এদেশের চাল, ডাল, সোনা, রূপার মত দামি জিনিসের বদলে ওপার থেকে আসল কম প্রয়োজনীয় মালামাল। এবং নিম্নমানের শিল্প দ্রব্যাদি।

ফলে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ইত্যাদি ভারতীয় এলাকা বাংলাদেশের অর্থনীতির নিম্নগতির বিনিময়ে উপকৃত হল সত্য কিন্তু বাংলাদেশে লাগামহীনভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে গেল। অন্যদিকে এখানকার শিল্প কারখানা বন্ধ হওয়াতে দেশের সম্পদে ঘাটতি দেখা দিল। এখানে মানুষ অনাহার-অর্ধাহারের শিকার হল। আড়াই বছরের মাথায় ১৯৭৪ সাল জুনের শেষ থেকে বাংলাদেশে এক মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা

www.pathagar.com

দিল। ১৯৪৩-৪৪ সালের পর এই প্রথম আর এক দুর্ভিক্ষ-মহামারী আসল এদেশে। ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫-৬ মাসের ব্যবধানে লাখ লাখ মানুষ অনাহারে অকালে প্রাণ হারালো। ১৯৭০-৭১ পূর্ব সময়কালে দেশের সবল অর্থনীতি কত পরিমানে ধ্বংস হলে এমন মারাত্মক দুর্ভিক্ষ হতে পারে তা কল্পনা করার বিষয় মাত্র। ১৯৭৪-এর শেষে নতুন ফসল কৃষকের ঘরে উঠার পর দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা কমে গেলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম তেমন আর কমল না। শুধুমাত্র ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট যেদিন এক সফল সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখের শাসন উৎখাত করা হয়েছিল তারপরই কেবল মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বহুলাংশে কমে গিয়েছিল। তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে ভারতের সাথে সাধারণ ভৌগলিক সীমানা পুনঃ ১৯৭০-৭১ সময়ের মত সিল করা সম্ভব হয়েছিল। ভারত প্রীতির কারনে কে না জানে যে মুজিব এই সোনার দেশটিকে ডঃ হেনরী কিসিঞ্জারের ভাষায় 'তলাবিহীন ভিক্ষার ঝুলি'তে পরিণত করেছিল। এদেশের অর্থনীতির মূল শক্তি যে ভারতের মোকাবিলায় সহযোগী-সম্পূরক নয় বরং প্রতিযোগিতামূলক তা ভুলে যাবার বা পায়ে ঠেলার কারণেই শেখ এ দেশের অর্থনীতির যে সর্বনাশ করেছিলেন তা বোধ করি এখন বিস্তারিত না বললেও চলে।

১৯৭২-৭৫ সময়কালে শেখ যে সর্বনাশটি এদেশের অর্থনীতিতে করেছিলেন তা পুনঃ শুরু করেছেন তারই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী ভারতে আশ্রিত কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হবার পর। ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেটে শিল্পখাতকে যেভাবে ধ্বংস করার সূচনা তিনি করেছেন কিংবা একই সাথে শিল্প উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি যেভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং পেয়েই চলেছে তাতে ১৯৭২-৭৫ এর মাইনাস উন্নয়নের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়না বরং আরো ইঙ্গিত দেয় ১৯৪৭ পূর্ব সময়কালের বিষয়। ১৯৪৭-পূর্ব সময়ে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ভাবে কাঁচামাল সরবরাহকারী পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাৎভূমি হয়ে থাকার দুর্ভাগ্যের বিষয়। বৃটিশ বেনিয়া, হিন্দু জমিদার, জোতদার, মাড়োয়ারীদের পূর্ব বাংলার গরিব কৃষক-মজুরকে নির্মম শোষন করার ঘটনাদি। এসব দুঃখজনক ইতিহাস বর্তমান জেনারেশন জানে না। জানার কোন সুযোগও নেই। কেননা, শিক্ষা, পাঠ্যক্রম, মিডিয়া, রেডিও, টিভি ও প্রায় পত্র-পত্রিকা ওসব অতীত ঘটনাদি এবং সঠিক ইতিহাস বলা যায় গোপন করেই চলেছে। গোপন করার জন্য সরকারের পর সরকারের অজুহাত হচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করছেন। ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা যখন ওদেশের মুসলমানদের মসজিদ, শিখদের স্বর্ণ মন্দির ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে তখনও এদেশের সরকারগুলি বলা যায় নিশ্চুপ থেকেছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা কোন দোষণীয় নয়। মুসলমান বা শিখরা যখন নিজেদের নুন্যতম ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করতে স্বাভাবিক কারনে তৎপর হয় তখন তা হয় 'চরম সাম্প্রদায়িকতা' । শুধু তাই নয়-এ ধরনের ঘটনাদিতে মৌলবাদিতা আবিস্কার

www.pathagar.com

করা হয়। এমনকি পাকিস্তান ভূতও খোঁজা হয়। এবং যারা বা সে সরকার এসব আবিস্কার করেন তারা আবার মক্কা-মদীনায় গিয়ে মাথায় হেজাব লাগান। ওআইসিতে গিয়ে মুসলমান সাজেন। ভিক্ষাও চান মুসলমান হিসাবে অন্য মুসলমানদের কাছে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে একদিকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের শোষণের লীলাক্ষেত্রের শিকারে পরিণত করা হয়েছে, মানুষের দারিদ্র ও ক্ষুধা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে আবার অসহায়ত্বের সুযোগে এদেশের সংখ্যাগুরু মানুষের বিশ্বাস ধর্ম, ধর্মীয় চেতনা নিঃশেষ করার লক্ষ্যে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শন, সংস্কৃতি, শিক্ষা, মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র শুরু করা হয়েছে। একই লক্ষ্যে ১৯৭২-৭৪ সাময়কালে রচিত ভারতীয় এক জাতীয়তাবাদের বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে রচিত ও প্রণীত কুদরতে-খুদা-শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে- যা কিনা ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ২১ বছর সময়কালে আস্তাকুঁড়ে ডাম্প করা ছিল, তা আবার বর্তমান শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনে বাস্তবায়নের জন্য জাতি ও দেশ বিরোধী নেশায় যেন মেতে উঠেছেন। অবশ্য স্মরণযোগ্য যে ১৯৭২-৭৫ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পেয়ে শেখ মুজিবও আওয়ামীলীগ যে অসংখ্য দেশবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছিলেন-যার কিনা পরিব্যপ্তি হয়েছিল রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, এমনকি দেশের সার্বভৌমত্বে পর্যন্ত। কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ছিল ওসব কিছুর একটি নমুনা বিশেষ। দিল্লীর কাছে দেশ বিক্রির প্রক্রিয়া এতই মারাত্মক এবং ব্যাপক ছিল যে শেখ মুজিবের এককালের পরম ভক্তরাই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সফল ভাবে তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছিলেন। দেশের সাধারণ মানুষও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। আওয়ামীলীগের অন্যতম প্রবীণ সদস্য এবং তখনকার সংসদের স্পীকার আবদুল মালেক উকিল (মরহুম) মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলাদেশে নব্য ফেরাউনের পতন হয়েছে।

১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের চরম ধাপ্পাবাজি এবং জালিয়াতির নির্বাচনের তথাকথিত বিজয় অর্জন করেই যে শেখ হাসিনার আওয়ামীলীগ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছেন তারা দেশের সাধারণ মানুষের ইচ্ছা এবং আশা-আকাংক্ষার বিরুদ্ধে সেই ধিকৃত ও বিতর্কিত মুজিবকে যেভাবে পুনঃ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তৎপর হযেছে তা যেন দেশের জন্য অশনি সংকেত। মানুষ ভাবতে বাধ্য হচ্ছে, তাহলে কি ভারতীয় গোলামির নতুন শিকল আবার বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে? শেখ মুজিব করেছিলেন ভারতের সাথে ২৫ বছরের গোলামি চুক্তি। শেখ হাসিনা ওই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার এক সপ্তাহ আগে করেছেন তথাকথিত ৩০ বছরের পানি বন্টন চুক্তি। ২৫ বছরের চুক্তির মধ্য দিয়ে মুজিব ভারতের কাছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বন্ধক রেখেছিলেন, আর শেখ হাসিনা ৩০ বছরের পানি চুক্তির ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গাকে দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে পরিণত করার ধোঁকাবাজি করার কসরত করেছেন।

বাংলাদেশ ভারতের নীল নকশায় চলছে আওয়ামী হাসিনার শাসন ও তথাকথিত উন্নয়ন। কৃষি ছাড়াও আর সর্বত্র উৎপাদন স্থবিরই না বরং যে অধোমুখি হয়েছে একথা আমরা অন্যত্র বলেছি। এবং এদেশকে চিরস্থায়ীভাবে ভারত নির্ভর করার জন্য ভারতকে ট্রানজিট বা বস্তুতঃ করিডোর দেয়ার পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়াও বিদ্যুৎ আমদানীর মত আত্মঘাতী পদক্ষেপ নেয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। এদেশের মওজুদ প্রাকৃতিক গ্যাস-তেল বা তরল সোনাও ভারতে বিক্রি করার কানাঘুসা আমরা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি। শেখ হাসিনা নিজে ভারতের অনেক নুন খেয়েছেন-৬/৭ বছর দিল্লীর আদরে দিন কটিয়েছেন। ১৯৭৫-৮১ সালের মে পর্যন্ত তাঁর পিতার পতনের পর থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর ১৭দিন পূর্ব পর্যন্ত। এ কারণে তিনি ওদের নিমকহালালী না করে পারেন কি? তা করুন। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের বারো কোটি মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আশা-আকাঙ্খা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কিছুতেই তিনি দিল্লীর পদতলে সঁপে দিতে পারে না। সে অধিকার কোন মানুষই তাকে দেয় নাই। কিন্তু যারা তার ২৩ জুনের বিটিভিতে ৮০ মিনিট কাল দীর্ঘ সাজানো অনুষ্ঠানটি দেখেছেন, তারা নিশ্চিতভাবেই চরম হতাশ হয়েছেন এবং ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন যে শেখ মুজিবের গাদ্দারির মতই শেখ হাসিনাও দেশের মানুষের সাথে মীরজাফরী করছেন। সবকিছু নিয়ে ধোঁকাবাজি করছেন দেশের মানুষের সাথে। ২৩ জুন বিটিভিতে সেসব ধোঁকাবাজির নমুনা মানুষ ধরে ফেলেছে।

৩০/০৬/১৯৯৭ এবং ০৭/০৭/১৯৯৭ ইং দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

নিজ জন্মস্থান ছেড়ে কোথায় যাব?

দেশ ছেড়ে কোথায় যাবে এদেশের ভারত বিরোধীরা? আর শুধুমাত্র ভারত প্রেমিকরাই কি বাংলাদেশে বসবাস করতে থাকবে? এই প্রেমিকদের স্থান কি এদেশটি? বাংলাদেশ প্রেমিকদের স্থান কোন দেশটি? এরূপ অসংখ্য প্রশ্নের ভিতর থেকে চারটি প্রশ্ন আমাদের উঠাতে হল। উঠাতে হল এই জন্য যে, গত ১৩ই জুলাই মুক্তাঙ্গন পাতায় একটি নিবন্ধে খোঁচা মেরে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করতে জোর সুড়সুড়ি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে যারা 'ভারতবিরোধী' তাদের বাংলাদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে উপদেশ খয়রাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নিজের জন্মস্থান এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও হিজরত করতে। কোথায় তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি যদিও। অবশ্য বলার দরকার হয় না। কেননা, হিজরত করা বর্তমান কালে তেমন কোন আজগুবি বিষয় নয়। অতি স্বাভাবিক বস্তু। বিশেষ করে, বাংলাদেশের মত পৃথিবীর দরিদ্রতম ও জনবহুল দেশ থেকে উন্নত বা ইউরোপে এদেশের অনেক মানুষকে ভদ্রভাষায় Economic Migrant বা অর্থনৈতিক হিজরতকারী নামে চিহ্নিত করা হয়। যেমন মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশে আবার 'মিসকিন' নামেই বেশি পরিচিত। ভিন্ন নামে একই পরিচয়। এ দুনিয়ার মানব সভ্যতা যতই উন্নততর হচ্ছে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং যাতায়াত যোগাযোগ উন্নত ও সহজতর হচ্ছে, মানুষের মবিলিটির বা স্থানান্তর প্রক্রিয়া ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক এলাকার মানুষ অন্য এলাকায় চলে যাচ্ছে, এক দেশের মানুষ ভিন্ন দেশে হিজরত করছেন। এসব মবিলিটির একটি প্রধান কারন জীবিকার অন্বেষণ। বাড়তি আয়ের সন্ধান। উন্নততর জীবন যাপনের আশা-আকাংখা বা লোভ-লালসা। এরা সবাই Economic Migrant। কিন্তু নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে হিজরত করার বিষয় Economic Migrant শ্রেনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আদর্শিক এবং রাজনৈতিক কারনেও বর্তমান কালে অনেকেই Migrant হচ্ছেন। রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেক অনুন্নত দেশ থেকে দেখা যায় যে অনেক মানুষ উন্নত ও সভ্য দেশে নিজ নিজ বিশ্বাস আদর্শিক চেতনা এবং স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীর Migrant হচ্ছেন। ইউরোপে এবং আমেরিকাতে বোধকরি সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক আদর্শিক Migrant এখন স্থান করে নিয়েছেন। অনেক অর্থনৈতিক Migrantও আদর্শিক Migration নেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। নিজের জন্মস্থান বা দেশ পরিবেশ ছেড়ে বিনা কারনে কেউই অন্য দেশে চলে যেতে চায় না। অহেতুক হিজরত করতে চায় না। কিন্তু তবুও বাস্তব অবস্থা ভিন্নতর।

অনেকেই হিজরত করছেন ভিন্ন ভিন্ন দেশে। এবং এসব হিজরত হচ্ছে স্বেচ্ছায়। নিজের সুবিধাদি লাভের আশায়। অতীতে বাংলাদেশ অঞ্চলে দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে মোহাজির হিসাবে বসতি স্থাপন করেছেন। আর সম্প্রতি উল্টো ঘটনা ঘটছে। এই জনবহুল ও দারিদ্রপীড়িত দেশ থেকে লাখ লাখ মানুষ এদেশের আর্ন্তজাতিক সীমারেখার বাইরে চলে গিয়ে জীবন-জীবিকা রক্ষার চেষ্টায় রত

www.pathagar.com

আছেন। মোট কথা হচেছ এই যে, বাংলাদেশ থেকে অন্যত্র চলে যেয়ে বসবাস করার বিষয়টি কোন অস্বাভাবিক বা আজগুবি কোন প্রস্তাব নয়। অতি স্বাভাবিক প্রস্তাব। কিন্তু যখন বলা হয় যে, ভারত বিরোধীরা এদেশ থেকে চলে যাক আর বাকীরা এখানে থাক তখন বিষয়টি কি ভাল শুনায়। যুক্তিযুক্ত ঠেকে?

বাংলাদেশে ভারত বিরোধী এবং অন্যদিকে ভারতপ্রেমী কারা? কতই বা তাদের গাণিতিক সংখ্যা। এর একটা সঠিক সার্ভে রির্পোট কি পাওয়া সম্ভব? ১২/১৩ কোটি দেশের মানুষের কত কোটি বা শতকরা কত ভাগ ভারত বিরোধী? কত ভাগ ভারত প্রেমিক?

হ্যাঁ একটা মাপকাঠি আছে। বিশ্বাস যোগ্য এবং প্রায় সঠিক।

সবার জানা কথা যে, বাংলাদেশের রাজনীতি সুস্পষ্ট দুই মেরুতে বিভক্ত। ভারতবিরোধী এবং ভারতপন্থী। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাড়া আর বাকী সবাই ভারত বিরোধী। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দেশের মোট ভোটারের সমর্থন পেয়েছে ২৪%। এই শতকরা ২৪% যে ভারতপ্রেমিক হিসাবে এদের ভোট দিয়েছে তাও নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় না। যায় না এ কারণে যে, ওরা স্বেচ্ছায় বা স্বতস্ফূর্ত স্বাধীনভাবে বিনা স্বার্থে আওয়ামীলীগের পক্ষে ব্যালট বাক্সে ভোট দেয় নাই-নগদ অর্থে কেনা ভোট, জালভোট ইত্যাদি স্বচছ ভোটের নামে জালিয়াতি তো ছিলই। তবুও না হয় ধরে নেয়া যাক যে ঐ ২৪% মানুষ আওয়ামীদের সমর্থন করেছে। এবং তাহলে এই দাঁড়ায় ব্যাপারটা যে, শতকরা ৭৬% ভাগ মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয় নাই অর্থ্যাৎ বাংলাদেশে তিন চতুর্থাংশ মানুষ আওয়ামীলীগ বিরোধী এবং তাই ভারত বিরোধীও বটে। বস্তুতঃ এটিই বাংলাদেশের মানুষের ভারতপ্রেমিক এবং ভারতবিরোধীদের গাণিতিক হিসাব। নির্ভরযোগ্য হিসাব তো বটেই। এবং তাই যদি হয় তাহলে, ভারতবিরোধীদের যদি এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা যায়, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়? সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হচেছ নাকি। এ কেমন যুক্তি, কেমন অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব? বরং গণতান্ত্রিক রায়কে যদি মানতে হয় বা শ্রদ্ধা করতে হয়, তাহলে তো বলা যায় যে সংখ্যাগুরুরা নয় বরং সংখ্যালঘুদেরই হিজরত করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে। এবং ভারতপ্রেমিক এই তিন কোটি বাংলাদেশী নাগরিকদের বরং ভারতে হিজরত করলে মন্দ হয় না। কেননা, তারা যেমন ঐ বিশাল দেশে সহজেই নিজেদের স্থান করে নিতে পারবে, তেমনি আবার মন-মানসিকতা বা আদর্শিক দিক দিয়েও ওরা ওদেশে হোমলি (Homely) অনুভব করতে পারবে। যা কিনা ভারত-বিরোধীরা পারবে না। তাছাড়া ভারতবিরোধীরা ওদেশে গ্রহনীয় হবে না। না আদর্শিক ভাবে, না আর কোন মানসিক বিবেচনায়। ইতিহাস সাক্ষী যে, বিগত পঞ্চাশ বছর ব্যাপী এ দুই দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে যে হিজরত হয়েছে, তার প্রধান কারন ছিল আদর্শিক। কিছু কিছু বৈষয়িক কারনে হাঙ্গামা হয়েছে সত্য, কিন্তু তাও আদর্শ বর্হিভূত বা বিচ্যুত ঘটনাদি ছিল না ওসব হাঙ্গামার মূলে।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কারনেই বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ভারতবিরোধী হয়েছে। কোন কারন ব্যতিরেকে এই বিরোধী মনোভাব তৈরী হয় নাই। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হলে বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভারতবিরোধী হওয়া অতি স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত। তাই এ দেশের ভারতবিরোধীরাই খাঁটি দেশপ্রেমিক। এই খাঁটি দেশপ্রেমিকরাই যদি এদেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবে কারা? ভারত প্রেমিকরা? সেটাতো মনে হয় না। ওরাতো দেশের আর্ন্তজাতিক ভৌগলিক সীমা রেখা মুছে ফেলার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই হাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে। এ কারনে জোর লবিও করছে ওরা। দেশের সার্বভৌমত্বের অন্যতম প্রতীক দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকেও ওরা অপ্রয়োজনীয় বলে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। দেশের স্বতন্ত্র্য চরিত্রের অন্যতম খুঁটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঈমান, আকিদা, আচার-আচরণ, অভ্যোস ইত্যাদি স্বতন্ত্র বিষয়াদি ওরা তথাকথিত সেক্যুলার শিক্ষানীতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। মোট কথা এই যে, ভারতপ্রেমিকরাই বাংলাদেশের বারোটা বাজাতে আর কিছু বাকী রাখে নাই। এ অবস্থায় দেশ রক্ষা করতে পারে কারা? ভারতবিরোধীরাই ছাড়া অন্য আর কেউ কি? তাই বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রয়োজনে ভারত বিরোধীরাই এখন সাধারণ দেশপ্রেমিক। এরা দেশে থাকলেই দেশ রক্ষা পাবে। চলে গেলে দেশের মাটি থাকলেও দেশ থাকবে না। অতএব যারা ভারতবিরোধীদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেন তারা আর যাই হোন সুস্থ্য মস্তিস্কজন নন বলেই সঙ্গতভাবে মনে করা যায়। দেশ সবার। দেশপ্রেম কারো একচেটিয়া অধিকার নয়। আইনের নিরপেক্ষ মাপকাঠিতে দেশপ্রেমের বিচার হতে পারে। আর পারে ইতিহাসের স্বচ্ছ বিচার বিবেচনার মধ্যদিয়ে। তাই ক্ষণিকের আবেগে তাড়িত হয়ে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে দেশদ্রোহী বলে গালি দেন তাহলে তা কোন ভাল কাজ হতে পারে না। এ ব্যাপারে সাবধানতাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নিজ জন্মস্থানে সবার সমান অধিকার।

২৭/০৭/১৯৯৭ইং, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

চোরের মায়ের ডাঙ্গর গলা

বাংলাদেশে বোধকরি 'দালাল' এবং 'দালালী' শব্দ দুটির যারপরনাই অপব্যবহার হয়েছে। কিছু একটা ছুতানাতা হলেই এই শব্দ দুটি যে যার খুশি ব্যবহার করে। শত্রুপক্ষকে গালি দেয়ার জন্য এসতেমাল করে। বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক লাইন-আপ বহাল আছে বলে দেশের মানুষ জানে, তাতে কারা কার দিকে ঝুকে থাকে বা আছে তা বলা যায় সুস্পষ্ট। রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন্ দল কোন্ বিদেশী শক্তির সাথে জুড়ে আছে বা কাদের স্বার্থে কাজ করে, পলিসি ফরমুলেট করে, কে কোন্ আর্দশের প্রতি অনুগত, তা বাংলাদেশে খুব একটা অস্পষ্ট নয়। একই ভাবে আওয়ামীলীগ কি, কোন্ দর্শনে তারা রাজনীতি করে, বিদেশী কোন্ কোন্ শক্তি বা লবির সাথে তারা একাট্টা এবং কাদের প্রতি তারা অনুগত-এসব বিষয় এই ১৯৯৭ সালে আর আদৌ কোন রাখ-ঢাকের বিষয় নয়। তাই অনেকে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন যখন তাদের নেতারা গত ২২ জুলাই প্রকাশ্যে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন যে, ওরা 'ইহুদীবাদের দালাল'।

মানুষের মনে তাই স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশে কারা ইহুদিবাদের দালাল? কে কার দালাল বা কে কার হয়ে কোন্ কাজ করে বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে আজ এই বিষয়টা বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যক্রমের কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ অতি জরুরী। যে আওয়ামীলীগ অন্যদের বিষেশত তাদের বিরোধীদের ইহুদীবাদের দোসর হিসেবে লেভেল সেঁটে দিয়েছে, তাদের সেই অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করার আগে প্রথমে বিশ্লেষন করা জরুরী আওয়ামীলীগের চরিত্র, আদর্শ এবং ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য।

যারা আওয়ামীলীগের অতীত ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ-খবর রাখেন তারা ভাল করেই জানেন যে, আওয়ামী লীগ নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য অন্যের ঘাড়ে নিজেদের অপকর্ম চাপিয়ে দেয়। যেমন নিজেরা খুন করে অন্যের ঘাড়ে সে খুনের দোষ তারা চাপিয়ে দিয়েছে অতীতে বার বার। নিজের অপরাগতার দোষও তারা চাপিয়ে দিয়েছে বিরোধীদের উপর। এমন নজির এত বেশী মজুত আছে যে, তা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ঠিক একই ভাবে তারা আজ নিজেদের ইহুদীবাদের দোসর-এই বাস্তব অপবাদটি অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে কিনা, তা সন্দেহ করার বিষয় বটে। কেননা মুসলমান প্রধান এই বাংলাদেশে ইস্যুটি স্পর্শকাতর এবং শত্রুকে ঘায়েল করার এক মোক্ষম অস্ত্র বটে।

সচেতন মহলের জানা আছে যে, ইহুদীবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ ঐতিহাসিকভাবে আঁতাত করে চলে। বিশেষ করে মুসলিম দেশ, জাতি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইহুদীবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের যৌথ তৎপরতা সব সময়ই কার্যকর। মুসলমানদের ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য, শক্তি, ঐক্য এগুলো ওদের যৌথ হিংসা এবং আক্রমনের লক্ষ্যস্থল। এদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ যে ভারতের চির অনুগত, সে কথা কারো

www.pathagar.com

অজানা নয়। আর ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের অধিকাংশই যে ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, তা কে না জানে?

বস্তুতঃ মুসলমান দেশে যে সব রাজনৈতিক দল সেক্যুলারিজম নীতি মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তারা একই সাথে দিল্লী এবং ইসরাইলীদের আর্শীবাদ পুষ্ট। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন কোন মুসলমান দেশের সরকারের বা রাজনৈতিক দলের সাথে ওদের তেমন কোন বিরোধ নেই। বিরোধ হল তাদের সাথে যারা বা যেসব দল এবং দেশ ইসলামী আদর্শকে রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসাবে গ্রহণ করেছে বা মেনে চলতে চায়। এখানে আরও স্মরণযোগ্য যে, ভারতের কংগ্রেস-অকংগ্রেস নির্বিশেষে সব সরকারকেই ইসরাইল সব সময় সর্বাত্মক এবং আনকনডিশনাল সাহায্য ও সহযোগিতা করে এসেছে। উল্লেখ্য ভারতের 'র' (Raw) এবং ইসরাইলের 'মোসাড' (Moshad) মুসলিম বিরোধিতায় একাট্টা। এ কারনে ১৯৭১ এর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময় মাওলানা ভাসানীসহ তাঁর অনেক অনুসারী ভারতে অন্তরীন থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন ;

অভিযোগ রয়েছে যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে ভারত যখন জড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে ইসরাইল বিশেষ ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করছিল। তারই বিনিময় ওরা চেয়েছিল ভারতের আস্থাভাজন আওয়ামীলীগ সরকার থেকে। আরও অভিযোগ রয়েছে যে, এই ব্যাপারে ইসরাইল লবির সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল চট্টগ্রামের এক বড় ব্যবসায়ীর। সেই ব্যবসায়ীকে দিয়ে ইসরাইল-এর একটিভিস্টরা শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকারের উপর তখন বিশেষ ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছিল। ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যও এই পথে ঐ কলকাঠি নাড়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ-মুসলমানদের অনুভূতির কথা চিন্তা করেই তখন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেননি। তবে তার জীবদ্দশায় লবিটি স্বীকৃতি পাবার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। এ বিষয়ে যিনি প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী তিনি এদেশেরই একজন প্রবীণ সাংবাদিক। এই প্রবীণ সাংবাদিক লন্ডনে বসবাস করেছেন প্রায় ২৪ বছর যাবৎ। তিনি বিষয়টি আমাকে বলেছেন-যখন আমি ১৯৮২-৮৯ সময়কালে প্রায় ৮ বছর যাবৎ লন্ডনে তাঁর সাথে কিছু কিছু লেখালেখির কাজে জড়িত ছিলাম। এই তথ্যটি আমি আমার আরো অনেক লেখায় পরিবেশন করেছি।

ইসরাইল-এর সেই লবিটি এখনও একটিভ এবং তারাই ১৯৯৬ সালের জুনে এদেশে শেখ হাসিনা ক্ষমতা দখল করার পর আবার ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কথাবার্তা শুরু করেছিল এবং সেই কারণেই সেই সময় এই সরকারকে বিবৃতি দিয়ে বলতে হয়েছিল যে, তারা ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা ভাবনা করছে না। সবকারী এই ঘোষনার পরেও ঐ লবিটি যে এখন শেখ হাসিনার সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা থেকে বিরত হয়েছে, এমনটি ধরে নেয়া সঠিক নয়। শুধু এই দেশের নয়, গোটা এই উপমহাদেশের তাবৎ ভারতপন্থীদের সাথে আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের যে গভীর সম্পর্ক আছে এবং ইহুদী বড় বড় চাঁইদের (Stalwarts) সাথে যে তাদের সুসম্পর্ক বিদ্যমান, তার অন্যতম জীবন্ত প্রমাণ ব্রিটিশ লেবার এমপি পিটার শোর। এই পিটার শোর ১৯৯৬ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগকে মদদ দেয়ার জন্য

www.pathagar.com

এদেশে এসেছিলেন এবং কিছুদিন অবস্থানও করেছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি যে বিগত প্রায় ২৫/৩০ বছর যাবৎ আওয়ামীলীগকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের মদদ যুগিয়ে চলেছেন, কোন আওয়ামী লীগারের পক্ষেই তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

১৯৮০এর দশকে প্রায় ৮ বছর আমি যখন লন্ডনে ছিলাম, তখন ও দেশে (বৃটেনে) আওয়ামী লীগের বহু ধরনের সভা, সমিতি, বৈঠক ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সব অনুষ্ঠানের প্রায় প্রত্যেকটিতে এই বৃটিশ লেবার এম পি পিটার শোর অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। তার উপস্থিতি না হলে আওয়ামীলীগের কোন সভা কোন বৈঠক বা কোন অনুষ্ঠানই যেন জমতো না। কোন কোন সভায় তিনি থাকতেন প্রধান অতিথি, কোন অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা আবার কোন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি। যখন লন্ডনে আওয়ামীলীগের হয়ে আওয়ামীলীগের জন্য কথা বলার কেউই ছিলেন না, তখনও এই ইহুদী বাদী কট্টোর ইহুদী পিটার শোর আওয়ামীলীগের ঝান্ডা বয়ে বেড়িয়েছেন। ঐ সময়কালে হাসিনা যখনই লন্ডনে গেছেন তখনই তার যে কোন মিটিং কিংবা বৈঠকে পিটার শোর অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। এটা শুধু আমার কথা নয় হাজার হাজার লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশী-এর সাক্ষী। মনে রাখা বা স্মরণ করা জরুরী যে, তখন শেখ হাসিনা মাথায় পট্টি লাগানো তো দূরের কথা, তিনি যে একজন মুসলিম মহিলা তাও তার ব্যবহারে প্রকাশ পেত না। ওই সব বৈঠক অনুষ্ঠান ছাড়াও অন্যত্র ওই ব্রিটিশ ইহুদী এমপি পিটার শোর এর সাথে তাঁর করমর্দনের ছবিসহ ওই দেশের অনেক পত্র-পত্রিকায় তখন এতদসংক্রান্ত আরো অনেক খবরই প্রকাশিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে এই ইহুদী লেবার এমপি পিটার শোর ইহুদীবাদের একজন নামী দামী আন্তর্জাতিক নেতা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কালীন লন্ডন লবির আরেক খ্যাতিমান নেতা ছিলেন জন স্টোন হাউজ এমপি। তার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ তহবিলের কোটি কোটি পাউন্ড আত্মসাৎ করার অভিযোগ এখনও বাসি হয়নি। এই পিটার শোর ছিলেন সেই জন স্টোন হাউজের ঘনিষ্ঠদের একজন।

ইহুদীরা 'আহলে কেতাব' হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম জাতি সত্তার এক বড় দুশমন। এই শত্রুতা বিগত দেড় হাজারের বছরের অর্থ্যাৎ সুদীর্ঘকালের। দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের সংখ্যা এবং শক্তি বৃদ্ধি পাবার কারনে ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে নামার কথা এখন বেশী একটা ভাবে না। তারা বরং পরোক্ষ যুদ্ধে মুসলমানদের ঘায়েল করার জন্যই এখন ফন্দি-ফিকির এঁটে চলেছে। মুসলমানদের দেশে দেশে যেসব গ্রুপ বা দল রাষ্ট্রীয় দর্শন হিসাবে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার পলিসি অনুসরণ করে, তাদেরকেই ইহুদী লবি মদদ দিয়ে থাকে। কেননা, এই দর্শনের পথ ধরে মুসলমান সমাজে আস্তে ধীরে হলেও ইসলামের পথ থেকে সরানো সম্ভব বলে তারা মনে করে।

আলোচনার প্রয়োজনে বলতে হয়, শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগ বাংলাদেশে ক্ষমতায় বসার পর থেকেই ১৯৭২-৭৫ সময়কালে এই ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আর্দশ হিসাবে গ্রহন করে এবং গোটা দেশে ব্যাপক ডি-ইসলামাইজেশন (De-Islamization) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে এগিয়ে আসে। ভার্সিটির মনোগ্রাম থেকে

www.pathagar.com

কোরআনের আয়াত, মনোগ্রাম উচ্ছেদ, সলিমুল্লাহ হল থেকে 'মুসলিম' শব্দের নির্বাসন তারই কু-ফসল। এককথায়, দেশের যেখানে যেখানে নিশানা ও নমুনা বা Emblem হিসেবে ইসলামী প্রতীক চিহ্ন ছিল, তখন তার সব কিছুই উৎপাটন করা হয়। ইসলামী শিক্ষার অবসান ঘটানোর চেষ্টা শুরু হয় ঐ সময়ে, ঠিক তেমনি ধরনের প্রচেষ্টা এখন চালাচ্ছেন শেখ হাসিনার বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারও। এই কারনেই তখন যেমন মুজিবের বিরুদ্ধে এ দেশের মুসলমানরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন, ঠিক একই ভাবে এখনও আহত মুসলমানরা শেখ হাসিনার De-Islamization প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। এর সর্বশেষ নমুন বায়তুল মোকাররম মসজিদের আওয়ামীকরণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড়।

এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অতি স্বাভাবিক। এই প্রতিবাদীরা নিজেদের ঈমান-আক্বিদার তাকিদেই আওয়ামীলীগ সরকারের ইহুদীবাদী লবির ইসলাম বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু একই সঙ্গে এদেশের মানুষ গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, যখন ইহুদীবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে এদেশের মুসলমানরা সোচ্চার হয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, ১৫ই জুলাই সর্বাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করেছে, তারপরই একটি মহল এই মুসলমানদের "ইহুদীদের দালাল" বলে গালি গালাজ করা শুরু করে দিয়েছে। এদের সাথে গলা মিলিয়েছে একশ্রেণীর সংবাদপত্র, কিছু কিছু মুখচেনা সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং পন্ডিতমূর্খ একদল বুদ্ধিজীবী। এরা কিন্তু ভাল করেই জানে যে, এদেশের ইহুদীবাদী কে এবং কারা? এরা আরো জানে যে, বৃটিশ ইহুদী বাদী এমপি পিটার শোর এর সাহায্য ও আশীর্বাদ এদেশের কোন্ রাজনৈতিক দলের উপরে আবিরাম বর্ষিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তারা আরও জানে, 'র' ও 'মোসাড'-এর আঁতাত এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এবং সেই সাথে বিশেষভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইহুদীবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের যৌথ চক্রান্ত। জেনে-শুনেই এবং বিশেষ করে নিজেদের গা-বাঁচাবার জন্যই এইসব মহল আজ এতটা সোচ্চার। গোলমেলে অবস্থায় খোদ চোর-ই যেন 'চোর চোর' বলে অন্যদের দৃষ্টি ভিন্নদিকে ফেরাবার চেষ্টা করছে। চোরের মায়ের ডাঙ্গর গলা বুঝি একেই বলে।

২৮/০৭/১৯৯৭ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর বিবিসি সাক্ষাৎকার 'হার মাষ্টার্স ভয়েস'!

'হার মাষ্টার্স ভয়েস'-'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' নয়। ইংরেজী ব্যাকরণের জেন্ডারের কারনে। যাহোক জেন্ডার এখানে মূখ্য বিষয় নয়। প্রধান বিষয় হচ্ছে কার সুরে সুর মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য পেশ করেছেন বিবিসি অর্থাৎ ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের সাথে ৪ সেপ্টেম্বরের সাজানো অনুষ্ঠানটিতে? অনুষ্ঠানটিকে সাজানো বলতে হচ্ছে একারনে যে, দেশের প্রধান প্রধান বিরাজমান সমস্যা যেমন দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যাংক রির্জাভের মারাত্মক অভাব, অব্যাহত সন্ত্রাস, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, প্রশাসনে অদক্ষতা, নজিরবিহীন দুর্নীতি, সংসদীয় ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা ইত্যাদি কোন মৌলিক বিষয়ই এই ১৫ মিনিটের সাক্ষাৎকারে স্থান পায়নি। স্থান পেয়েছিল এমন কয়েকটি বিষয় যা কিনা বাংলাদেশের মানুষের আধিপত্যবাদ বিরোধী মনোভাব যেন নিউট্রাল করতেই ব্যবহৃত হয়েছে। গঙ্গার পানি বন্টন প্রশ্নে ভারতের দেয়া বক্তব্যই শেখ হাসিনা তুলে ধরেছেন। ট্রানজিট ও চাকমা সমস্যা নিয়েও দিল্লীর কথাই তিনি সবাইকে শুনিয়েছেন। আমাদের বুঝিয়েছেন যে এইসব প্রশ্নে ভারত যেমনটি ভাবে, চিন্তা করে, করতে চায়, তাই-ই বাংলাদেশের করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের হয়েই কথা বলেছেন। তাদের বা দিল্লীর দৃষ্টিভঙ্গিতেই বাংলাদেশের মানুষকে পাঠ দিয়েছেন।

বিবিসি বাংলা বিভাগের ঐ সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠানে যারা শেখ হাসিনার কথাবার্তা শুনেছেন তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে তার সব বক্তব্যই ছিল 'নন্দঘোষে'র দিকে যেন বন্দুক তাক করা। ঐক্যমত্যের সরকারে বিএনপি আওয়ামী লীগের ডাকে সাড়া দেয়নি, ফারাক্কা পানি বন্টন চুক্তিতে বিরোধিতা করেছে ইত্যাদি। বিএনপি অবশ্যই আওয়ামীলীগের বিরোধীতা করেছে। করার কারন কিন্তু দুর্বল নয়, সবল। বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা করেনি। যুক্তিযুক্ত কারনেই বিরোধীতা করেছে। বিএনপি 'বাকশাল' পুনঃ প্রতিষ্ঠার ডাকে সঙ্গত কারনেই সাড়া দেয়নি। কেননা, সংসদীয় গণতন্ত্রে 'বাকশাল' বা তথাকথিত গণতন্ত্রের ঐক্যমতের সরকারের কোন অবকাশ নেই। ফারাক্কা প্রশ্নেও একই কথা। আর্ন্তজাতিক নদী গঙ্গা/ পদ্মাকে দ্বিপাক্ষিকতার বলয়ে আবদ্ধ করার কোন অধিকার দিল্লীর ছিল না যে অধিকার শেখ হাসিনা ওদের লিখিত দিয়ে দিয়েছেন। আত্মঘাতী ভাবে ৩০ বছরের জন্য। এ হচ্ছে ১৯৭২ সালের পাক-ভারত সিমলা চুক্তির মত ঘটনা। কেননা, সেই থেকে দিল্লী বলে আসছে যে, যেহেতু পাকিস্তান সিমলা চুক্তি-১৯৭২ সালে সই করেছে, তাই কাশ্মীর সমস্যা এখন আর আন্তর্জাতিক কোন ইস্যু নয়-জাতিসংঘের আর কোন এখতিয়ার নেই কাশ্মীর নিয়ে কথা বলার। একই ভাবে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি বন্টন ও প্রাপ্তি প্রশ্নে ভারত যুক্তি দিতেই থাকবে যে পানির ভাগাভাগি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হতে পারে-আন্তর্জাতিক বা বহুপাক্ষিক কোনরূপ কথাবার্তা বা দফা-রফার কোন অবকাশ নেই। বাংলাদেশ ন্যায্য পানি না পেলে দিল্লীর কাছে ভিক্ষা চেয়ে বড়জোর দরখাস্ত করতে পারবে-সমতার ভিত্তিতে

www.pathagar.com

অধিকারের প্রশ্ন তুলে বারগেইন করতে পারবে না। তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা বা এমনকি জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত নাকচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শক্তিশালী ভারতের মোকাবিলায় ঢাকার সরকার এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল বাংলাদেশ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ওদের দ্বারস্থ হবে মাত্র।

পানি চুক্তি হল সুদীর্ঘ ৩০ বছরের জন্য। কথিত চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ যদি ভাটিতে সত্যি সত্যিই ন্যায্য হিস্যার পানি পেতে পারে তাহলে ঐ পদ্মা নদীতে বাঁধ দেয়ার কি কোন প্রয়োজন থাকতে পারে? গঙ্গা নদী থেকে ফারাক্কা বাঁধের ভাটিতে যদি পানির স্বাভাকিব প্রবাহ বা আল্লাহ প্রদত্ত ধারার পরিমাণ ও গতি সঠিক থাকে তাহলে বাংলাদেশ স্বাভাবিক পানি প্রবাহের ফলে অতীতের ন্যায় একই ভাবে সুফল পেতেই থাকবে। কিন্তু ফারাক্কায় এবং আরো উজানে ভারতে গঙ্গা থেকে যদি পানি ওরা অস্বাভাবিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলেই কেবল বাংলাদেশ পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে ভাটিতে খরাজনিত কারনে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কৃষি, শিল্প, মৎস উৎপাদন মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হবে। মরুকরণ প্রক্রিয়াও বৃদ্ধি পাবে বছর বছর। আনুষঙ্গিক আর যা যা ক্ষতি তাতো হবেই। মোট কথা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ যদি ফারাক্কার ভাটিতে পদ্মার স্বাভাবিক প্রবাহের পানি না পায়, তাহলে এই সব ক্ষতি কিয়দংশে পুষিয়ে নেয়ার বা নিয়ন্ত্রন করার জন্য পদ্মায় বাঁধ দেওয়ার বিষয় বাংলাদেশকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। শেখ হাসিনার সরকার তাই করতে চলেছেন বলে খবরাদি প্রকাশ হয়ে চলেছে। তারা এডিবি সহ বিভিন্ন বিদেশী সংস্থার কাছে এই পদ্মা বাঁধ নির্মাণ বাবদ অর্থ সাহায্যের জন্য ধরণাও দিচ্ছে সম্প্রতি। কিন্তু কেন? বাংলাদেশ যদি ৩০ বছর মেয়াদী অনেক ঢাক-ঢোল পেটানো পানি চুক্তি অনুযায়ী ন্যায্য হিস্যার বা প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক পরিমাণ পানি পেতে দিল্লীর কাছে নিশ্চয়তা পেয়েই থাকে, তাহলে আর পদ্মা বাঁধ নির্মাণের জন্য শ' শ' কোটি টাকা খরচ করার পরিকল্পনা কি অহেতুক নয়? অযৌক্তিক নয়? তাহলে কি শেখ হাসিনার সরকার ঐ ৩০ বছরের চুক্তি করার পরও নিশ্চিত হতে পারছে না যে এদেশ সত্যি সত্যি পানি পাবে কিনা? চুক্তিটি তাহলে কি শুভংকরের ফাঁকি হচ্ছে না? তাছাড়াও কথা আছে। ভারতের একগুঁয়েমির ফসল ফারাক্কা বাঁধের অশুভ ফলাফলের জন্য যদি পানি সরবারাহ হ্রাস পাওয়ার কারনে বাংলাদেশকে পদ্মা বাঁধ নির্মাণে শ' শ' কোটি টাকা খরচ করতেই হয়, তাহলে এই অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভারতকেই যোগান দিতে হবে। এই ক্ষতির জন্য ঢাকার উচিত হবে এখুনি দিল্লীর কাছে এই শ' শ' কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের জন্য দাবী উত্থাপন করা। একই সাথে বিগত প্রায় ২৩ বছর যাবৎ ভারত ফারাক্কা বাঁধ দেয়ার কারণে বাংলাদেশ যে ফি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতির কারণ হয়েছে তার জন্যও আলাদা ভাবে ক্ষতিপূরণের দাবী করে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করা উচিত। এসব তো গেল শুধুমাত্র ফারাক্কা বাঁধ এবং পানি চুক্তি নিয়ে শেখ হাসিনার বাগাড়ম্বরের কিঞ্চিৎ জবাব মাত্র। কিন্তু যে বিষয়টি শেখ হাসিনা বিশেষ ভাবে ভারত তোষণের জন্য ঐ সময় উল্লেখ করেছেন তা এখনো আমি উল্লেখ করিনি।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার দৃষ্টিতে বেগম জিয়া নাকি ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের জন্য সমর্থন দিয়ে নিজ দেশের বিরুদ্ধে সেদেশের নাগরিকদের উসকিয়ে দিয়েছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা, মিজো, বোডো, অহমী ইত্যাদি যেসব জাতির মানুষ দিল্লীর গোলামি থেকে আজাদীর জন্য সুদীর্ঘকালব্যাপী অব্যাহত সংগ্রাম এবং যুদ্ধরত আছেন সেসব দুনিয়ার সচেতন মানুষের জানা। যেমন জানা আছে কাশ্মীরীদের ভারত থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়। এসব জাতিসত্তার কেউই নিজেদের ভারতীয় বলে বিশ্বাস করে না। ওদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কারণে তারা এক একটা সুনির্দিষ্ট জাতি। লাখ লাখ সেনা মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কার্যতঃ ওসব অঞ্চল দিল্লীর নিয়ন্ত্রনের বাইরেই থাকছে। শতসহস্র প্রাণ তারা বিসর্জন দিচ্ছে নিজেদের আজাদী সুনিশ্চিত এবং সংহত করার জন্য। কার না জানা এসব হাল ইতিহাস? অবশ্য দিল্লীর চোখে ওরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। আমরা বাংলাদেশীরাও ১৯৭১ সালে বিচ্ছিন্নতাবাদী নামে ইসলামাবাদ সরকার কর্তৃক কথিত হয়েছিলাম। ঠিক একই ভাবে দিল্লীও কি 'পূর্ব ভারতীয়' বা কাশ্মীরীদের চিহ্নিত করছে না? বাংলাদেশ কোন্ যুক্তিতে ওদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন না করে পারে? সমর্থন না করলে আমাদের নিজেদের একাত্তরের স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই কি কথা বলা হয় না? এমন আচরণ কি বাংলাদেশের কোনো দেশপ্রেমিক নেতা করতে পারেন?

কিন্তু শেখ হাসিনা এবং তার সরকার তেমনটিই করে যাচ্ছেন। বিবিসি'র সাক্ষাৎকারেও তিনি এ বিষয়ে এমন সুরে এমন ভাবে কথা বলেছেন, যাতে ঢাকার নয়, দিল্লীর স্বার্থই প্রতিধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠে। এটাকে 'হার মাষ্টার্স ভয়েস' ছাড়া কী-ইবা বলা যেতে পারে?

১০/০৯/১৯৯৭ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

তবে কি আদভানী ও হাসিনা একই গন্তব্যের যাত্রী?

খবরে প্রকাশ, ভারতীয় জনতা পার্টি নেতা এল কে আদভানী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে পুনঃ ভারতের সাথে একীভূত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি এক নির্বাচনী প্রচারণা সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি এই আহব্বান জানান।

আদভানীর এই আহ্বানকে নেহাৎ নির্বাচনী টক টক (Talk talk) হিসেবে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। কেননা, শুধু আদভানী বা তার ভারতীয় জনতা পার্টি মাত্র নয়, একই বক্তব্য কংগ্রেসসহ অন্য পার্টিও দিতে পারে। দিতে পারে এজন্য যে, 'একীভূত' বা 'পুনঃএকত্রীকরণ' বিষয়টি অনেক ভারতীয়দের মনে একটি আকাঙ্খা হিসাবে জেগে আছে। অনেক নির্বাচকই এই ওয়াদাটি দল বিশেষের কাছে শুনতে চায়। এই বিষয়টি যেমন অনেক ভারতীয়দের মনে ছিল ১৯৪৭ পূর্ব সময়ে তেমনি ১৯৪৭-৭০ সময়কালে এবং ১৯৭২-এর পর আরো জেগেছে অনেক তীব্র আকারে। তীব্র আকারে এজন্য যে, ভারতের রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ প্রমুখ সবাই ১৯৭১ এর পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হবার পর নিশ্চিত করে বলা শুরু করেছিলেন যে, ১৯৪০ দশকের দ্বিজাতিতত্ত্ব বা ভারত উপমহাদেশে মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব যেহেতু টিকে থাকেনি, সে কারনে ভারতের পুনঃএকত্রীকরণ একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এই ঘটনা একটি সময়ের ব্যাপার মাত্র।

১৯৭২-৭৫ সময়কালে বাংলাদেশে যারা ক্ষমতায় ছিল, তারা সেই একত্রীকরণের লক্ষ্যে কাজও করছিল। দেশের অর্থনীতি, শাসনতন্ত্র, উন্নয়ন পরিকল্পনা, শিক্ষা বিন্যাস ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সেই দিকেই পরিচালিত করছিল। কিন্তু বাঁধ সেধেছিল বাংলাদেশের মানুষ। দেশপ্রেমিক জনগণ। আর এই জনগণের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে।

সে দিন দেশের মানুষ মনে-প্রাণে চাইছিল, না, আর না, অনেক হয়েছে, অনেক ছাড় দেয়া হয়েছে দিল্লীকে। দিল্লী-মস্কোর দুরভিসন্ধি বা দুরাশার কাছে এ দেশের মানুষ নিজেদের বিশ্বাস, জীবনবোধ, মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে পারে না। নিজেদের ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং স্বাতন্ত্র্য নিয়েই মানুষ বাঁচতে চায়। আজাদ থাকতে চায়। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের সফল অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে এবং ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার উত্থান এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দিল্লীর সেই একত্রীকরণের ইচ্ছায় ছেদ পড়েছিল। তারা যারপরানাই আহত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ নিজস্ব চেতনায় এগিয়ে চলেছিল। এগিয়ে চলেছে ১৯৭৫-এর শেষ থেকে বলা যায় ১৯৯৬-এর মাঝা-মাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় দুই দশকব্যাপী।

বাংলাদেশের মানুষ সেই থেকে এ যাবৎ দিল্লীর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের 'অখন্ড ভারতে'র স্বপ্নের ধরা ছোয়ার বাইরে থাকার প্রয়াস পেয়েছে। পিন্ডি ছেড়েছে দিল্লীর তাবেদার হবার জন্য নয়। তথাকথিত 'অখন্ড ভারতে'র বাইরেই বাংলাদেশ আজাদ থাকায় বিশ্বাস করে। আজাদ থেকেই সমুজ্জল হতে চায়। ১৯৪৭ সালের ভারত

www.pathagar.com

বিভক্তিকে রিকনফার্ম (Reconfirm) করতে চায়। করছেও তাই। এতসব বাস্তবতা দেখেও আদভানীরা কেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে সেই পুরানা বিষ খাওয়াতে চায়? বাংলাদেশ বা পাকিস্তানতো দূরের কথা, তাদের পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যকেই কি আর বেশীদিন জোর জবরদস্তি করে ভারত ফেডারেশনে ধরে রাখতে পারবে?

মনে তো হয় না। আর সেটা না পারার কারন যখন আদভানীদের কাছে সুস্পষ্ট এবং যে কারনে আদভানীর মতো উগ্র হিন্দু জাতীয়বাদী নেতা পর্যন্ত উলফা, নাগা, মিজো ইত্যাদি জাতীয় নেতাদের সাথে 'গোপনে' আলাপ করছে, যে খবর বিবিসি গত ১১ ফেব্রুয়ারী রাতে প্রচার করেছে এবং যা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়, ঠিক প্রায় একই নিঃশ্বাসে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাথে তাদের ফেডারেশন পর্যায়ে 'একত্রীকরণ' প্রস্তাব কি রহস্যজনক মনে হয় না। মিজো, নাগা, আহমীয়রা কি ভারতীয় ফেডারেশন চাইছেন নাকি পূর্ণ স্বাধীনতা চাইছেন দিল্লী থেকে? সবাই জানে যে ওরা পূর্ণ আজাদীর জন্য সংগ্রামরত। যুদ্ধরত। অকাতরে স্বাধীনতার জন্য অনেকেই প্রাণ দিচ্ছে।

সম্প্রতি গোলাপ বড়ুয়া বা অনুপ চেটিয়ার ঢাকায় গ্রেফতারের পর উলফাদের যেসব বিবৃতি-বক্তব্য জানা গেছে তাতে তিনি সুস্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাদের যে চেতনায় উজ্জীবিত করেছিল সেই স্বাধীনতার চেতনার কারনেই তারা 'উলফা' বা 'আলফা' (ULFA) সংগঠিত করেছেন। একই প্লাটফরম থেকে যুদ্ধ করে চলেছেন দিল্লীর নিয়ন্ত্রন থেকে আজাদী লাভের জন্য। মিজো ও নাগারা একই কথা বলছে। তারাও স্বাধীনতা চায়। এই যখন ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের বাস্তব অবস্থা। কাশ্মীরের আজাদী সংগ্রামের কথা না হয় এখানে পুনরুল্লেখ না-ই করলাম, তখন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদানের আহবান কি একটি হাস্যকর বিষয় নয়?

তবে হ্যাঁ, আন্দাজ করা যায় যে, বিষয়টি যতই হাস্যকর হোক না কেন, তিনি এই নির্বাচনী প্রচারের 'পিক' আওয়ারে কথাটি বলে একদিকে যেমন দেশে অধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহের প্রয়াস পেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে পাকিস্তানকে না হোক, অন্ততঃ বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারকে একটি বিশেষ সিগন্যাল দিতে পেরেছেন। সিগন্যালটি হচ্ছে এই শেখ হাসিনার আওয়ামীলীগ সরকার যেভাবে দিল্লীর জন্য কাজ করছেন, দিল্লীর স্বার্থ রক্ষা করছেন, দিল্লীকে খুশি করছেন, দিল্লীর জন্য পানি চুক্তি করছেন, দিল্লীর তাবেদারী করার জন্য তথাকথিত 'শান্তি চুক্তি' করেছেন-দিল্লীর কাছে দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সব সঁপে দিয়েছেন-এবং সর্বশেষ ভারতীয় ফেডারেশন গঠন করার জন্য 'র' এর পরিকল্পনায় যে ত্রিদেশীয় (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) তথাকথিত 'বিজনেস সামিট' ১৯৯৮ সালের মধ্য জানুয়ারীতে 'সফল'ভাবে করে ফেললেন তাতে বিজেপি হাসিনার উপর অনেক অনেক খুশি হয়েছেন। কেননা তারা ভাবছে যে বিজেপিই পরবর্তী নির্বাচনে দিল্লীতে ক্ষমতায় বসছে এবং তা হলে এই ফেডারেশন পরিকল্পনায় হাসিনা সবচেয়ে বেশী কাজে লাগতে পারে।

তাছাড়া হাসিনার বিভিন্ন সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠনগুলো যেভাবে গত দেড় বছরে বাংলাদেশকে ভারত নির্ভর করে ফেলেছে, ভারতের তাঁবেদারীতে সবকিছু

www.pathagar.com

পাকাপোক্ত করেছে তাতেও বিজেপি এর ভারত পুনঃএকত্রীকরণ স্বপ্ন বহুলাংশেই ফল লাভ করেছে। কে জানে এদের দু'দলের মধ্যে ফরমাল একত্রীকরণ ঘোষনা সময়ের ব্যাপার মাত্র কিনা। তথাকথিত সেক্যুলার হাসিনা এবং উগ্র হিন্দুবাদী আদভানীর মধ্যে আপাতঃ বিভেদ থাকলেও একটি ইস্যুতে তাদের হুবুহু মিল আছে। তারা এই উপমহাদেশে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যে কোন ভাবেই বিশ্বাস করে না। ১৯৪০-৪৭ সময়কালের মুসলিম জাতিসত্তার আন্দোলনকে তারা কোন আমলই দেন না। অথচ সুস্থ বিবেকবান প্রতিটি মানুষই স্বীকার করতে বাধ্য যে, ১৯৪৭ এর বিভক্তির ভিত্তি মেনে না নিলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান কোন দেশই আলাদা সীমানা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। আদভানীরা বা কংগ্রেসীরা কোন ভাবধারায় বিশ্বাস করেন বা না করেন, সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলব তার সুফল ভোগ করব অথচ ১৯৪৭ এর বিভক্তির বিষয়ে আদভানীদের বটিকা সেবন করব, তা মেনে নেয়া যায় কিভাবে? কিভাবে আওয়ামীদের মেনে নেয়া যায় বাংলাদেশের আজাদী রক্ষক হিসাবে? শোনা যায় দিল্লীতে শেখ হাসিনার একটি বাড়ী রয়েছে, আর তা নাকি আদভানীরাই কিনে নিয়ে শেখ হাসিনাকে দান করেছেন এ ঘটনা কি সত্য?

ঢাকায় ক্ষমতাসীন হাসিনা, ওদিকে দিল্লীতে আগামী মার্চ-এপ্রিলে আদভানীর ক্ষমতায় বসলে তবে কি বাংলাদেশের ভারত ফেডারেশন একটি নতুন ধাপে পৌছবে? এ জন্যই কি তার এ আহ্বান?

১৩/০২/১৯৯৮ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনাকে নিয়ে পশ্চিমাদের মোহভঙ্গ শুরু

বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকাতে বেশ কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন শেখ হাসিনার সংবাদপত্র দলনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাদের কেউ কেউ হাসিনাকে তার বাবা শেখ মুজিবের স্বেচ্ছাচারী অগণতান্ত্রিক এসব কার্যক্রমের পথ পরিহার করতে উপদেশ দিয়েছেন। আহবান জানিয়েছেন তার যতসব গণতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রম যেমন একটি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জঘন্য পথ থেকে বিরত থাকতে। তা না হলে তারা পস্টাপষ্টি না বললেও বুঝা যায় যে, তারও পতন অনিবার্য।

তাদের যা করার তা করেছেন- আমি বলব বেশ একটি ভাল কাজই করেছেন- হাসিনার প্রতি ঐ আহ্বান রেখে। কিন্তু একই সাথে প্রশ্ন দাড়াচ্ছে, শেখের মেয়ে কি তাদের সে সৎ ও উত্তম আহ্বানে আদৌ সাড়া দিবেন? নাকি তোষামোদকারী অন্যদের তেলে নাক ডেকে ঘুমাবেন?

গত ৩ মার্চ সকালে যখন দৈনিক একটি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটি পড়ছিলাম, তখন ক'দিন আগের অন্য একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। একটি প্রাইভেট ডিনারে ঘটনাটি ঘটেছিল। নতুন পরিচিত একজন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সরকারী অফিসার ঘটনাটি আমাকে একান্তে জানিয়েছেন। কথা প্রসঙ্গেই আমার কানে কানে তিনি বললেন, 'শেখ মুজিবের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলাম। শেখের অনেক ঘটনার আমি সাক্ষী। তিনি কোন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির একজন মানুষ ছিলেন, এমনটা বলা যাবে না। কিন্তু তার মেয়েটিতো আরো .....' আমি একটি ছোট্ট উত্তর দিয়েছিলাম, এ ধরনের লোকের শাসনই যে আমাদের ভাগ্য।

অতি নিকটজনের কেউ যখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এমনটি জানেন, তখন যদি দেশের ভিতরে কিছু তোষামোদকারী বা ইংরেজী ভাষায় সাইকোফ্যান্টস তাকে অতিমাত্রায় তোষামোদ করে তাহলে গোবর মার্কারা যে ধরাকে সরা জ্ঞান করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? ঠিক মুজিবও এমনটিই করতেন। একজন নামীদামী পশ্চিমা সাংবাদিক মুজিবকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'মুজিব তার সমালোচকদের একেবারেই সহ্য করতে পারেননা'। বস্তুতঃ তিনি অনেক সমালোচককে বিভিন্ন ভাবে এমনকি দৈহিক ভাবেও নিশ্চিহ্ন পর্যন্ত করেছেন। ফলে তাকে নির্ভর করতে হয় তোষামোদকারীদের কথাবার্তায়। এদের সাজেশনই তিনি শুনতেন। এরাই তাকে ঘিরে রাখত সবসময়। পরে যখন সময় প্রায় শেষ তখন কিঞ্চিৎ বোধোদয় হলে পর তিনি এদের নাম দেন 'চাটার দল'।

শেখ হাসিনার 'চাটার দল' কিন্তু শুধু দেশের মধ্যেই সীমিত নয়, বিদেশেও ওরা জুটেছে। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ওরা বেশী সফিসটিকেটেড। ওদের সফিসটিকেশন যেমন এপ্রোচে, তেমনি ভাষা শব্দ প্রয়োগেও। ওদের সৌজন্যমূলক শব্দ সমষ্টিকে আমাদের গোবররা তাদের কৃতকার্যতার স্বীকৃতি বলে প্রচার করছেন। ওরা যে 'মুখে শেখ ফরিদ' বললেও বগলে ব্যবসায়ীর বা পকেটমারীর 'ইট' লুকিয়ে রাখে। তা

www.pathagar.com

এই গোবররা বুঝবেন কি করে! তাই ক্লিনটন-টনি ব্লেয়াররা যে পত্রে নিজেদের দেশের ব্যবসায়িক কোম্পানীর জন্য তেল ও গ্যাস এর কোটি কোটি টাকার ব্যবসা পাবার জন্য ডেসপারেট চেষ্টা করছেন, কিছু সৌজন্য মূলক শব্দ চয়নও ব্যবহার করে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে তোষামোদ করেছেন, তখন এরা সবাই ব্যবসায়িক দুরভিসন্ধিকে নিজেদের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মহাত্ম বলে বিটিভি ও সাইকোফ্যান্টদের মিডিয়াতে সজোরে প্রচার করেছেন। দেশের সকল মানুষ তাদের এসব গোবর বুদ্ধি যে মেনে নিবে না, তাও এরা বোধকরি বুঝে না!

গোবররা তোষামুদী পছন্দ করে। শেখ মুজিব করতেন। হাসিনাও করেন। সেদিন একজন এমপিকে দেখলাম বিটিভিতে নেগেটিভ তোষামোদ করছেন হাসিনাকে। হাসিনাও বেশ উপভোগ করছেন। মুচকি হাসছেন, আত্মতৃপ্তি পাচ্ছেন।

নেগেটিভ তোষামোদটি ছিল-বিরোধী দলীয় নেত্রীর একটি সাম্প্রতিক বক্তব্যকে উপহাস করা নিয়ে। মুজিব কোটধারী সেই এমপি সাহেবের চেহারা একটু উৎসাহ-ঔৎসুক্য নিয়ে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখছিলাম টিভির পর্দায়। কেন আমার এত উৎসাহ-ঔৎসুক্য ছিল সেকথাটি একটু বিস্তারিত বলতে চাই এখানে।

যেদিন বিটিভি'র পর্দায় ঐ এমপি সাহেবের বক্তব্যাদি শুনছিলাম তার মাত্র দু'তিন দিন আগে মফস্বল শহর থেকে আমার একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঢাকায় এসে আমাকে ঐ এমপি সাহেব এর কিছু কান্ড-কীর্তি-অপকর্ম নিয়ে কিছু তথ্য দিয়েছে। আমার সেই প্রাক্তন ছাত্র একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ এর নয়মাস ওপারে থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে। তখন ওর বয়স ছিল ১৭ কি ১৮ বৎসর মাত্র। এখন তার বয়স ৪০ এর মাঝামাঝি। স্বাধীনচেতা। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসা করে এযাবৎ সার্ভাইভ করছে। সাধ্যমত সৎ জীবন যাপন করে। তাতে আমি উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দেই-এ কারনেই এতদিন পরও আমাদের সম্পর্ক-হৃদয়ের সম্পর্ক বজায় আছে-আমার হাজার হাজার প্রাক্তন ছাত্রের যাদের বেশির ভাগই আমার জানা মতে অনৈতিক জীবন যাপন করে। তাদের সাথে যেমন আমার কোনরূপ মনের সম্পর্ক নেই। এই প্রাক্তন ছাত্রটি তাদের মত নয়।

যা হোক এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি তার মফস্বল শহরে একটি যৌথ ব্যবসা দাড় করাবার কাজে কিছুদিন থেকে চেষ্টা করছিল তা আমি জানি। সেই ব্যবসায়ী সংগঠন কোন পর্যায়ে আছে আমি তা জানতে চাইলে সে ঐ এমপি সাহেবের ও তার চেলা চামুন্ডাদের চাঁদাবাজির একটা ঘটনা জানিয়ে দুঃখ করল। তাদের সেই প্রজেক্ট এর কাজের শুরুতে কিছু মাটি ভরতির কাজ ছিল। সে কাজ যখন তারা শুরু করে, তখন একদল মাস্তান এসে চাঁদা চাইল। মাত্র এক লাখ টাকা। তারা তা তাৎক্ষণিক দিল না। দিতে পারল না। তাই মাস্তানরা কাজ বন্ধ করিয়ে দিল। তখন উদ্যোক্তারা ওই এমপি সাহেবের স্মরণাপন্ন হল। এমপি সাহেব পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেসটা একটা রফা করে দিলেন। তারা ক'দিনের মধ্যেই ঐ এমপি সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বুঝিয়ে দিলেন। এরপর তারা মাটি ভর্তির কাজের অনুমতি পেলেন।

www.pathagar.com

আমি তার কাছে এই এমপি সাহেবের আরো অনেক অপকর্মের খোঁজ খবর পেলাম। সেসব আজ থাক। যে বিষয়টি বলার জন্য এ ঘটনাটি উল্লেখ করলাম তা পাঠক নিশ্চয়ই আমি না বললেও বুঝতে পারছেন। তবুও একটু রিপিট করি। আমাদের ট্রিপল ডক্টরেট ডিগ্রীধারী প্রধানমন্ত্রী যাদের পজিটিভ বা নেগেটিভ তোষামোদীতে গদগদ হন, তারা যে বিশেষ করে দেশের কত বিশাল-বিপুল ক্ষতি করছে তা গভীর ভাবে ভেবে দেখবার মত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ভেবে দেখবার মেধাটুকুও যার না থাকে তার কাছে কি-ইবা আশা করা যেতে পারে!

একই অবস্থা ছিল শেখ মুজিবেরও। তাই এখানে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মুজিবকে নিয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের কথা মনে পড়ে। সময়টি ছিল ১৯৫৬ কি ১৯৫৭ সালের কথা। তখন তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। ঢাকায় এসেছিলেন। সার্কিট হাউজেই থাকতেন। একদিন আমার এক সিনিয়র বন্ধুর সামনেই মুজিবকে নিয়ে মন্তব্যটি করেছিলেন তিনি। 'মুজিব যদি কোনদিন কোন কারনে দেশের নেতা হয়, তাহলে সে প্রথমে দেশটি ধ্বংস করবে, তারপর সে নিজেও ধ্বংস হবে।' ইংরেজী ভাষায় করা সোহরাওয়ার্দীর মন্তব্য ছিল এইরূপঃ- 'If Mujib happens, by any Chance, to become the leader of the country, he will first destroy the country and then he will, for this idiocy destroy himself, as well' (দেখুন, The concept, 1989)

পাঠক একটু খেয়াল করুন। সোহরাওয়ার্দীর সেই মন্তব্যটি কত নির্মম সত্য ছিল। কিন্তু এই মুজিব কত মারাত্মক অহংবাদী ছিলেন যা তার ১৯৭২-৭৫ সময়কালে দুঃশাসন আমলে এদেশের প্রতিজন মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল বলেই কোটি কোটি মানুষের আল্লাহর দরগায় আহাজারির কারনেই অনেকটা অলৌকিক ভাবে শেখের পতন হয়েছিল। আওয়ামী লীগেরই কারো কারো নিজস্ব ভাষায় 'ফেরাউন' মুজিবের পতন হয়েছিল। তার অনিবার্য পতন নিজ অপকর্ম দিয়ে নিজেই ডেকে এনেছিলেন মুজিব। যে পশ্চিমা মিডিয়ারা মুজিবকে ১৯৭০-৭১ এ হিরো বানিয়েছিল, তারাই আবার তার ১৯৭৫ এর পতনকে অনিবার্য বিবেচনা করে স্বাগত জানিয়েছিল। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়। সেই কারনেই পশ্চিমা মিডিয়াদের হাসিনাকে নিয়ে অধুনা যে মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছে, তা নিয়ে বিস্মিত হবার কিছু দেখি না।

১১/০৩/১৯৯৮ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

দুর্নীতিবাজদের মুখে দুর্নীতি দমনের কথা মানায় না

১৯৭৩ সালের ২৩ ডিসেম্বরের একটি ঘটনা। সামান্য নাকি বড় ঘটনা আমি তা বলতে পারছিনা। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আবু সাইয়িদ চৌধুরী খুলনায় ইঞ্জিনিয়ারদের বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন। প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি ঐ অনুষ্ঠানে। ভাষনের অংশ বিশেষে তিনি বলেন, নীতি জ্ঞানহীন কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। এরপর তিনি ঢাকা ফিরে এসেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের হুকুমে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অনেকেই সেই সময় জানতো যে বিচারপতি চৌধুরী দেশের প্রেসিডেন্ট। শেখ মুজিব ও তার দলের নেতা-পাতিনেতাদের দুর্নীতির দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করার কারনেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেখ মুজিব এবং তার আশেপাশে যতসব ত্মরই ভাষায় 'চোরের দল' ভীড় করছিল যে, তার দলকে বিদেশী একটি পত্রিকা যথার্থই 'Corruption Bonanza' বা দুর্নীতির সীমাহীন বা অন্তহীন কুপ বলে বর্ণনা করেছিলো। ১৯৭৫ সালের একটি হিসাব মতে শুধুমাত্র একটি সুইচ ব্যাংকে ওদের ৪০০ কোটি টাকার অর্থ জমা ছিল। ভারত, আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা সিংগাপুর ব্যাংকে কত শ' কোটি টাকা তাদের জমা ছিল তা তখন জানা যায়নি। অনেকের জানা কথা যে গাজী গোলাম মোস্তফা যিনি কি না মুজিবের অতি আস্থাভাজন ও বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধান ছিলেন এবং সেই সুবাদে শ' শ' কোটি টাকা অবৈধ অন্যায় কামাই করেছিলেন, তার এই অন্যায় আয়ের অর্থ ভারতীয় কয়েকটি ব্যাংকে জমা ছিল। অনেকেই এও জানে যে, এই কারণেই বেচারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তথাকথিত একটি 'গাড়ী' দুর্ঘটনায় ঐ ভারতের মাটিতেই অপমৃত্যুর শিকার হয়। ১৯৭১-এর পর অবাঙালী এবং ফেডারেল পাকিস্তান পন্থীদেব সম্পত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য এবং ফেলে যাওয়া বাড়ি-ঘর, কলকারখানা জবর দখল করে যেসব আওয়ামী লীগাররা রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল তার হিসাবের কথা না হয় এখানে নাই উল্লেখ করলাম।

এখানে অন্য আর একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ল। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। শেখ মুজিব ঢাকার সিদ্দিক বাজার কমিউনিটি সেন্টারে এক নাগরিক সভায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা শেষে একজন মুক্তিযোদ্ধা কোন কোন মুক্তিযোদ্ধার অন্যায় কাজ-কামের বিরুদ্ধে তাকে কিছুটা কঠোর হবার অনুরোধ করেন। মুজিব ঐ প্রস্তাব শুনে বিরক্ত হন এবং মন্তব্য করেন, 'আমার ছেলেরা চুয়ান্ন সালের পর থেকে কোন কিছুই খেতে পায় নাই এখন ওরা কিছু খাচ্ছে তাতে তোমার চোখ টাটায় কেন'। ঐ মুক্তিযোদ্ধাই আমাকে কয়েক বছর আগে মন্তব্য করে বলেছেন যে, 'আমি খেয়াল করেছিলাম যে এরপর থেকেই চাঁদাবাজি, মাস্তানি, হয়রানি, হাইজ্যাক, খুন-রাহাজানি যেন হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছিল-বিশেষ করে এই ঢাকা শহরে। ঐ মুক্তিযোদ্ধা বলা দরকার যে ঢাকা শহরেরই একজন আদি বাসিন্দা।

www.pathagar.com

এটা অতি স্বাভাবিক বিষয় বটে। কেননা দেশের সর্বোচ্চ মানুষ যদি অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন তাহলে অন্যায় বাড়বেই। মূল্যবোধের অবক্ষয় হবেই। আমরা যারা ষাটের উর্ধ্বের মানুষ এবং কিছু খোঁজ-খবর রাখি, তারা জানি আওয়ামী দুর্নীতির অনেক ঘটনা। 'তিন পয়সা'র পোষ্ট কার্ডের বিষয় আমাদের অজানা নয়। ক'দিন আগে (৪/৩/৯৮) একটি দৈনিকীতে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে প্রবীণ রাজনীতিবিদ অলী আহাদও সেই তিন পয়সার পোষ্ট কার্ডের কেচ্ছা উল্লেখ করেছেন। মুজিব যখন দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রীত্বে ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে নিয়োজিত ছিলেন, তখনই তিনি তার এক জনসভায় লোকজনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আপনারা যে কোন দুর্নীতির বিষয়ে তিন পয়সার পোষ্টকার্ডে (তখন ঐ কার্ডের দাম ছিল তিন পয়সা, ৬৪ পয়সায় এক টাকা) আমাকে লিখে জানাবেন-তারপর দেখবেন, কেমন করে আমি সেই দুর্নীতি দমন করি।' অনেকে সরল বিশ্বাসে সে ধরনের কাজটি করেছেন সত্য, কিন্তু অলি আহাদ যেমনটি বলেছেন, 'কোন কিছুই হয় নাই, মধ্যে থেইকা যারা চিঠি পোষ্টকার্ডে লিখেছিল, বরং তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন' (দৈনিক ইনকিলাব, ৪-৩-৯৮, পৃষ্ঠা-৮) জনাব অলি আহাদ আরো বলেছেন, দুর্নীতির দায়ে মুজিব জেলও খেটেছেন।

এটা আমরাও অনেকে জানি এবং জানি যে মুজিবকে দুর্নীতির মামলা থেকে খালাস করার জন্য উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং এক সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কোর্টে গলদঘর্ম হয়ে বেশ ক'দিন মামলাটি হ্যান্ডেল করতে হয়েছিল। নিম্নমধ্যবিত্ত পেশকার পিতার ছেলে-যার স্কুলের লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছেন তার চাচা এবং যিনি আবার নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন ভাতিজার সাথে এবং যে ব্যক্তিটি কলকাতার সোহরাওয়ার্দীর 'চ্যারিটি বয়' হিসাবে মূলত আর্থিক কারনেই পরিচিত ছিলেন-তার হঠাৎ করে মন্ত্রী হবার পরপরই ধানমন্ডীতে বাড়ী করার অর্থ কে কোথা থেকে যোগান দিল? ভূতের বাপ নাকি অন্য কেউ? কেন? বলাকা সিনেমার মালিকই বা তিনি তখন কেমন করে হতে পেরেছিলেন? 'বলাকা' নামের রহস্যটি না হয় এইখানে নাই বললাম। এর প্রায় সবগুলোই সেই পাকিস্তান আমলের ঘটনাদির কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন বিবরণ।

১৯৭১-এর পর দুর্নীতির 'বোনান্জা' আওয়ামী লীগ যখন দেশের ভিতরে অর্থনীতি ভেঙে চুরে মিসমার করে চলেছিল, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর হু হু করে বেড়ে চলেছিল এবং তার অর্থনৈতিক সুফলটা ভোগ করেছিল শেখ মুজিবের নিজের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজন। রাস্তার সাধারণ লোকজনের পর্যায় থেকে তারা অনেকে রাতারাতি লাখোপতি ও কোটিপতি হয়ে চলেছিল এবং সাধারণ মানুষ অন্ন কষ্টে হাড্ডিসার হয়ে শেষ হচ্ছিল। দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে লাখ লাখ মানুষ অকালে মরে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকছিল। মানুষের এমনি দুঃসময়ে শেখ মুজিব নৈতিকতার মাথা খেয়ে সোনার মুকুট পরিয়ে ছেলের বিয়ের আয়োজন করেছিলেন। নিজের জন্মদিনে ৫৬ পাউন্ড ওজনের কেক তৈরির মহড়া করে ক্ষুধার্ত-নাংগা কোটি কোটি মানুষের সাথে মসকরা করেছিলেন। রক্ষীবাহিনী দিয়ে বিরোধী সবাইকে ঠান্ডা করেছিলেন। 'লালঘোড়া' দাবড়িয়ে দেয়ার হুকুমও প্রাকাশ্যে দিয়েছিলেন। গুপ্ত নির্যাতন এবং হত্যার ক্যাম্প ঢাকা

www.pathagar.com

ছাড়াও বিস্তৃত ছিল আরও অনেক মফস্বল শহরে। আবার মোটা র‍্যানসম মানির বদলে হাইজ্যাকিং ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন শেখের নিজেরই ঘনিষ্ঠ লোকজন।

১৯৭৫ এর দুর্ভিক্ষের সময় দায়সারা গোছের লঙ্গরখানা খুললেও অনাহারে মৃতদের প্রতি কোনরূপ তিলমাত্রও সহানুভূতি ছিল না। বাঙালীদের তিনি 'উচিত শিক্ষা' দিতে চাইছিলেন এইভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েই। উদ্ধত ফেরাউনী-নমরুদী-সাদ্দামী কায়দায় মুজিব দেশের গরীব ভুগা-নাংগা মানুষকে খতম করতে চাইছিলেন। নিজের নিরাপত্তার জন্য দিল্লীর মদদ, রক্ষীবাহিনীর সিকিউরিটি এবং একদলীয় বাকশালী শাসনের বর্ম দিয়ে নিজেকে ও নিজ বংশের সবাইকে প্রটেক্ট করতে তৎপর ছিলেন শেখ মুজিব। তার অন্যায় অনৈতিক রাজনীতি দিয়ে বিরোধীদের তিনি সর্বতোভাবে নিশ্চিহ্ন করতে যা সম্ভব তার সবই করে চলেছিলেন। এসব মুজিবী কীর্তি দেশবাসী এখনো সব ভুলে যায়নি।

কিন্তু আল্লাহর কি অসীম কুদরত! আল্লাহ এই ভাবেই যতসব অন্যায় অনৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধহীন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম শেষমেশ সবই নস্যাৎ করে দেন। মুজিবের ঘটনায় যেন অনেকের কাছে মনে হয়েছিল, "ওয়ামাকারু ওয়ামাকারুল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরীন" তুমি প্ল্যান কর, আল্লাহও পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন-করেনও এবং অবেশেষে তার পরিকল্পনাই হয় সবচেয়ে উত্তম ও কার্যকরী। এই প্ল্যানের একশন ঘটেছিল ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট সুবেহ সাদেক এর শুভক্ষণে। এইভাবেই জুলুম রাজত্বের অবসান হয়। জালিমের গদি খান খান হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে। সেদিন ১৫ই আগস্টের ঘটনায় এদেশের আপামর জনসাধারণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল। আল্লাহর দরগায় শোকরিয়া আদায় করেছিল। কাউকে কোন আফসোস করতে দেখা যায়নি। কোন মুসলমান নিজেদের জন্য অবশ্য পাঠ্য দোয়া 'ইন্নালিল্লাহ' পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করেননি। সেদিন মুজিবের পতনকে মানুষ স্বোল্লাসে স্বাগত জানিয়েছিল। যেসব জানবাজ সৈনিক মুজিবকে উৎখাত করেছিল, তাদের জন্য মানুষ মন খুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেছে। সেদিনটি এদেশের মানুষের জন্য ছিল সত্যিকার নাজাত দিবস। মহামুক্তির মহান দিবস। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। ১৯৭৫-এর উচ্চতম ইসলামী এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো যেন আবার হারিয়ে যেতে চলেছে। ১৯৭২-৭৫ এর প্রেতাত্মারা পুনঃ দেশের মানুষের ঘাড়ে চেপে বসেছে। ইসলামী নীতিবোধ, মানবিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক নর্‌ম্ (Norms) সবই যেন শয়তানির চমক-এ শেষ হতে চলেছে। ধাপে ধাপে দেশ বিক্রির কাজ সোল কলায় পূর্ণ হতে চলেছে।

শোন যায়, শেখ হাসিনা নাকি দেশের সবাইকে কাঁদিয়ে তবেই ক্ষান্ত হবেন। কারন-এবং একমাত্র কারন প্রতিহিংসা। ১৫-ই আগষ্ট তারা কাঁদে নাই-তাই তাদের এখন কাঁদতে হবে। কাঁদাবেনই তিনি এদেশের সাধারণ মানুষকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দ্রুত বাড়তি বাজার দর দিয়ে কাঁদানো শুরু করেছেন। দেশের শাসনতন্ত্র লংঘন করে পানি ও পার্বত্য চুক্তি করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান নিয়ে ব্যাংকে বিদেশে কার কত কোটি ডলার-পাউন্ড জমা পড়েছে কে জানে। অনেকে একথাও বলেন যে, বিদেশী ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ নাকি এখনও ড্র করা হচ্ছে এবং এই ড্র করার গ্যারান্টর অন্ততঃ একজন শক্তিশালী ও ধনী রাষ্ট্রনায়ক। এসব কতটুকু সঠিক তথ্যভিত্তিক তা বলা না গেলেও

www.pathagar.com

এতটুকু বলা যায় যে 'যা রটে তাতো কিছু বটেই'। সত্য না হলে অস্বীকার করুন যে, এসব রটনা ঠিক নয়। সেই সাহস আদৌ আছে কি? নাই।

তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন কথা বলার আগে নিজের খাতা খুলে দেখুন। কাউকে মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য করার তার নিজের খাতা পরিস্কার কিনা তা যাচাই করা দরকার সর্বাগ্রে। মূল্যবোধহীন রাজনীতি যেমন '৭২-৭৫ এর আওয়ামী বাকশালী শাসনকে ধ্বংস করেছে, তেমনি অনুরূপ দুঃশাসন আওয়ামী শাসনেরও অবসান ঘটবেই। কথায় বলে- 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না'।

২০/০৩/১৯৯৮ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

মাননীয় অর্থমন্ত্রী, হিসাব তো মিলছে না

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া গত ২৩ এপ্রিল বিবিসি রেডিও (বাংলা)-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, এ দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবার কারনে সবার ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে গেছে। তার এই তথ্যের স্বপক্ষে তিনি উল্লেখ করেছেন যে গত দু'টি ঈদে দেশের বাজারে তারা অসংখ্য ক্রেতার ভিড় লক্ষ্য করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, শুধু মাত্র বড় বড় নগর বা শহরেই নয় বরং গ্রামেও অর্থনৈতিক দ্রুত প্রবৃদ্ধির ছোঁয়া লেগেছে-তার ভাষায় এই মুক্ত বাজার অর্থনীতির টার্মে 'ট্রিকল ডাউন' বা 'স্পিল ওভার' পদ্ধতিতে ধনী ক্রেতা ভোক্তাদের যৎকিঞ্চিত উপচে পড়া অর্থ ব্যয়ের কারনে নগর-বন্দর, শহর ও গ্রামের মানুষ অনেক ভাল আছে। ভাল খাচ্ছে, পরছে, আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। সত্যি কি তাই? শহর, বন্দর, নগর-এর কে কেমন আছে? কারা ঈদের অনেক কেনা কাটা করেছে?

রাজধানীর কথাই ধরা যাক। এই রাজধানী নগরীতে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের বাস। এদের সবাই কি যথেচ্ছ ভাবে ঈদের কেনাকাটা করেছে? নাকি একটি ক্ষুদ্র অংশই মাত্র ঢাকার বাজারে ভীড় জমিয়েছিল? সবাই যে ঈদের বাজারে কেনাকাটা করে নাই, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকার বস্তিবাসী প্রায় ২৫/৩০ লাখ লোকের চেহারায়। শহর-বন্দর-নগর-গ্রাম নির্বিশেষে যারা দরিদ্র এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের সংখ্যা শতকরা ৯০ এর মত। এদের কারোরই কোন ধরনের বাড়তি আয়ের পথ নাই। যা দিয়ে তারা ঈদের বাড়তি কেনা-কাটা করতে পারে। এরা দিন আনে দিন খায়। নুন আনতে পানতা ফুরাবার অবস্থা। সরকারী, আধাসরকারী বা কিছু কিছু প্রাইভেট সংগঠনে যারা মাস মাহিনার চাকুরী বাকুরি করে এবং ঈদ বোনাস গত কয়েক বছর থেকে নিয়মিত পায়, তাদেরই মধ্যে এবং উঁচু পর্যায়ের বেতন ভুক্তরা মাত্র ঈদের বাড়তি যে বোনাস পায় তা থেকে কিছু কেনাকাটা করতে পারে। এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার কত? বারো কোটি মানুষের মধ্যে পনের-বিশ লাখের বেশী নয়। অর্থ্যাৎ মোট জনসংখ্যার বড় জোর শতকরা ১.২৫ থেকে ১.৫০ জন মাত্র। অর্থ্যাৎ শতকরা ৯৮.৭৫ থেকে ৯৮.৫০ জন দেশে এই বোনাস প্রাপ্তির বাইরের লোকজন। অতএব যে 'তথ্যের মাপকাঠি' এর হিসাব নিয়ে অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ঈদের কেনাকাটার ভীড়ের কথা বলেছেন; হাকি শুভংকরের ফাঁকি বৈ অন্য কিছু হতে পারে? অর্থনীতিবিদ কিবরিয়ার এই পাঠদান কি আমরা গ্রহন করতে পারি?

মন্ত্রী সাহেব কৃষিতে ভর্তুকি দেয়ার জন্য ১০০ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ রেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। আরো তিনি গর্ব করে বলেছেন যে, তারা এই ১০০ কোটির ওপর আরো দেড়শ' কোটি বাড়তি ভর্তুকি অর্থাৎ মোট আড়াইশ' কোটি টাকা নাকি কৃষিতে ভর্তুকি দিয়েছেন-বিএনপি সরকার নাকি সেখানে ১কোটি টাকাও ভর্তুকি দেয় নাই। বেশ কথা। তাহলে তারা জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য আমদানী করছেন কেন?

www.pathagar.com

আড়াইশ' কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েও উৎপাদন কমে গেল কেন? নাকি ভর্তুকি'র গুড় আওয়ামী পিপাড়ারা খেয়েছে? 'চাটার দল' পকেটস্থ করেছে?

মনে পড়ছে আমার নিজের গ্রামের মানুষগুলোর হাড্ডিসার চেহারার কথা। অনেকদিন পর ঢাকা থেকে তিন সপ্তাহ আগে গিয়েছিলাম বাপ-দাদার গ্রামের বাড়ীতে। বৃহত্তর রংপুরের নীলফামারী জেলার নিতাই গ্রামে। সকাল সোয়া এগারটা থেকে বিকাল সোয়া তিনটা পর্যন্ত মাত্র চারটি ঘন্টা ছিলাম সেখানে। সেই বাড়ীর বাইরে উঠানে আর বারান্দায় বসে। অনেক লোকজন এসেছিল এই সময়ের মধ্যেই। মাদ্রাসা ও প্রাইমারী স্কুলের মর্নিং শিফট্ ছুটি হওয়াতে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এসেছিল আমাকে বা আমার স্ত্রী, মেয়ে, নাতীকে দেখতে হয়তো নয় বরং যে মাইক্রোবাসটি রংপুর শহর থেকে আমরা ভাড়া করে গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলাম হয়তো সেটি দেখতে। ওদের চেহারা সুরতের দিকে তাকানো আমার জন্য কষ্টকর হয়েছিল। প্রতিটি ছেলেমেয়ে মারাত্মক অপুষ্টির শিকার। ওদের গায়ে নাম-মাত্র ময়লা ছেড়া জামা কাপড়। বয়স্ক যারা এসেছিল তাদের সবার গায়ের চামড়া আরো হাড্ডিসার। গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেব আমার বয়সী ৬২-৬৩ বছর, বেচারা যেন একেবারে বুড়িয়ে গেছেন। তার নিজের জমিজমা তেমন নেই। মসজিদের অল্প কিছু ওয়াকফ জমি। তাই দিয়ে তার সংসার চলে না। বলেন ১৪ টাকা চালের কেজি গ্রামের হাটে যেটি সবচেয়ে মোটা-অত দামে তারা চাল কিনতে পারে না। আগে গ্রামেরই মাদ্রাসায় পড়াতেন, সেখানকার ওয়াক্ফ জমি হতে কিছু আয় হতো, তা থেকে এখন তাকে কেন যেন বাদ দেয়া হয়েছে। গ্রামের মসজিদের ইমাম-যার প্রতি সবার ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহানুভূতি থাকার কথা-অল্প কয়েক বছর আগেও যা আমি দেখেছি-তাও কি এখন নেই? অভাবে সবারই কি স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে? কোথায় অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার 'দ্রুত প্রবৃদ্ধি'র লক্ষণ? গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নতি? সবাই যেন কিছু অর্থ সাহায্য চাইছে-লজ্জায় হয়তো ভিক্ষা চাইছে না।

বাড়ীর বাইরে উঠান সংলগ্ন বারান্দায় বসে আছি অনেকে আসছে কিছুক্ষণ আমার কাছে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকছে, আকারে ইঙ্গিতে কিছু অর্থ সাহায্য চাচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে। পুরুষ এবং মেয়ে মানুষও কিছু কিছু-কেউ চেনা আর কাউকে বা চিনতে পারছিলাম না। এমন সময় এলো আমারই এক দূর সর্ম্পকের চাচাতো ভাই মজিরুদ্দিন। কে যেন বললো ও পাগলা মজিরুদ্দন। আমার মনে পড়ল, আমার চেনা জানা আগের সুস্থ, সবল মজিরুদ্দিনের কথা। আমার থেকে বয়সে হয়তো ৮/১০ বছরের ছোট হবে। দেখলাম, ও কোন কথা বলল না। আমার পাশের একটি খালি চেয়ারে বসল। হাতে ছিল তার একটি কাঁচা হলুদের টুকরা। ওটি সে কামড়িয়ে কামড়িয়ে খাচ্ছে। কারো কোন কথা সে শুনছে না। মিনিট কয়েক পরেই সে আবার উঠে চলে গেল। আমার থেকে বয়সে ৮/১০ বছরের ছোট হলেও আমার মনে হলো ও কত বুড়িয়ে গেছে। গায়ে চামড়া আর হাড্ডি ছাড়া যেন কোন কিছুই নেই।

এই সব কিসের চিহ্ন? নীরব দুর্ভিক্ষের নয় কি? অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ট্রিকল ডাউন (Trickle Down) প্রক্রিয়ায় কতটুকু উপকার পেয়েছে গ্রামের এই হাড্ডিসার অগণিত মানুষ? শেখ মুজিবের শাসনকালে ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের বাস্তব

www.pathagar.com

চিত্র দেখার আমার দুর্ভাগ্য হয় নাই কেননা, আমি তখন লন্ডনে থাকতাম। তবে মাঝে মধ্যে বিবিসি টিভিতে তখনকার বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের চিত্র দেখতে পেতাম। মানুষ মানুষের বমি খাওয়ার ছবি, মানুষ-কুকুরে ডাষ্টবিনের খাওয়া নিয়ে টানা হেঁচড়ার ছবি, ঢাকার রাস্তায় মানুষের লাশ পড়ে থাকার ছবি, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের লাশ কুড়িয়ে দাফন করার ছবি, লঙ্গরখানার যৎকিঞ্চিত খাদ্য পাওয়া নিয়ে মারামারির ছবি। অন্যদিকে আবার ৫৫ পাউন্ড ওজনের কেক কেটে শেখ মুজিবের জন্মদিন পালনের ছবি। সোনার টোপর মাথায় দিয়ে শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামালের বিয়ে করার অনুষ্ঠানের ছবি।

কে জানে, অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া সাহেবরা তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জোয়ারে এবার বাংলাদেশের সাধারণ গরীব শতকরা প্রায় ৯০ জন মানুষকে অর্থ্যাৎ বারো কোটির প্রায় সাড়ে ১০ কোটি মানুষকে হাড্ডি-চর্মসার করে কোথায় নিয়ে চলেছেন? ওদের দেয়া তথ্য আর হিসাবের সাথে সাধারণ মানুষের বাস্তব হিসাব যে মিলছে না কোনভাবেই।

২৭/৪/১৯৯৮ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

'শুট এট সাইট' নয়, আইনের শাসন কায়েম হোক

২৯শে এপ্রিলের বাংলাদেশ অবজারভার নামের ইংরেজী দৈনিকটির প্রথম পৃষ্ঠার লিড নিউজটি আমাকে হতবাক করেছিল। সত্যি কি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঐ লিড নিউজের বক্তব্য উচ্চারণ করেছেন? আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম প্রধানমন্ত্রীতো বাংলায় কথা বলেন, ইংরেজী তিনি বলেন না, সাংবাদিক/সম্পাদক হয়তো ইংরেজীতে প্রধামমন্ত্রীর বাংলায় দেয়া বক্তব্যের অনুবাদ করতে গিয়ে ভুল করেছেন। আমার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কারনে আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি প্রধানমন্ত্রী তেমন কিছু বলেছেন কিনা। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন গতরাতে বিটিভিতে তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর সে বক্তব্য নিজ কানেই শুনেছেন। তার এই কথা শুনার পর আমার আর সন্দেহ থাকল না যে প্রধানমন্ত্রী সত্যিই সেই লিড নিউজটি সৃষ্টি করেছেন। অস্ত্রধারীদের 'শুট এট সাইট' বা দেখামাত্র পুলিশ যেন গুলি করে একথা তিনি বলেছেন। অবশ্য সেই সাথে এও তিনি বলেছেন যে যদি গুলি করার বিষয়ে ঐক্যমত হয়। Consensus হয়।

এই লিড নিউজ দেখে আমার সাথে সাথেই মনে পড়েছিল সেই ১৯৭২ কি ১৯৭৩ এর কথা। মনে পড়েছিল শেখ মুজিবের ঠিক এই বক্তব্যেরই বিষয়াদি। তখন মুজিব বলেছিলেন, 'নকশাল দেখলে গুলি কর'। সাথে সাথে তখনকার একমাত্র প্রকাশ্য প্রতিবাদী কণ্ঠ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুজিবের এই ঔদ্ধত্যের জবাবে বলেছিলেন, 'নকশাল কি কারো গায়ে লেখা থাকে যে নকশাল দেখলেই গুলি করার হুকুম দিয়েছেন মুজিবুর'? মাওলানার প্রতিবাদে মুজিব কিছুটা থমকে গেলেও যে বিনা বিচারে অসংখ্য হত্যাকান্ড তিনি চালিয়েছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। রক্ষীবাহিনীর নির্মম নির্যাতন, গুম, হত্যা এ সমস্ত ১৯৭২-৭৫ সময়কালে ডাল-ভাতের মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক হিসাবে জানা যায় যে, রক্ষীবাহিনী সহ লাল, সাদা ইত্যাদি প্রাইভেট আর্মি ১৯৭২-৭৫ সময়কালে অন্ততঃ ৩৭ হাজার দেশপ্রেমিক অথচ আওয়ামী-বাকশাল বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে শেখ মুজিবের নির্দেশে হত্যা করেছিল। এসব হত্যাকান্ড মুজিব তার এক এচিভমেন্ট এবং গর্বের বস্তু বলে বিকৃত আত্মতুষ্টি বলে প্রকাশ করতেন। কে না জানে যে ১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারী এমনি এক দেশপ্রেমিক পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির প্রধান সিরাজ শিকদারকে তার বিশেষ পুলিশ স্কোয়াড দিয়ে গ্রেফতার করার পর তাদের দিয়ে তাকে তিনি গুলি করে হত্যা করিয়েছিলেন এবং হত্যা করার পর তার বিকৃত অহংকার আনন্দ প্রকাশ করে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। বক্তৃতায় তিনি দুনিয়াকে অবাক করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার'! আরো অবাব হবার বিষয় এই যে তিনি এই বক্তব্য রেখেছিলেন পবিত্র সংসদ ভবনের সেসনের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং আইনের শাসনের প্রতি যার তিলমাত্রও শ্রদ্ধা আছে তার পক্ষে সেই সংসদে দাঁড়িয়ে কি এ ধরনের গণতন্ত্র ও আইনবিরোধী কথা বলা আদৌ সম্ভব হতে পারে? পারে না। বস্তুতঃ মুজিব যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না-মুখে

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের জন্য চাপাবাজি বা গলাবাজি করলেও-তার অসংখ্য বিদ্যমান প্রমাণের মধ্যে এটিও একটি বটে। একদলীয় ডিকটেটরশীপ বা কুখ্যাত বাকশাল গঠনও যে শেখ মুজিবের গণতন্ত্রবিরোধী এবং চরম স্বৈরাচারী মন-মানসিকতার প্রমাণ তা আমরা এখনও ভুলে যাই নাই। কে জানে শেখ হাসিনা পুনঃ এদেশের স্বাধীনচেতা মানুষকে সেদিকেই সেই বর্বরতার দিকেই নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছেন কিনা।

দেশে অস্ত্রবাজি না থাক। দেশ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা নিয়ন্ত্রন না করুক। অস্ত্রধারীরা অস্ত্র ছেড়ে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও কর্মজীবন যাপন করুক তা কে না চায়? শেখ হাসিনা যদি সত্যি সত্যিই চান তাহলে তার দলের প্রকাশ্য অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীদের সর্বপ্রথম নিরস্ত্র করুন। ওদের সবাইকে ভদ্রজনোচিত চাকুরী বাকুরী দিন। কাজ-কর্মে লাগান। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করুন। চাঁদাবাজি, মাস্তানবাজি, টেন্ডারবাজি, টাউটবাজি এসব কাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিন। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিকলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ ইত্যাদি দলের নাম পরিচয়ে যেন কেউ অসামাজিক কাজে আর লিপ্ত না থাকে। এসব নিশ্চিত করা তো বর্তমান সরকার বা শেখের জন্য খুব একটা কঠিন কাজ হবার কথা নয়। এ কাজটি শেষ করে নিজের ঘর পাক-পবিত্র করুন। তারপর দেখুন পুলিশ সাধারণ নিয়মেই বাকী সবাইকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে। কার না জানা আছে যে, শেখ হাসিনার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করার জন্যই অন্য আর কিছু দলের লোকজনকে নেহাত আত্মরক্ষার জন্যই প্রস্তুতি নেয়ার চেষ্টা করতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ হলে দেশে কোন প্রতিরোধ থাকার প্রয়োজন হবে না। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যতই বড় আকার ধারণ করবে ততই প্রতিরোধ জোরদার হতে পারে। কেননা, এদেশের মানুষ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ঘৃণা করে। অতীতে শেখ মুজিব যখন চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন তখনই তা মোকাবিলা করার জন্য মানুষ বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে এদেশে যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারেই হোক না কেন প্রায় ডজন খানেক আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি মুজিবী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মোকাবিলা করেছে। তাদের কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতা বড় কথা ছিল না। তারা যে প্রতিরোধ করার জন্য দাঁড়িয়েছিল সেটিই ছিল বড় কথা। পাকিস্তান আমলেও এমনটি হয়েছিল। হয়েছিল ব্রিটিশ আমলেও। মুজিবের পতন যে কারনে সংঘটিত হয়েছিল তার মূল বিষয়ও ছিল মুজিবী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে দেশের মানুষকে উদ্ধার করার প্রয়াস মাত্র। মানুষের আজাদী রক্ষা করার তাগিদও ছিল একটি বড় ইস্যু। মনে রাখা জরুরী যে ১৯৭১ সালের আজাদী সংগ্রামে মরণপন যুদ্ধ করেছেন তারাই আজাদী রক্ষা এবং নিরংকুশ করার জন্য ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট আওয়ামী ডিকটেটরশীপ খতম করেছিলেন। তারা কেউই নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিল করার জন্য এ কাজটি করেন নাই।

এসব জেনে শুনেও শেখ হাসিনা যদি Shoot at sight বলে হুকুম জারি করতে উদ্যত হন, তাহলে এটা যেমন তার নিজের জন্য ভালো হতে পারে না-তেমনি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যও কোনভাবেই মঙ্গলকর কিছু একটা হতে পারে

www.pathagar.com

না। তবে তিনি যদি এডভেনচারিষ্ট হতে চান, তার নিজের বাবার মত 'দেশ ও নিজেকে-উভয়কেই ধ্বংস' করতে চান এবং সেইভাবেই ইতিহাসে নিজের স্থান করে রাখতে চান-তাহলে সেটি তার নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তবে দেশের সচেতন ও আজাদী প্রিয় মানুষ তেমনটি হতে দিবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না।

'স্যুট এট সাইট' গণতন্ত্রের ভাষা নয়। নয় আইনের শাসনের ভাষা। এটি অসভ্য ও বর্বরদের শব্দ চয়ন বটে। রুচিবান কোন ভদ্র মানুষই এ বিষয়ে কোনভাবেই একমত হতে পারে না দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে।

০৪/০৫/১৯৯৮ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

প্রতিহিংসা দিয়ে আইনের শাসন চলে না

একটি ইনফরম্যাল গ্যাদারিং। আমলা, রাজনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক মিলে আমরা দশজনের মত। একজন ছিলেন বয়স্ক আইনজীবী। আমলা দুইজন বাদে সবাই পঞ্চাশের উর্ধ্বে। ষাটের উর্ধ্বে চার জন। অন্ততঃ দুইজন ভিআইপি। সাবেক পজিশনের জন্য ভিআইপি। রাষ্ট্রীয় অর্ডারেই ওই দুইজন ছিলেন প্রথম দশজনের মধ্যে।

কথার ফাঁকে ভিআইপিদের একজন বললেন, অবাক হবার মত একটি কথা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি সাম্প্রতিক মন্তব্য। একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তার করা একটি মন্তব্য। শাজনীন ধরনের অবিশ্বাস্য ও মারাত্মক খুন কি করে রোধ করা যায়, এ ধরনের খুনিদের কিভাবে দ্রুত সাজা দেয়া যায় তার ওপর শেখ হাসিনা নাকি অবলীলায় বলে ফেলেন, 'আমার বাপের খুনিদের এখনো' বিচার শেষ করতে পারলাম না, অন্যদের জন্য আর কি করব।'

এর অর্থ কি? যদি কথাটি সত্যি হয়, তাহলে ধরে নিতে হচ্ছে অন্য কোন-খুন খারাবি, নির্যাতন, ধর্ষন ইত্যাদি তার কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অগ্রাধিকারের বিষয়তো নয়ই। প্রধানমন্ত্রী হাসিনার কাছে অগ্রাধিকারের বিষয় হচ্ছে তার বাপের 'খুনী' দের বিচার শেষ করা। বস্তুতঃ ফাঁসিতে ঝুলানো। এই কাজটি শেষ না করে তিনি অন্য আর কোন কাজই করবেন না। 'খুনকা বদলা খুন' নিবেনই তিনি।

'খুনকা বদলা খুন' অসভ্য সমাজের কাজ। সভ্য বা গণতান্ত্রিক দেশের নিয়ম হচ্ছে আইনের শাসন। আইন যা বলবে তা করতে হবে। আইনের নিজস্ব পদ্ধতি যেভাবে আইন প্রয়োগ করতে বলবে সেইভাবে করতে হবে। একেই বলে Due process of law যা কিনা আইনের শাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামেও আইনের শাসন অগ্রগণ্য। ব্যক্তি শাসন নয়। ব্যক্তির খেয়াল খুশি বা ক্রোধ, হিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ কোন কিছুই আইনের শাসন নয়।

'খুন' বা অহেতুক মানুষের জীবন নাশ সন্দেহ নাই এক অন্যায় কাজ। আইনে দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এই যে অপরাধ তার আবার ডিগ্রী আছে। খুন করার জন্য ফাঁসি হবার যেমন আইন আছে, তেমনি অপ্রমাণিত খুনের দায়ে কথিত দোষী ব্যক্তি বেকসুর খালাসও পেয়ে যান। আইনের পদ্ধতিগত প্রয়োগ হচ্ছে সাক্ষী সাবুদ সন্দেহের বাইরে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী-প্রমাণ। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত তথ্য এবং সাক্ষী-প্রমাণের প্রশ্নেও আইন আছে। নীতিমালা আছে। তার একটি হচ্ছে,'শতজন দোষী খালাস পেয়ে যাক, তবুও যেন একজন নির্দোষ ব্যক্তিও শাস্তি না পায়'। অর্থ্যাৎ সন্দেহাতীত ভাবে কেউ দোষী প্রমাণিত না হলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। আমাদের দেশে যেসব প্রচলিত আইন আছে এই সব সেই আইনেরই নীতিমালার অংশ। অলংঘনীয় অংশ। যে কোন সৎ বিচারক এসব নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য। কোন বরখেলাপ কেউ করতে পারে না। করলে তিনিও আইনে দোষী হবেন। এখানে ব্যক্তির খেয়াল খুশি বা ইচ্ছ-অনিচ্ছা অর্থহীন। আইনই সুপ্রীম (Supreme)।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক আধুনিক যে কোন রাষ্ট্র বা দেশ শুধুমাত্র দেশীয় আইন মানবে তাই নয়। বরং তাকে জাতিসংঘ সনদ, আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন আইন ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। মেনে চলতে হয় যার যার প্রয়োজনেই। মেনে না চললে আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধের মধ্যে আটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। জাতিসংঘ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, উন্নত দেশসমূহ এমতাবস্থায় বিভিন্ন ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। তাই বাংলাদেশের মত গরীব ও অনুন্নত দেশকে আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ এবং চাপাচাপির কথা সব সময়ই মনে রাখতে হয়। না রাখলে যে কোন মুহূর্তে আন্তর্জাতিক শক্তিশালী সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বেকায়দায় ফেলতে পারে। আমরা ভুলে যেতে পারি না যে, ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব বাংলাদেশে ডিকটেটরিয়াল বাকশালতন্ত্র কায়েম করার সাথে সাথেই এ দেশের জন্য প্রথমে যারা ব্যাপক সাহায্য করেছিল সেই পশ্চিমা বিশ্ব সবকিছু থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ার কাজ শুরু করেছিল। কেননা, তখন গণতন্ত্র ও আইনের শাসন চরম হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সেই একদলীয় শাসনের যখন পতন হয়েছিল, তখন তাৎক্ষণিকভাবে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র বহাল না করা গেলেও, দেশে কিছু সময়ের জন্য আর্মি শাসন থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্ব যখন বুঝতে পারল যে, একদলীয় বাকশাল খতম করার পর বহুদলীয় গণতন্ত্র দেশে আসবেই আসবে, তখন তারা এদেশের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিল।

বস্তুতঃ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশে ধিকৃত বাকশালের পরিবর্তে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন শুরু হয়েছিল। তাই স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থান কত অত্যাবশ্যক ছিল। সেই অভ্যুত্থানকে তাই ছোট করে দেখার কোনই অবকাশ নাই। সে ক্যু ডে টা-এর সুফল ভোগ করেছে বিগত ২৩ বছর যাবৎ বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা মানুষ। সেই অভ্যুত্থান সফল না হলে আজতক বাংলাদেশ কী হতো? গণতন্ত্র, মানুষের আজাদী, আর্থিক স্বচ্ছলতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, ভোটের অধিকার, ব্যালট বাক্সের ভিতর দিয়ে সরকারের পরিবর্তন কোনটিই আজ সম্ভব হত কি? দুনিয়ার গণতান্ত্রিক সভ্য দেশের মানুষ আমাদের কোন দৃষ্টিতে দেখতো? বাকশালী ডিকটেটরশীপ প্রবর্তন করার পর শেখ মুজিব দেশের মানুষের কত জঘন্য ধিক্কারের পাত্র হয়ে পড়েছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তার একনায়কতন্ত্র শাসনের পতনের খবর পাবার সাথে সাথেই মানুষ কোন ধরনের আফসোস না করে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। একজন মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ শুনে অন্য আর একজন মুসলমান কোরআনের যেই আয়াতটি অবশ্য অবশ্যই পড়েন, তাও সেদিন ১৫ই আগষ্টে কেউই পাঠ করে নাই। পাঠ করে নাই তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবার জন্য। অন্যায়কারী মুজিবকে ধিক্কার দিবার জন্য।

আমি তখন লন্ডনে থাকতাম। সেখানেও দেশের মানুষের মত ওখানে বসবাসকারী অসংখ্য এদেশের মানুষকে আনন্দ মিছিল ও উল্লাস করতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কেউ কেউ লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে ঢুকে সেখানে টানানো তখনকার 'বংগদুশমনে'র (লন্ডন, সানডে টাইমস, ১৭.০৫.৭৫) অর্থাৎ শেখের ছবি দেয়াল থেকে টেনে নামিয়ে লাথি মেরেছে, ভেঙে চুরমার করেছে। এইসব ছবি বিবিসি টিভি সেইদিনই

www.pathagar.com

অর্থ্যাৎ ১৫ই আগষ্টে (১৯৭৫) দেখিয়েছিল। কে না জানে যে, এই লন্ডনবাসী বাংলাদেশীরাই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশী অর্থ সাহায্য, অস্ত্র সাহায্যের জন্য সব ধরনের আয়োজন, পাবলিসিটি ইত্যাদি সবচেয়ে বেশী করেছিল-অন্য আর কোন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের তুলনায়। ১৯৭৫এর ১৫ই আগেষ্টের সেনা অভুত্থান এই কারনেই সফল হয়েছিল যে মানুষ তেমনটি চেয়েছিল। আল্লাহর মদদও ছিল স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী শেখ মুজিবের শাসনের বিরুদ্ধে। তা না হলে গোলাবিহীন ট্যাংক বহরই ত্বরিত অভ্যুত্থানটি সফল করেছিল কিভাবে?

সেনা অভুত্থান সব-সময় ভাল এমনটি বলা যায় না। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে যেটি ঘটেছিল তা ছিল অনিবার্য। অনেক ঝানু বিদেশী সাংবাদিক যারা কিনা ১৯৭১-৭৪ সাল নাগাদ শেখের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাদের প্রায় সবাই ১৯৭৫-এর ১৫ই আগেষ্টের ক্যু-কে 'অবশ্যম্ভাবী' বলে চিত্রিত করেছেন। (দেখুন ১৭-০৮-৭৫ এর সানডে টাইমস, লন্ডন)। আর এই অনিবার্যতার কারনাদি যে মুজিব নিজেই ছিলেন সে কথাও তারাই বলেছেন। তা না হলে যে মানুষটি গণতন্ত্রের স্লোগান দিয়ে নেতা হয়েছেন-মানুষ যাকে গণতন্ত্রী বলে বিশ্বাসও করেছিলেন-সেই একই মানুষটি একনায়কতন্ত্র বাকশাল কায়েম করেন কেন? এই বিশ্বাসঘাতকতা কেন? এই অভুত্থান অনিবার্য ছিল বলেই সেটি ছিল সফল অভ্যুত্থান। আর আন্তর্জাতিক আইনে সফল অভুত্থান কোন দোষনীয় বিষয় নয়। কোন অন্যায় কাজ নয়। এই ক্ষেত্রে আইনের নীতিই হচ্ছে, "ক্যু ইজ ক্রাইম ইফ ইট ফেইলস", বিফল অভুত্থান হচ্ছে দোষণীয় বা অন্যায়। ১৫-ই আগষ্টের ক্যু বিফল নয়-সফল। তাই ওটি ছিল পরবর্তীকালে আইনের উৎস। ক্ষমতার ভিত্তি। সেই ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই আছে ১৯৯৮ সালের বাংলাদেশ। তা না হলে অন্যদের কথা বাদই থাকলো, আজ শেখ হাসিনার স্থান প্রধানমন্ত্রীর অফিসে না হয়ে হতো ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার রান্নাঘরে। সেই ক্যু-এর বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা যখন কথা বলেন, ক্যু-এর নায়কদের সাধারণ 'হত্যাকারী' বলে চিহ্নিত করেন, তখন কার না কালিদাসের সেই গাছের ডালের মাথায় বসে একই ডালের গোড়া কাটার গল্প মনে পড়ে?

ক্যু-হলে সেখানে কিছু হত্যাকান্ড হতে পারে। সফল ক্যু যেহেতু আইনে কোন অন্যায় কাজ নয়, তাই আনুষঙ্গিক কিছু হত্যাকান্ডও অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না। ক্যু যে শুধুমাত্র এদেশে হয়েছে এমনটি সত্য নয়। যুগে যুগে অনেক দেশেই হয়েছে। ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মত উন্নত ও এখনকার সভ্য দেশে হয়েছে। হয়েছে রাশিয়ায়। মাত্র সাড়ে সাত বছর আগে হল রুমানিয়ায়। এই সব ক্ষেত্রেই হত্যাকান্ড হয়েছে সেসব ক্যু-এর আনুষঙ্গিক হিসেবে। এই সব অনুসঙ্গ হত্যাকন্ডের কোথাও বিচারের প্রশ্ন উঠে নাই। উঠার অবকাশও নাই। কেননা, আন্তর্জাতিক আইনে তেমন কোন প্রভিশন নাই। বাংলাদেশে ভিন্ন কিছু হবে কেন?

তবুও সরকার যদি দেশের হাজার হাজার জ্বলন্ত সমস্যাকে তেমন আমল না দিয়ে অন্ধ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মেতে উঠে কিংবা শেখ মুজিবের মত 'অহমিকার খোরাক' (দেখুন, দৈনিক এন্টারপ্রাইজ, ক্যালিফোর্নিয়া, ২৯-০১-১৯৭৫ইং) আদায় করতে পাগলামি করে, তাহলে এই সরকারের জন্য ইতিহাসের আস্তাকুঁড় বোধ করি আর বেশী দূরে নয়।

১১/০৫/১৯৯৮ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

শুধু ব্যর্থই নয় ওরা .....

১৭ই জুন রাতে বিবিসি রেডিও-এর সাথে এক প্রশ্নোত্তরকালে বিএনপি-এর মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া যখন মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য তাদের দাবীর পেছনের যুক্তি বর্ণনা করতে আওয়ামী লীগ সরকারকে 'ব্যর্থ' সরকার হিসাবে চিহ্নিত করেন, তখন আমার মনে হয়েছে যে, এই একটি মাত্র বিশেষণ প্রয়োগ যথেষ্ট হয় নাই।

আমারতো মনে হয় ২১ বছর দেশের ক্ষমতায় থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থান করতে বাধ্য হবার পর ১৯৯৬ সালের জুনে মোট ভোটারের শতকরা ৩৪ জনের সমর্থন ছলে-বলে-কৌশলে আদায় করার পর যে দীর্ঘ দু'টি বছর সময়কাল ক্ষমতায় আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছে তা আওয়ামীদের এক বিরাট সফলতা। ব্যর্থতা নয়। এই হিসাবে শতকরা ৬৬ ভাগ মানুষ যারা ১৯৯৬ এর নির্বাচনে ওদের কোনভাবেই সমর্থন করে নাই তাদের 'ছলা-কলায়' ভোলে নাই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা যে এই চব্বিশ মাস ছড়ি ঘুরালো, বলা যায় যা খুশি তাই করল, তাকি তার কম সফলতা? অনেকেই বলেছেন শঠতার মেকিয়াভেলী বা মিথ্যায় গোয়েবলস এর মত চরম বদমায়েশরাও শেখ হাসিনার সরকারের কাছে হার মেনেছে। একি আওয়ামীলীগ সরকারের কম সফলতা? তাই আমার বিশ্বাস যে, শেখ হাসিনার সরকার এখন সফল সরকার। তাদের নিজস্ব মাপকাঠিতে তারা ব্যর্থ নয় বরং সফল বটে। তবে হ্যাঁ, দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য, চেতনা, আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদি প্রশ্নে এই সরকারকে 'ব্যর্থ' শব্দ দিয়ে নয় বরং অন্য কিছু শব্দ বা বিশেষণ দিয়ে সম্বোধন করা সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত হবে।

শেখ হাসিনার জন্য যে বিশেষণটি বোধ করি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করা জরুরী তা হচ্ছে এটা অগণতান্ত্রিক সরকার। শেখ হাসিনার সরকার কেন অগণতান্ত্রিক তার কিছু তথ্য আমি উপরে উল্লেখ করেছি। যদি উপরের যুক্তি কেউ কেউ গ্রহন করতে না চান, তাহলে তারা বড় জোর বলতে পারেন যে ওটি মাইনরিটি সরকার। সংখ্যালঘু মানুষের সমর্থনে গঠিত সংসদীয় সরকার। তাহলে কথা থেকেই যাচ্ছে যে, এই সরকার সংখ্যাগুরু মানুষের সরকার নয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী সরকার নয়। এরশাদের জাতীয় পার্টির এমপিদের সংসদে সমর্থন না পেলে যে শেখ হাসিনা কোনভাবেই সরকার গঠন করতে পারতেন না, তাতো সবারই জানা কথা এবং এই সমর্থন লাভ করার জন্য যেসব অন্যায় ডিল (Deal) হাসিনা-এরশাদ করেছেন তাওতো কারো না জানার বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে আইন লংঘন করেছেন হাসিনা। আইনের শাসনকে তিনি পদদলিত করেছেন যা কিনা গণতন্ত্রের অতি আবশ্যকীয় বা পূর্ব শর্ত। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, শেখ হাসিনার সরকার অগণতান্ত্রিক সরকার। সাধারণ মানুষের সরকার নয়। আইনের শাসনকে তারা কি এবং কত জঘন্য আকারে পদদলিত করেছেন, তার অসংখ্য প্রমাণ হাজির করা যায়। সেসব বিস্তারিত না বললেও অনেকেই জানেন। এখানে তবুও একটা টাটকা খবর দেয়া যাক।

www.pathagar.com

গত ১৭ই জুন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল উত্থাপিত রিপোর্টটি পাঠক একটু পড়ে দেখতে পারেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে ওই রিপোর্টটি উপস্থাপন কালে আওয়ামী সরকারের একজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। মানবাধিকার লংঘনের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে কোনটিরই তিনি সঠিক জবাব দিতে পারেন নাই। ১৫-ই আগষ্ট ১৯৭৫-এর সফল সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনায় নাকি এ্যামনেষ্টি হস্তক্ষেপ করেছে এই ছিল তার বলা যায় একমাত্র অভিযোগ বা বক্তব্য। অথচ সে আইনবিদ মন্ত্রীর না জানার কথা নয় যে সফল অভ্যুত্থানের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের মাপকাঠি বা প্রভিশন অনুযায়ী কাউকেই বিচার কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কোন সুযোগ নাই। কেননা, ঐ অভ্যুত্থানটি সফল হবার কারনে এবং সেটির সফলতার ধারাবাহিকতাতেই বাংলাদেশ চলছে, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হতে পেরেছে এবং বিগত প্রায় ২৩ বছরের লেজিটিমেসী পেয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র, এই জাতি এবং এর অস্তিত্ব। অবাক কান্ড এই যে, ঐ মহান অভ্যুত্থানটিকে নিছক একটি 'হত্যাকান্ড' সাজাবার সর্বাত্মক কোশেশ করছে হাসিনার সরকার।

শেখ হাসিনার সরকার আইনের শাসনের অপব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয় নাই, আইনের স্বাভাবিক গতিও রুদ্ধ করেছে। রুদ্ধ করেছে ফ্যাসিষ্ট কায়দায়, মাসল পাওয়ার-এর জঘন্য ধরনের ব্যবহার করে। শেখ হাসিনার মাসল পাওয়ার বাহিনীর অপকীর্তির হাজার হাজার উদাহরণ মানুষ প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করছে। সর্বশেষটি বোধকরি ছিল ৯ জুন কাঁচপুর ব্রীজ-এ ব্যারিকেড সৃষ্টি। এই এলাকার এমপি শামীম ওসমান সাহেবই নাকি সেই ব্যরিকেড সৃষ্টি করার স্থানীয় নায়ক ছিলেন। তবে অনেকে একথাও বলেছেন যে, খোদ শেখ হাসিনার নির্দেশ এবং অনুমোদনক্রমেই ঐ ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল। আওয়ামীদের ফ্যাসিষ্ট ও গণতন্ত্রবিরোধী চরিত্র হালের কোন বিষয় নয়। সোহরাওয়ার্দীর লাঠিয়াল শেখ মুজিব স্বয়ং ছিলেন আজীবন একজন জঘন্য ফ্যাসিষ্ট। তার মাসল পাওয়ার থেকে প্রায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (যিনি-কিনা শুরুতে মুজিবকে নিজের ছেলের মত আদর-যত্ন-স্নেহ করে পুষেছিলেন) রেহাই পান নাই। ১৯৫৬ সালে এই মাওলানা যখন আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করে ন্যাপ গঠন করেন, তখন তার মিটিং-এ এই আওয়ামী-মুজিব গুন্ডাবাহিনী সদরঘাটের মুকুল সিনেমা হলে সন্ত্রাস চালিয়েছে। ১৯৫৮ সালের শেষে আর্মি জেনারেল আইয়ুব খানকে দেশে সেনা শাসন প্রবর্তনের অজুহাত সৃষ্টি করেছিল এই মুজিবেরই গুন্ডামি। পূর্ব পাকিস্তান সংসদে স্পীকার (ডেপুটি) শাহেদ আলী পাটোয়ারীকে চেয়ার দিয়ে পিটিয়ে ঐ সংসদেই মুজিব গুরুতর আহত করেন। এই জখমের কারনে একদিন পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ইন্তেকাল করেন।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসার পর শেখ মুজিব তার বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনী এবং সুসংঘবদ্ধ প্যারা মিলিটারী রক্ষীবাহিনী যা কিনা শাসনতান্ত্রিক ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল, তাদের নিয়ে অসংখ্য দেশ প্রেমিককে বিনা বিচারে হত্যা করিয়েছেন। মুজিব শাহীর পতন না ঘটলে এ দেশে আরো কত রক্ত নদী যে বয়ে যেতো ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। সে সব কুকীর্তি নতুন প্রজন্ম থেকে আড়াল করার জন্যই যে

www.pathagar.com

আওয়ামীরা এবং তাদের বিদেশী প্রভুরা এই মানুষটিকে পুনঃ এই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে মিথ্যা ইমেজ উপস্থাপন করার সর্বাত্মক কোশেশ চালাচ্ছে তা ওয়াকিবহাল মহল পষ্টাপষ্টিই বুঝতে পারছেন। ফ্যাসিষ্ট মুজিবকে যারা ১৯৭০ সালে তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটি দিয়েছিলেন তারাই আবার ১৯৭৩ সালে তার আসল নোংরা রূপ দেখে ওটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এইসব বিষয় আমরা কিছু মানুষ এখনও ভুলে যাই নাই। ওসব বিস্তারিত আপাততঃ থাক।

আওয়ামীরা সন্ত্রাস করে বস্তুতঃ একটি লক্ষ্যে। লক্ষ্যটি হচ্ছে দুর্নীতি করা। দুর্নীতির মাধ্যমে Get Rich Quick-দ্রুত ধনী হওয়া। তাদের নেতা, পাতিনেতা, কর্মী এদের টাকা পয়সা আহরণের একটা হিসাব নিকাশ নিলেই এটা অতি সহজেই ধরা পড়বে। প্রসঙ্গক্রমে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে অর্থাৎ মুজিবী শাসন আমলে আওয়ামী লীগাররা যে লুটপাট করে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়েছিল তা অনেকেরই জানা। তবুও একটি ঘটনা হয়তো অনেকেই জানে না। বিষয়টি হচ্ছে শেখ মুজিব এই সব লুটপাটের যে স্বয়ং লাইসেন্স দিয়েছিলেন তার একটি ঘটনা একজন ঢাকা নগরবাসী মুক্তিযোদ্ধাই আমাকে বলেছেন। ১৯৭২-এর প্রথম দিকের ঘটনা। শেখ মুজিব সিদ্দিকবাজার কমিউনিটি সেন্টারে একটি মিটিং করার পর সেই মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তাব করেন যে, কোন মুক্তিযোদ্ধা যেন অন্যায়ভাবে কারো কাছ থেকে অর্থাদি আদায় না করে, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী না করে। তার সেই প্রস্তাব শুনেই মুজিব তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন। অসম্ভব রকম রেগে গিয়ে তিনি বলে ফেলেন, "১৯৫৪ সালের পর থেকে আমার ছেলেরা কিছু খেতে পায় নাই, এখন ওরা কিছু খাচ্ছে এতে তোমার চোখ টাটায় কেন?" মুজিবের দেয়া এই জঘন্য লাইসেন্স-এর ফলেই সেই মুক্তিযোদ্ধাই আমাকে বলেছেন যে, ঢাকা নগরীসহ সর্বত্রই যেন চাঁদাবাজি, লুণ্ঠন, হত্যা, সন্ত্রাসী এই সব কিছু অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। এই লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় আওয়ামীদের রাতারাতি ধনী হওয়ার নাম দিয়েছিলেন মাওলানা ভাসানি 'লুটপাট' সমিতি হিসাবে।

যথার্থই ছিল এই নামটি। শেখ হাসিনার লোকজনও একই ভাবে সেই 'সমিতি'র কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশের প্রায় সব ধরনের আর্থিক লেনদেনে ওরাই এখন জড়িত। ক্ষুদ্রতম ব্যবসা থেকে বৃহত্তম ঠিকাদারীটি পর্যন্ত তাদের দখলে। শোন যায় তাদের কারো কারো কোটি কোটি টাকা বিদেশের ব্যাংকে প্রতিনিয়তই নাকি জমা হচ্ছে, ফ্লোরিডায় বিশাল সরবরাহ ব্যবসা পেয়ে গেছেন কেউ কেউ। বাংলাদেশের গ্যাস ও তেলের অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের ব্যবসা আদান প্রদানের পথে, দিল্লী, মাইয়ামি ইত্যাদি বিদেশী নগরে-বন্দরে কারো কারো বাড়ী তৈরী হয়ে আছে। যদি সত্যি হয় তবে কার অর্থে এই সব হচ্ছে-পাঠক আন্দাজ করুন।

উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতা-নেত্রীরা এমনিতেই উন্নত বিশ্বের মোকাবেলায় ভালনারেবল (Vulnerable) থাকেন। এরপর যদি এরা নিম্ন বুদ্ধাঙ্কের (Low I,Q) হন, তাহলে এদের অনুগত সেবাদাস হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ উন্নত বিশ্বের বুদ্ধিমান নেতারা গ্রহন করতে বেশি সুযোগ পান। একারনে আওয়ামীরা সেজেছেন

www.pathagar.com

বিদেশীদের পেয়ারের দালাল। দেশের বিরুদ্ধে তারা ব্যবহৃত হচ্ছেন বিদেশীদের স্বার্থে। দেশবিরোধী 'পানি চুক্তি' 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি', দেশের গ্যাস, তেল সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র এসবই এই নিম্ন বুদ্ধাংকের নেতৃত্বের জন্য বাস্তব রূপ লাভ করেছে। ভারতের পরমাণু পলিসিতে ১৬ই জুন যে সমর্থন দেয়া হলো তা ছিল সর্বশেষ দালালী। দেশের মানুষ এখন আর একদিনের জন্যও এইসব দালালদের চেহারা দেখতে চায় না। এরা ব্যর্থই না, এরা বিদেশের লেজুড়। দেশের জন্য বেঈমান, মোনাফেক, ধাপ্পাবাজ। মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই নব্য বাকশালীদের জঘন্য শাসন থেকে তাই এ দেশকে বাঁচানোর ভিন্ন আর কোনই বিকল্প নেই।

২২/০৬/১৯৯৮ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্র সমাচার

কি বলা যায়? হবুচন্দ্রের গবুচন্দ্র? নাকি চোরের সাক্ষী গাঁইট কাটা? নাকি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা? যা খুশি বলুন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর তার আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু এমনই আর এক উদ্ভট কাজ করলেন যে, তা নিয়ে যে কেউ যা খুশি বলতে পারেন!

২৩শে অক্টোবর তার নিজ বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে 'বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার' প্রশ্ন নিয়ে পুনঃ শেখ হাসিনা তার Ego বা অহমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর তারই মন্ত্রী সেই জবাবদিহিতার প্রশ্নে বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানের সাথে এক প্রশ্নোত্তরে (২৪ অক্টোবর) উদ্ভট এক বিশ্লেষন দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ২৩ তারিখে যা বলেছিলেন এবং যা নিয়ে স্বভাবতঃই এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই পুনঃ আদালত অবমাননার প্রশ্ন উঠেছে; আর আইনমন্ত্রী তা Moderate করার সুযোগ নিয়েছেন ২৪ তারিখের বিবিসির এক সাক্ষাৎকারে।

মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তা নির্বাহী ক্ষমতার কাছে জবাবদিহিতা নয়, বরং তা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৯ নং অনুচ্ছেদে যা বলা আছে বা যা প্রভিশন আছে সেই অনুযায়ী 'জবাবদিহিতা' করার কথা। আর প্রধানমন্ত্রী সেটাই মিন (Mean) করেছেন। কিন্তু যারা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনেছেন বা বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত বক্তব্য পড়েছেন, তারাই জানেন এবং বুঝতেও পারেন যে, প্রধানমন্ত্রী আদৌ সংবিধানের ওই ১০৯ নং ধারার কথা Refer করেননি। বরং তিনি নির্বাহী ক্ষমতাধরের কাছেই বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার কথা বলেছেন। এখানে বা এক্ষেত্রে 'জনগণের কাছে জবাবদিহি' করার কথা কি কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাপার হতে পারে? বরং তিনি যা বলেছেন, তার নির্গলিতার্থ হল, যেহেতু তিনি জনগণের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সার্বভৌম ক্ষমতা-ধারণ করে আছেন-সেহেতু তার কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।

অনেকে হয়ত খেয়াল করেছেন যে, শেখ হাসিনা যেদিন তার আদালত সংক্রান্ত এই বক্তব্য পেশ করেছিলেন, সেইদিনই ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উপরে উচ্চপর্যায়ের এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সেমিনারে অংশগ্রহনকারী বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী এবং বিচারকগণ প্রায় একবাক্যেই বলেছিলেন যে, বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা কিভাবে কেমন করে নিশ্চিত করা যায় বা করতে হবে, তা দেশের শাসনতন্ত্র এবং বিচার বিভাগের নিজস্ব সিস্টেমেই স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। মাননীয় বিচারকবৃন্দের এই জবাবদিহিতা নিয়ে নির্বাহী তথা জনগণ-এর কোন কিছুই করার নেই। এবং তা করার প্রশ্ন উঠলে তখন বিচার আর সুবিচার থাকবে না, থাকতে পারবে না। তাই এ নিয়ে নির্বাহী প্রধানের কোন কথা বলার কোন সঙ্গত অধিকার নেই।

www.pathagar.com

মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু হাজার হলেও আইনের পাঠ নিয়েছেন। তাই প্রধানমন্ত্রী যে বেআইনী কাজটি করেছেন-বেআইনীভাবে অসঙ্গত বক্তব্য দিয়ে ফেলেছেন, তা Moderate না করে আইনমন্ত্রী চুপ করে থাকেন কিভাবে! কেননা, শেষ পর্যন্ত আইন মন্ত্রীকেই যে এ বিষয়ে নন্দ ঘোষ সাব্যস্ত হতে হবে! তাছাড়া কথা আছে। প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকেও কিভাবে তিনি পূর্ণমন্ত্রী হতে পেরেছেন, তার জন্যও তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ হাত ছাড়া করা তার উচিত হত কি? তাই মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু শাসনতন্ত্রের ৯৬(৩) ধারায় প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দাবী করেছেন যে, সংসদ 'জুডিসিয়াল কাউন্সিল' গঠন করে বিচারকদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারে। সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে সত্য-এ ধরনের কোন কাউন্সিল গঠন তাই সংসদ করতে পারে। কিন্তু তা যদি ১০৯ ধারার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তার সুরাহা হবে কিভাবে? জুডিশিয়াল কাউন্সিল কি সুপ্রীম কোর্ট এর চেয়েও বেশী ক্ষমতাধর হবে? জুডিশিয়াল কাউন্সিল যদি ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গ নিজেদের সমর্থক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠন করে দেন, তখন এই কাউন্সিল কি আদৌ কোন ন্যায়বিচারকমূলক বডি (Body) হবে? হতে পারবে? নাকি তা বর্তমান নির্বাহী প্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর হাতের পুতুল হবে মাত্র?

বিচার বিভাগ একটি বিশাল এবং প্রাচীন বিভাগ। ব্রিটিশ আমলে এর সূচনা। তারপর পাকিস্তান আমলের ২৩ বছর এবং বাংলাদেশে বিগত ২৮ বছর এই বিভাগটি সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বিশাল এবং প্রাচীনত্বের ঐতিহ্যে নিম্নপর্যায়ের ব্যাপারে কারো কারো কিছু কিছু বিরূপ প্রশ্ন থাকলেও উচ্চতর পর্যায়ে-হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়ে খুব কম প্রশ্ন উঠেছে এযাবৎকাল। নিম্ন জুডিশিয়ারী নিয়ে যে কিছু মন্দ কথা আছে, তা নিয়ে যেমন মাননীয় বিচারপতি নিজেও কিছুদিন আগে একটি মন্তব্য করেছেন, তেমনি উল্লিখিত সেমিনারটিতেও তা কিছুটা সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু এতে করে সামগ্রিক ভাবে জুডিশিয়ারী কোন বিরূপ প্রশ্ন বা সমালোচনার সম্মুখীন হয়নি। নিম্নপর্যায়ের যদি কোন Miscarriage of justice হয়েও থাকে-তা উচ্চপর্যায়ে বা হাইকোর্টে এবং সুপ্রীম কোর্টে সংশোধন হবার সুযোগ থেকেই যায়। Miscarriage কে সংশোধন করা সঙ্গতভাবে সম্ভব হয়। মোট কথা এই যে, এই সিষ্টেমই যে কোন Miscarriage সংশোধন ও শুদ্ধ করতে পারে। এমতাবস্থায় বাইরের যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ শুধু অযৌক্তিকই নয় বরং বাহুল্য বা Superfluous না হয়েই পারে না।

নিম্ন আদালতের Miscarriage of Justice-এর একটি উদাহরণ বোধকরি এখানে উল্লেখ করা যায়। এবং যে Miscarriageটি নিয়ে অনেক বিজ্ঞ আইনজীবী সাথে সাথেই প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বক্তব্য দিয়েছিলেন এখনো তা নিয়ে ইতস্তত নানা কথা উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর। ঢাকার এক বিশেষ জজ কোর্টে সে রায়টি দেয়া হয়েছিল। রায়টিতে বর্তমান সরকারের যে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল, তাও সচেতন সবাই বলাবলি করেই চলেছেন। তাই সঙ্গতভাবেই সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হয়েছে আজ প্রায় এক বছর আগেই। বিজ্ঞ আইনবিদরা সঙ্গতভাবেই আশা করেছেন যে, ৮ই নভেম্বর ১৯৯৮ সনের সেই বিশেষ জজ কোর্টের

www.pathagar.com

রায়টি অবশ্য অবশ্যই হাইকোর্টে সংশোধিত হবে; Miscarriage of Justice এর সংশোধনী হবে আইনানুগ পন্থায়। এই রায়টির উপর সরকারের এবং খোদ সরকার প্রধানের যে গভীর ও মারাত্মক প্রভাব ছিল তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, জুডিশিয়ারীর ওপর সরকারের নির্বাহীদের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রন কি মারাত্মক ও ভয়াল হতে পারে।

অনেকের স্মরণ থাকতে পারে যে, আ'লীগ তাদের রাজনীতির সূচনা কাল থেকেই লম্বা লম্বা কথা বলে এবং তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে বরাবরই উল্লেখ করে যে, তারা ক্ষমতায় বসলে জুডিশিয়ারীকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করবে। বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে-যা কিনা গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের মোদ্দা বিষয়ও বটে। গণতান্ত্রিক উন্নত সভ্য সমাজে সর্বত্র তা নিশ্চিত করাও আছে। কিন্তু এদেশের মানুষের দুভার্গ্য এই যে, বিগত ৫০ বছরে যে তিন তিনবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসেছে, কোন বারই তারা তাদের সে ওয়াদা পূরণ করেনি। বরং উল্টো কাজ করেছে। বিচার বিভাগকে প্রতিবারই ওরা (আ'লীগ সরকার) Tame Down করে কিংবা ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করেছে। শেখ হাসিনা বর্তমান সময়কালে যা করেছেন ঠিক একই ধরণের কাজ করেছিলেন শেখ হাসিনার প্রয়াত পিতা শেখ মুজিবও।

বিচারপতি আবুদর রহমান চৌধুরীর (মরহুম) কাছে আমি একটি ঘটনা শুনেছিলাম। হাইকোর্টের বিচারপতি হবার পর তিনি এক ঈদের দিনে শেখ মুজিবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে অর্থ্যাৎ ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে যান। সৌজন্যের কারনেই বিচারপতি চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছেন? উল্লেখ্য যে, তারা দু'জনই কলকাতায় ৪০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই পরিচিত ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী ও সহযাত্রী ছিলেন দুইজনই। চৌধুরী সাহেবের সৌজন্য মূলক প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব যেন রেগে ফেটে পড়েন। হুংকার ছেড়ে বলেন, "কেমন আর থাকব চৌধুরী সাহেব? আমরা চোর ধরি-গ্রেফতার করি, আর আপনারা বিচারপতিরা জামিন দিয়ে দেন।"

ব্যক্তি জজ বা বিচারপতিদের শেখ মুজিব এই ভাবেই সাইজ আপ করতেন। পরে এই মাননীয় বিচারপতিই রক্ষীবাহিনীকে 'শাসনতন্ত্র বর্হিভূত' এবং তাই 'বেআইনী' ঘোষণা করে রায় দিয়েছিলেন। ফলে তার চাকরি হারিয়েছিলেন। বিচারপতি চৌধুরীকে শেখ মুজিব বরখাস্ত করেছিলেন। শেখ হাসিনা বিচার বিভাগ বিশেষ করে হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্ট এবং তাদের বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ বিচারকদের বিরুদ্ধে যেসব মারাত্মক ও অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েই চলেছেন, তা যে সেই বাকশালী প্রেতাত্মারই প্রতিধ্বনি, তা বুঝতে কি কারো বেগ পাওয়ার কথা?

বিগত সোয়া তিন বছরের দুঃশাসনে শেখ হাসিনা (এবং আ'লীগ সরকার) দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে সবকিছু Vital Sector ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখন বাকী আছে শুধুমাত্র হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্ট। এদের লক্ষ্য বোধ করি মানুষের সর্বশেষ ভরসাস্থল এই উচ্চ আদালতকেও সমূলে ধ্বংস করা। নব্য বাকশাল কায়েমের

www.pathagar.com

খায়েশ ষোলকলায় পূর্ণ করা। শেখ হাসিনাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে গত ২৬শে অক্টোবর দৈনিক দিনকালে লন্ডন থেকে সিরাজুর রহমান (বিবিসি খ্যাত-এখন অবসরপ্রাপ্ত) শেখ হাসিনা, স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী প্রমুখের বিভিন্ন অন্যায় কাজ নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি সঙ্গতভাবেই তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, Charity must begin at home সিরাজুর রহামনের নিবন্ধটি আমার কাছে বিশেষ করে অর্থবহ। শেখ হাসিনা লন্ডন প্রবাসী সিরাজের কোন শত্রুপক্ষ নন। বরং অনেক আপনজন বলেই আমি জানতাম। হাসিনা ১৯৭৫-৮১ সময়কালে শুধু নয় বরং এরপরও লন্ডনে গেলে সিরাজের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। শেখ মুজিবের ছবিও নাকি সিরাজের Bed Room-এ শোভা পেত, এখনকার খবর জানিনা।

আমার এই সব জানার সূত্র বিশেষ করে সুফিয়া রহমান-সিরাজের স্ত্রী। আমাদের রংপুরের (বৃহত্তর) মেয়ে এবং আমার সাথে ১৯৮৩-৮৪ সেশনে কিছু কোর্স ওর্য়াক করার সুবাদে প্রায়ই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন লাইব্রেরী, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি জায়গায় দেখা হত, অনেক কথাবার্তাও হত। শেখ হাসিনার অপকর্মাদি নিয়ে সিরাজুর রহমান আরো কিছু নিবন্ধ এদেশের কোন কোন দৈনিকে লিখেছেন। আমি তার অন্ততঃ দুইটি পড়ে দেখেছি। এতে বুঝা যায় যে, শেখ হাসিনার এক সময়ের নিজের মানুষ এবং আপনজনেরা কত মারাত্মকভাবে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ বিচার বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রন কায়েম করার অপচেষ্টা নিশ্চিতভাবে আ'লীগ সরকারকে দেশের বিচার ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ থেকে সম্পুর্ন রূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। কোন সুস্থমনা মানুষই এদের পক্ষে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না। উচ্চতম আদালত এবং বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনাদের জঘন্য ষড়যন্ত্র বাস্তব রূপ লাভ করার আগেই দেশের মানুষের উচিত সম্মিলিত ভাবে এদের রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা। দুঃখ হয়, শেখ হাসিনার আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরুর জন্য। করুণা করতে হয় এই আইনবিদকে। ক্ষমতা ও গদির মোহ একজন শিক্ষিত মানুষকে যে কোথায় নামাতে পারে, ভাবতেও খারাপ লাগে। নৈতিকতা, ETHICS এবং মূল্যবোধের কি মারাত্মক বির্পযয়!

০১/১১/১৯৯৯ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ ঃ 'ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু'!

'সত্যি সেলুকাস! কি বিচিত্র এদেশ!'। আমি বলতে চাই ভিন্নভাবে। দেশ কেন বিচিত্র হবে? বিচিত্র বরং এ দেশের কিছু কিছু মানুষ। এই স্বল্প সংখ্যক মানুষের জন্যই দেশ যেমন বিচিত্র হচ্ছে। তেমনি বোধ করি বেশী করে চিড়িয়া বনছে আমাদের মত কিছু কিছু তথাকথিত ডিগ্রীধারী ও বড় পজিশন দখলকারী ব্যক্তিবর্গ। ১০ আগষ্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে একজন বক্তার বক্তব্য ছিল এইরূপ ঃ ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। আর পাকিস্তান আমাদের পরীক্ষিত শত্রু। এই বক্তব্য এসেছে এদেশেরই একজন নামী-দামী ব্যক্তির মুখ থেকে। হয়তোবা ১৯৪৭ সালে এই দেশ পাকিস্তানের অংশ না হয়ে যদি ভারত ইউনিয়নের একটি প্রদেশ বা প্রদেশের অংশ হত (অবশ্যই তাই হতে হতো) তাহলে এই ধরনের বাংলাভাষী শেখ-খানরা কলকাতার 'দাদাদের প্রতিযোগীতায় কোথায় স্থান পেত-আনন্দবাজার, অমৃতবাজার ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক, কিংবা বসু চ্যাটার্জি-ব্যানার্জী গাঙ্গুলীদের মোকাবেলায় কোথায় দাঁড়াতে পারত, কিংবা কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ কোন সচিব, বিভাগীয় প্রধান, কিংবা প্রধান প্রকৌশলী, মুখ্য মেডিকেল অফিসার, হাইকোর্টের জজ এমন কোন পজিসন ক'জন পূর্ব বাংলার 'নেড়ে'দের সন্তানের ভাগ্যে জুটতো'?

পাকিস্তান বাংলাদেশের 'পরীক্ষিত শত্রু'। ১৯৭১ সালের কিংবা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৩/২৪ বছর সময়কালের জন্য বক্তব্যটি না হয় মেনে নেয়া যায়। কিন্তু তারপরও অর্থ্যাৎ বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা বা স্বাধীন হবার পরও কি ঐ মন্তব্যটি সঠিক হতে পারে?

পাকিস্তান ১৯৪৭-এর ১৪ই আগষ্টের পর থেকে দুনিয়ার কাছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত। বৃটিশ ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করেই কিংবা অংশ বিশেষ নিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্র বৈধভাবে গঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট। আর সেই পাকিস্তানের প্রধান স্থপতি জিন্নাহকে ধরা হলেও এই দেশের বা তদানীন্তন সময়কালের আমাদের পূর্ব পুরুষরাই বা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষই পাকিস্তান কায়েম করার জন্য গণতান্ত্রিক পন্থায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সেই ক্রিটিক্যাল সময়কালে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে এদেশের মানুষ প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট দিয়ে পাকিস্তান কায়েম সুনিশ্চিত করেছিল। উল্লেখ্য যে এদেশের মানুষের সাথে ভারতের (বর্তমান) আরও কিছু কিছু অঞ্চলের মানুষ যখন পাকিস্তান কায়েমের স্বপক্ষে তাদের গণতান্ত্রিক রায় দিয়েছিল যারা জানতো যে তাদের নিজস্ব এলাকা কোন দিনই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবুও তারা পাকিস্তান ইস্যু সমর্থন করেছিল-তখন কিন্তু বর্তমান আমলের পাকিস্তান এলাকার অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষে এবসলিউট রায় দেয় নাই। ওরা বরং ছিল বিভক্ত বা সিদ্ধান্তহীন। কিন্তু এই পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের রায়ে সেদিন কোন Ambiguity বা অস্পষ্টতা রাখে নাই। তার অর্থ কি ছিল? পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল পূর্ব বাংলার (বাংলাদেশ) মানুষের গণতান্ত্রিক রায়ের ফলে সম্পূর্ণ বৈধ ভাবে

www.pathagar.com

সৃষ্ট। এটাই সঠিক ইতিহাস। ভিন্ন বিশ্লেষন ইতিহাসের বিকৃতি। তাছাড়াও কথা ছিল। পাকিস্তানের পক্ষে তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের মুসলমানরা মারাত্মকভাবে দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন না। মাওলানা আজাদ বা মাওলানা হোসেন আহাম্মদ-এর মত দু'চার জন ব্যক্তিত্বের মতামত ভিন্নতর থাকলেও জনতার কাতার থেকে তারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী মাত্র। পুরাতন মানুষ অর্থ্যাৎ বয়স্ক মানুষ যারা এখনো বেঁচে আছেন তাদের মনে থাকার কথা যে, কলকাতা গড়ের মাঠে বহুকাল থেকে মাওলানা আজাদ ঈদের জামাতে ইমামতি করতেন, সেই আজাদ যখন পাকিস্তান কায়েমের বিরোধীতা করেন বলে মানুষ জানতে পারে, তখন সে জামাতে মাওলানা আজাদের ইমামতিতে ঈদের নামায পড়তে তারা অস্বীকার করলেন। মাওলানা আজাদকে চলে যেতে হলো ইমামতির মর্যাদা পরিত্যাগ করে। মোটকথা ছিল এই যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েমের জন্য বৃটিশ ভারতের সকল মুসলমানদের সাথে বাংলার মুসলমানরাও একাত্ম ছিল। বরং আরো উল্লেখ করতে হয় যে, পূর্ববাংলার শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের জন্য পাকিস্তান কায়েম করা বেশী জরুরী বলে তারা বিশ্বাস করেছিল। কেননা ইসলামের সাম্য চেতনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সেই ধরনের স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক ছিল।

১৯৪৭ সালে রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাধারণ মানুষের স্বপ্নে দেখা পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বহুলাংশেই অপূরণ ছিল সন্দেহ নাই। আর সে কারনে স্বাভাবিক ভাবেই হতাশা এবং অসন্তোষ ছিল মানুষের মধ্যে। মনে, চিন্তায়, চেতনায়। যে কারনে ১৯৭১-এর যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার এবং বিশেষ করে আর্মি এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল, অবশ্য হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল। সে যুদ্ধ ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। পাকিস্তান আর্মি পরাজিত হয়েছে। তারা এবং পাকিস্তান সরকার এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। গত ২৮ বছর তারা এদেশ থেকে কমপক্ষে এক হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে। সে দেশের সাথে নামমাত্র কূটনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া এখন আর প্রায়ই কোন সম্পর্ক নেই। তারা এদেশে তেমন কোন ব্যবসা বাণিজ্যও করে না। তাদের সাথে আমাদের কোন সাধারণ বর্ডারও নেই। তাই পুনঃ কোনকালে যুদ্ধ হবার সম্ভাবনাও নেই। এমতাবস্থায় পাকিস্তান আগে শত্রু থাকলেও এখন বা ভবিষ্যতে কোনরূপ শত্রু হবার সম্ভাবনা কোনভাবেই নেই। তাই পাকিস্তানকে নতুন করে 'শত্রু' চিহ্নিত করার কোন যথার্থ কারন থাকতে পারে কি? নাকি পাকিস্তান যেহেতু ভারতের 'এক নম্বর' শত্রু, তাই বাংলাদেশের 'বন্ধু' ভারতের শত্রু হবার কারনেই বাংলাদেশের কি চিহ্নিত শত্রু পাকিস্তান?

ভারত বাংলাদেশের 'পরীক্ষিত বন্ধু'-এই বক্তব্যই বা কতটুকু সঠিক? কে না জানে যে রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলতে কিছুই নাই। আজ 'যে বা যারা' বন্ধু কাল যে তারা শত্রু হবে না এমন কোন গ্যারান্টি কোথাও নেই। কেউই সেই ধরনের গ্যারান্টি দিতে পারে না। তাই ১৯৭১ সালে ভারত আমাদের বন্ধু হয়েছিল বলে চিরস্থায়ী বন্ধু হয়ে থাকবে বা আছে এমনটি কোন যুক্তিযুক্ত কথা নয়। বরং বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে ভারত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর

www.pathagar.com

থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে শত্রুর ভূমিকা পালন করেছে এবং তা অব্যাহতভাবেই করছে।

বাংলাদেশের জন্য ১৯৭১ সালে ভারত যে বন্ধু সেজেছিল তা যতটা না বাংলাদেশের মানুষের জন্য তাদের দরদ এর জন্য ছিল, তার চেয়ে এই মানুষ দেখানো বন্ধুত্ব ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থেই।

একাত্তরে আমরা স্বাধীন আবাসভূমি লাভ করেছি, কিন্তু ভারত কম লাভবান হয়নি। বাংলাদেশ এখন ভারতের 'বন্দী বাজার'। ভারতের স্বপক্ষে বাণিজ্য লাভ প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। ১৯৯৮ সালে এর পরিমাণ ছিল প্রায় বারো হাজার কোটি টাকা। ১৯৯৯ সালে এর পরিমাণ কমবার সম্ভাবনা নেই। বরং আরো বেড়েই যাবে। বাংলাদেশ অধিক থেকে অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ভারতের সবকিছু বিষয়ের উপর। অর্থনীতি, রাজনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, সংস্কৃতি এমনকি দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার বিষয়েও। ইতিহাসকে বাংলাদেশের ভারতীয়করণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে ঢেলে সাজানো হচ্ছে মারাত্মকভাবে বিকৃত করে। এই সব কিছুর অসৎ লক্ষ্যের মূল একটিই এবং তা হচ্ছে কংগ্রেস ও নেহেরু, প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ প্রমূখের এক এবং অখন্ড ভারত দর্শনের ধারায় এবং বিশ্বাসে এই দেশের নতুন প্রজন্মকে মন-মননে মেজাজে-চিন্তা-চেতনায় বড় করা। বাংলাদেশের মুসলিম জাতিসত্তার যে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এখানে গড়ে উঠেছে তা থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারদের বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ করে গড়ে তোলা। যেমনটি কিনা ১৯৪৭ পূর্ব সময়কালে শ্যামাপ্রসাদ, প্যাটেল, নেহেরু প্রমুখ নেতারা লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। নেহেরুর ভাষায় যদি বলা যায় তা হলো নিম্নরূপ ১৯৪৭ এর ১৪ই আগষ্ট অর্থ্যাৎ পাকিস্তান কায়েমের দিন থেকে মাত্র নয় সপ্তাহ আগে ২৩শে মে পন্ডিত নেহেরু সেই সময়কালের মুসলমান কংগ্রেসী নেতা টিপারার (কুমিল্লা) অশরাফ উদ্দিন চৌধুরীকে এক পত্র দিয়ে এই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন যে কংগ্রেস কোন দিনই ভারত বিভাগ সত্যিকার অর্থে মেনে নিবে না। তবে ক্ষণিকের বা কিছু কালের জন্য তা আপাততঃ কংগ্রেস মেনে নিচ্ছে এই জন্য যে, এই পথেই 'ভারত বরং দ্রুত এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার তার অখন্ডত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেই।' (দেখুন জামাল উদ্দিন চৌধুরী প্রণীত আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর রাজবিরোধী জীবন এবং কায়দে আযম স্মৃতি কমিটি প্রকাশিত কায়েদে আযম জিন্নাহর ১০৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা ঢাকা ১৯৮৫)।

পূর্ব বাংলার বিশেষ মুসলিম বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য পুরোপুরি ভারতের দয়ায় বা Assimilation হবার নিয়ন্ত্রনে ছেড়ে দেয়া হবে এমনটি বোধ হয় শেখ মুজিবও মন থেকে চাননি। কিন্তু এই দেশের মানুষের চরম দুর্ভাগ্য এই যে, ১৯৭২-৭৫ সালে শেখের উপর দিল্লীর নিয়ন্ত্রন এবং খবরদারী এবং তার চেয়েও মারাত্মক আকারে বর্তমান সময়কালে বিগত তিন বছরে দিল্লী যেভাবে বাংলাদেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রন এবং মনিটর করছে তাতে এ দেশের মানুষের ঐতিহ্যগত মুসলিম স্বাতন্ত্র্য এবং আজাদী সংরক্ষিত হতে পারে বলে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের আরো দুর্ভাগ্য এই যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য

www.pathagar.com

সমূলে ধ্বংস করার জন্যই তথাকথিত কিছু নব্য বুদ্ধিজীবী ভারতকে 'পরীক্ষিত বন্ধু' হিসাবে তাদের এবসলিউট আনুগত্য এবং অনুকরণ করবার জন্য আমাদেরকে সময় সুযোগ মত তাদের তথাকথিত উপদেশ খয়রাত করছেন। সাধারণ মানুষ এদের ওসব বস্তাপচা উপদেশ শুনবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তবুও তারা যে এই ভাবে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে কোন কোন মানুষকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করতে পারে তা বোধ করি সহজেই আন্দাজযোগ্য। তাই সাবধান হবার প্রয়োজন আছে আমাদের সত্যিকার আজাদী প্রিয় এবং খাঁটি দেশপ্রেমিকদের। বিশেষ করে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য চেতনা রক্ষার প্রয়োজনীয়তায় আমরা যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তাদের। আর এই পথেই মাত্র যে এ দেশের আজাদী চিরস্থায়ী হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

২২/০৮/১৯৯৯ইং, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

খাঁটিদের বিরুদ্ধে মেকীদের আস্ফালন কেন?

১৭ই আগষ্ট রাতের বিবিসি বাংলা অনুষ্ঠানে প্রচারিত শেখ হাসিনার একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি শুনে রাতটিতে এই ভেবে অপেক্ষা করেছিলাম যে পরের দিন কোন ঢাকার পত্রিকায় তার সেই বক্তব্যের উদ্ধৃতিটি প্রকাশিত হয় কি না। সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকটি দৈনিকের মধ্যে একটিতে সেই উক্তিটি হুবহু দেখতে পেলাম। উক্তিটি ছিল নিম্নরূপঃ 'যারা '৭১ সালের বাংলাদেশের জনগণের বিজয় মেনে নিতে পারেনি সেই পরাজিত শক্তিই '৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনককে হত্যা করেছে'। বিবিসি হুবহু তাকে এই ভাবেই কোট (Quote) করেছিল। যে পত্রিকাটি থেকে আমি উদ্ধৃতিটি এখানে দিলাম, সে পত্রিকাটি বিরোধী দলের নয়। বরং বহুলাংশেই শেখ হাসিনার আ'লীগ সরকারের সমর্থক। তাই কোটেশানটি নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া-বিবিসি এর বাংলা বিভাগ আওয়ামী লীগ তথা শেখ হাসিনার এবং সরকারের প্রতি আগাগোড়াই সহানুভূতিশীল। তারা কোন দুঃখে বা কারনে শেখ হাসিনাকে 'মিস কোট' করতে যাবে? তাই নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় যে, শেখ হাসিনা এই ভাবেই তার বক্তব্য দিয়েছেন-১৭ই আগষ্টে তাদের নিজস্ব পল্টনের জনসভায়।

পাঠক, একটু খেয়াল করুন। শেখ হাসিনা বলেছেন, শেখ মুজিবকে '৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট উৎখাত করেছিল তারাই-যারা নাকি '৭১ এর বিজয়কে মেনে নেয় নাই। কত বড় ডাহা মিথ্যা কথা। ১৫ই আগষ্টের যারা নায়ক তারা বস্তুতঃ সকলেই '৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা। এরা বিভিন্ন সেক্টরে জান প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন '৭১-এর বিজয়ের জন্য। সত্য কথা এই যে, ওরা সবাই পাক আর্মির অফিসার বা জোয়ান ছিলেন ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের আগে। কিন্তু ২৫শে মার্চের সেই কালো রাতের পর তারা বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পথে পাক আর্মির পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সেই পাক আমলে ৪০/ ৫০ হাজার বাংলাভাষী অফিসার ও জোয়ান পাক আর্মিতে কাজ করতেন। তাদের মধ্যে পাকিস্তানের পক্ষ যারা ত্যাগ করেননি, তাদের মধ্যে ফারুক-রশিদরা পাক আর্মি থেকে ডিফেক্ট করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছেন এবং এরা জেনুইন মুক্তিযোদ্ধা। সেই '৭১-এ দেশের যারা পাকিস্তানের পক্ষে বা পাক আর্মির পক্ষে কাজ করেছিলেন, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে তারা কেউই জড়িত ছিলেন না। অথচ '৭৫ এর নায়ক এই সব খাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের শেখ হাসিনা আজ ২৭/২৮ বছর পর এই বলে দোষারোপ করেছেন যে, তারা নাকি '৭১ এর বিজয় মেনে নিতে পারেননি। মানুষ যদি প্রশ্ন করে যে, শেখ হাসিনা সেই '৭১ এ কি করেছিলেন? কোথায় ছিলেন? কার অনুগ্রহে এবং প্রেটেকশনে ছিলেন? শেখ মুজিবই বা পশ্চিম পাকিস্তানে 'জেলখানা'য় বসে তার পাইপের জন্য 'এরিনমোর' তামাক সরবরাহ পাচ্ছিলেন কেমন করে? বৃটেনের তৈরি এই অভিজাত এবং অনেক দামী তামাক কেন দিচ্ছিল পাকিস্তানীরা তাকে তাঁর কথিত 'ফাঁসি'

www.pathagar.com

এবং 'কবর' দেয়ার আগ পর্যন্ত, এবং যে তামাক তার হাতে এবং তার পাইপে জ্বলছিল সেই ৯ই জানুয়ারী-৭২-এ যখন শেখ মুজিব লন্ডনের ক্লারিজেস হোটেলের লবিতে বসে প্রেস কনফারেন্স এ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন?

বস্তুতঃ ঢাকায় যেমন শেখ হাসিনা পাক সরকারের নিকট থেকে মা-বোন-ভাইদের সাথে ভাতা, নিরাপত্তা এমনকি বিশেষ দেশে তৈরী বিশেষ বিশেষ জিনিসের সরবরাহ প্রয়োজনমত ও নিয়মিত পাচ্ছিলেন তেমনি শেখ মুজিবও পাচ্ছিলেন নিয়মিত সবকিছু। প্রশ্ন, ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত একজন আসামী কোন রহস্যময় কারনে তার পাইপের জন্য ইংল্যান্ডের তৈরী এরিনমোর তামাকের সরবরাহ পাবেন এবং সেই ফাঁসির আসামীর পরিবার-পরিজনই বা কেন পাবেন মাসোহারা নিয়মিতভাবে? এখনকার হাসিনা সরকারের ফাঁসির আসামী ফারুক-শাহরিয়াররা কি ওই ধরনের কোন বিশেষ জিনিসের সরবরাহ পাচ্ছেন ঢাকার জেলখানার 'ডেথ সেলের' অভ্যন্তরে? কিংবা তাদের ফ্যামিলির লোকজন পাচ্ছেন সরকারী মাসোহারা? অন্যভাবে বললে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ ও তার পরিবার যখন আরাম আয়েশে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন ফারুকদের মত শাহরিয়ার, রশিদ প্রমুখ বন্দুক হাতে লিপ্ত ছিলেন মাঠে-ঘাটে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে।

দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মুজিবের অবদান স্বীকার করে নিয়ে একই সাথে একথা বলতে হয় যে, প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে তার কোনরূপ অংশগ্রহন ছিল না। ছিল না অংশগ্রহনকারীদের জন্য সত্যিকার সহানুভূতি বা দরদ। যে কারনে কোন মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি একটি বারের জন্যও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। একথা সবাই জানে। আরো জানা আছে যে, এই জন্যই তার মধ্যে তাজউদ্দিনের প্রতি তার একদিকে ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে নিজে অংশগ্রহন না করার জন্যও হীনমন্যতাবোধ কাজ করছিল। আর এই কারনে তিনি একসময় তাজউদ্দিনকে ক্ষমতার বলয় থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। আর একথাও কারো অজানা নয় যে, '৭৫এর ১৫ই আগস্টের আগে পর্যন্ত শেখ মুজিব কোনদিনও 'মুজিব নগর' যাওয়ার কথা মুখেও আনেননি। এ বিষয়গুলো রূঢ় সত্য। ইতিহাসের বিশ্লেষনের বিষয়বস্তু।

সেই একই হীনমন্যতার ধারবাহিকতায় শেখ হাসিনা বিশেষ কায়দা করে তাজউদ্দীনের ছোটভাই আফসার উদ্দীনকে মাত্র এক বছরের মাথায় ১৯৯৭ সালে মন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত করেছিলেন কিনা কে বলবে। কে জানে শেখ হাসিনার বানানো একজন 'জাতীয় অধ্যাপক'- যিনি কিনা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সরকারের খাস সমর্থক ছিলেন (এবং যার সহোদর ছোট ভাই পাকিস্তানের অন্যতম আর্মি জেনারেল হিসাবে সদ্য অবসর নিয়েছেন, সে দেশে পূর্ণ মেয়াদ চাকুরী করার পর এবং ওখানেই সেটেল করেছেন, পাকিস্তানীই রয়ে গেছেন বাংলাদেশী বনেন নাই)-সত্তুর উর্ধ্বের সেই অধ্যাপক সাহেব কিনা এখন যার পর নাই বাঙালী সেজেছেন, ঘোর পাক বিরোধীদের খাতায় নাম লিখিয়ে এখন পাকিস্তানের চৌদ্দগোষ্ঠী ধোলাই করছেন।

এই অধ্যাপকের আরো ঘটনার নজির আছে। এবং সেই ধরনের এক নজীরের সাক্ষী হলেন মোনেম খানের সময়ের ঢাকার ডাকসাইটে ডেপুটি কমিশনার বা ডিসি।

www.pathagar.com

তখন সেই অধ্যাপক সাহেব ছিলেন বরিশাল সরকারী ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি বরিশাল থেকে ময়মিনসিংহের আনন্দমোহন সরকারী কলেজে বদলী চান। কেন, কারনটা তার নিজস্ব সুবিধার জন্য। এই কারনে গর্ভনর মোনেম খানের কাছে সুপারিশ করার জন্য সেই ডিসি সাহেবকে ধরেন অধ্যক্ষ সাহেব। ডিসি সাহেব কি আর করেন। অগত্যা অধ্যক্ষ সাহেবকে নিয়ে যান গর্ভনর মোনেম সাহেবের কাছে। ডিসি সাহেব সুপারিশ করেন সংক্ষেপে। কিন্তু হঠাৎ করেই এক ঘটনা ঘটান অধ্যক্ষ সাহেব। তিনি মোনেম খানের দু'পা জড়িয়ে ধরেন। পাঠক, ভুল করবেন না। ভুল ভাববেন না। মোনেম খানকে তিনি কদমবুচি করছিলেন না। কদমবুচি করার প্রশ্নই উঠে না। প্রশ্ন যে উঠে না তা বুঝা গেল, যখন গর্ভনর মোনেম খান তার পা সরিয়ে নিতে নিতে বলছিলেন, 'কি করেন অধ্যক্ষ সাহেব, আপনি আমার থেকে কম কিসে? আপনি একজন অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ-আপনার কি আত্মসম্মান জ্ঞান নেই? সেইদিন গর্ভনর মোনেম খান নাকি আরো বলেছিলেন, 'অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হিসাবে যার নূন্যতম আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, তাকে তো আমি আর অধ্যক্ষ পদেই রাখতে পারি না'।

আমি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নই। কিন্তু আমি 'ঘোড়ার মুখ' থেকে-যাকে ইংরেজীতে 'From the horses mouth' বলে, তার থেকেই শুনেছি। তিনি একটি স্মৃতিমূলক গ্রন্থে এই ঘটনাটি ওই অধ্যক্ষের/ অধ্যাপকের নাম উল্লেখ না করেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এবং আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার সঠিক পরিচয়ও দিয়েছেন। সেই অধ্যাপক/ অধ্যক্ষই এখন শেখ হাসিনার বানানো জাতীয় অধ্যাপক এবং তার দলীয় থিংক-ট্যাংক। কারণ '৭১-এ দেশে পাক সরকারের খয়ের খাঁ থেকেও আজ তিনি অতি বড় মুক্তিযোদ্ধা। আর যে ফারুকরা সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা এবং জানবাজ দেশপ্রেমিক, তারা কিনা 'ডেথসেল'-এ প্রহর গুনছে শেখ হাসিনার 'গিলোটিনের' অপেক্ষায়। এবং তার চেয়েও বড় দুঃখজনক বোধ করি এই যে, ওরা '৭১ এর বিজয়কে নাকি মেনে নিতে পারেনি। যারা বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল-তারাই কিনা আজ হাসিনার দৃষ্টিতে বিজয়ের বিপক্ষে।

শেখ হাসিনা এবং শেখ মুজিবের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, হীনমন্যতাবোধের আরও একটি কারন ছিল। কারনটি ছিল দিল্লীর কাছে শেখ মুজিবের গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সংশয়। কেননা, ইন্দিরা সেই ১৯৭১ সালের সূচনাতেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "যে জেনারেল যুদ্ধ ঘোষণা করার পর আত্মসর্মপণ করে তকে বিশ্বাস করা যায় কিভাবে?" তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন তাজউদ্দিন এবং মোশতাক আহম্মেদকে-যখন তারা মুজিবকে প্রধান করে প্রবাসী সরকার গঠন করার পর প্রথমবার সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে। একই সাথে সাহায্য সমর্থন এবং বাংলাদেশের কুটনৈতিক স্বীকৃতিরও আবেদন করেছিলেন তারা ভারত সরকারের কাছে।

এই সন্দেহের কারনে ইন্দিরার কাছে মুজিব যে কত দুর্বল ছিলেন, তার কিছু কিছু প্রমাণ আছে J.N Dixit-এর লিখিত ও সাম্প্রতিক প্রকাশিত Liberation and Beyond পুস্তকটিতে। এর আগেও দীক্ষিত অন্যত্র লিখেছিলেন যে, ১৯৭২ এর

www.pathagar.com

প্রথম দিকে ইন্দিরার কাছে শেখ মুজিব সেই কুখ্যাত ২৫ বছরের চুক্তিটি করার জন্য কতই না কাকুতি-মিনতি করেছিলেন। এর অন্য আরো কিছু কারনের মধ্যে নিজেকে ইন্দিরার কাছে বেশী বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করার বিষয়টি যে মূখ্য ছিল, তা বোধ করি বিস্তারিত না বললেও বুঝা যায়।

কার না এখন জানার কথা যে, "মুজিব এই চুক্তিটি করে বাংলাদেশকে দিল্লীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। স্বার্বভৌমত্ব দিল্লীর নিয়ন্ত্রনে দিয়ে দিয়েছিলেন যেমন ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মীরজাফর এই দেশের আজাদী তুলে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে"। উল্লেখ করা বোধ করি নিষ্প্রয়োজন যে, ১৭৫৭ সালের সেই কুখ্যাত চুক্তিটির ২নং ধারার অধীনতামূলক Content এর সাথে ১৯৭২ সালের ২৫ বছরের চুক্তিটির ৮, ৯ এবং ১০ নং ধারার হুবহু মিল লক্ষ্যণীয়। এইভাবেই বিভিন্ন আত্মঘাতী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব যখন এই দেশটিকে সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর অনুগ্রহ, খবরদারী এবং নিয়ন্ত্রনে দিয়ে দিচ্ছিলেন এবং যে পথে মুজিব বুঝে হোক না বুঝে হোক শুধুমাত্র ক্ষমতা আকড়ে থাকার নেশায় দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করছিলেন, মানুষকে নিপীড়নের চরম সীমায় এনে নিঃশেষ করে দিচ্ছিলেন, তখনই এদেশ বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা ফারুকরা। কেননা দেশের প্রায় সকল মানুষের মতই এরা বুঝতে পেরেছিল যে, শেখকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে দিলে দেশের মাটি থাকলেও স্বাধীনতা থাকবে না। সরকার থাকলেও তা হবে দিল্লীর পুতুল। মানুষ থাকলেও মন খুলে, প্রাণ খুলে তারা কথা বলতে পারবে না। স্বাধীনভাবে তারা নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। তাই এসেছিল '৭৫এর ১৫ই আগষ্ট। '৭১ এর বিজয়ের অপূর্ণতা ওই আগষ্টেই পূর্ণতা লাভ করেছিল। '৭১-এর বিজয়ের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল ১৯৭৫এর ১৫-ই আগষ্টেই।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্টেই যে আমাদের বিজয়ের পূর্ণতা এসেছিল তার অনেক প্রমাণের মধ্যে বোধকরি একটি উল্লেখ করা যায়। যে চীন আমাদের বহুদিনের এবং বলা যায়, পরীক্ষিত বন্ধু ছিল, তারা ওই আগষ্টের সফল অভুত্থানের পরে যে সরকার গঠিত হয়, তাকেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। দিয়েছিল বাংলাদেশের বিজয়ের পূর্ণতার স্বীকৃতি। যে একান্ত ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ সৌদি আরব, তারাও ওই '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পরই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত দিয়েছিল। এর আগে মুজিবের জীবদ্দশায় মুজিব অনেক কোশেশ করেও তা সৌদিদের নিকট থেকে আদায় করতে পারেনি। তাই '৭১এর বিজয় পূর্ণতা লাভ করে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের সফল সামরিক অভুত্থানের পরই। আর এই কাজটি করেছিলেন তারাই-যারা একাত্তরে জান-প্রাণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। আপাততঃ শেষ কথা হিসাবে এই বলা যায় যে, এক্ষেত্রে শেখ হাসিনার মুখে '৭১-এর বিজয়ের এই প্রসঙ্গটি আদৌ মানায় না। আস্ফালন বলেই মনে হয়।

১১/০৯/১৯৯৯ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

এই ঘৃণা ছড়ানো কেন?

জনকণ্ঠে জনাব মুনতাসির মামুন 'রাজাকারের মন' শিরোনামে একটি সিরিয়াল লিখেছেন। তিনি 'রাজাকার'দের ঘৃণা করেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, এটা তার নিজস্ব ব্যাপার। ঘৃণা ছড়িয়ে যারা আনন্দ পান, তারা কেমন মানুষ তা বোধ করি আমার বলার কথা নয়। ঘৃণার বদলে ঘৃণা প্রতিদান তাও আমার অপছন্দের বিষয়। আমার রুচি বিরুদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু একটি বিষয়ে বোধ করি না বললেই নয়। এ ধরনের একটি মানসিক তাগিদ থেকে আমি কয়েক পৃষ্ঠার একটি লেখা গত ১৫ই সেপ্টেম্বর লিখেছিলাম। আর সেটি দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদ-এর ঠিকানায় ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে দু'সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু সেই বক্তব্যটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। মিস্টার মামুন সেই কলাম এখনো লিখেই চলেছেন, অন্য কথায় তিনি তার কলাম ঘৃণার বিষ ছড়িয়েই চলেছেন। অথচ ঐ বিষয়ের বিপরীতে অনেকের বক্তব্য আছে-যেমন আমি একজন। সে বক্তব্যের বিষয়বস্তু ঐ প্রিন্ট মিডিয়ায় তারা প্রকাশ করছেন না। করবেন বলেও আশা করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় মিস্টার মামুনের বক্তব্যের একটি ইস্যু অন্ততঃ আমার মত করে অন্য আর কেউই প্রকাশ করে কিনা সেই আশায় এই নিবন্ধটি লিখছি।

মিস্টার মামুনের সে বিষয়টির আমি একটি প্রতিবাদলিপি জনকণ্ঠে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলাম, তা ছিল মরহুম ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের The Wastes of Time Reflections on the Decline and Fall of East Pakistan বইটির কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে। বিষয়বস্তুকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য পেশ করি। এ বিষয়ে আমার প্রতিবাদ পেশ করার একটি কারন ছিল এই যে, ঐ বইটি অবশ্য আমরা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে নিজেদের উদ্যোগে প্রকাশ করি। কেননা, আমরা বুঝে ছিলাম যে, ঐ বইয়ের বক্তব্যগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বস্তুতঃ বইটি প্রকাশ করার আগেই বইটির পান্ডুলিপি আমি সংগ্রহ করি এবং তা ভালভাবে পড়ে দেখি। ১৯৭২-৭৩ সালে লেখক মরহুম ড. সাজ্জাদ হোসায়েন এটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীজবনে (বিনা বিচারে) মানসিক বিধ্বস্ত অবস্থায় লিখলেও বইটির ভাষা, শৈলী, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদি আমার কাছে অপূর্ব মনে হয়েছে।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে ইংরেজী ভাষাবিদ নই। কিন্তু ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে থাকার ও পড়াশুনা করার সুবাদে সুখপাঠ্য ইংরেজী কোনটা তা অন্ততঃ বুঝতে পারি। ১৯৯৪ সালে পান্ডুলিপিটি আমি ড. সাজ্জাদ হোসায়েনের কাছ থেকে চেয়ে নিই এবং ফটোকপি করে সেই কপি নিজের জন্য রেখে দিই। এর আগে ১৯৭৫-৯৩ সময়কালে ওটি পড়েছিল লন্ডনে তার (এবং আমারও) একজন বন্ধুর হেফাজতে। কথা ছিল যে বন্ধুটি লন্ডনেই ওই পুস্তকটি প্রকাশ করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বন্ধুটি অকালে ইন্তেকাল করেন। ফলে ওটি লন্ডনে আর প্রকাশিত হবার সুযোগ হয়নি।

www.pathagar.com

আমাদের সৌভাগ্য যে, প্রায় ২০ বছর পর আমরাই কয়েকজন বন্ধু বান্ধব মিলে ওটি প্রকাশ করার কাজে হাত দিই। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ড. হোসায়েনের ইন্তেকালের (১২.১.৯৫) প্রায় দেড় মাস পর ওটি ছাপানোর কাজ শেষ করা সম্ভব হয়। লেখকের জীবিতকালে এটি প্রকাশ পায়নি। তবুও আমাদের এবং এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরম সৌভাগ্য এই যে, বইটি এই দেশেই প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই বইটি পড়ে দেখে আমাদের কাছে তাদের শোকরিয়া জানিয়েছেন। এর ভাষা, তত্ত্ব, তথ্যের বিশ্লেষণ সবই অপূর্ব বলে আমরা অনেকের কাছ থেকে অসংখ্য মোবারকবাদ পেয়েছি। এছাড়াও এই বইটি প্রকাশের পর তার অসংখ্য ভক্তজন তার অপ্রকাশিত আরো অনেক লেখা প্রকাশ করার জন্য আমাদের প্রতি চাপ দিয়ে চলেছেন। এ যাবত আমরা খুব বেশি কিছু করতে পারিনি। তবে বাংলাদেশ ইনিষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট (BIIT) তার বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ইতিমধ্যেই মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেছেন। এগুলো দেশে বিদেশে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের সংস্থাটি সম্প্রতি (১৯৯৯) প্রকাশ করেছে ড. হোসায়েনের স্মৃতির স্মরণে চার শতাধিক পৃষ্ঠার একটি স্মরণিকা গ্রন্থ। তার অনেক গুণগ্রাহী, ছাত্র-ছাত্রী ও ভক্তদের বিভিন্ন মুখী লেখার এক বিশাল সমাহার এটি।

যে The Wastes of Time পুস্তকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে জনাব মামুনের এত ক্ষোভ, বিষোদগার, বিদ্বেষ, ঘৃণা সত্ত্বেও সেই পুস্তকটি আসলে ঐতিহাসিক কিছু নির্জলা কঠোর সত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। পূর্ব পাকিস্তানের পতন বা ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে বাংলাদেশের সৃষ্টির ঘটনাদি মরহুম হোসায়েনকে অনেক পিছনে ফিরে তাকাবার সুযোগ করে দিয়েছিল। পাকিস্তান কায়েমে তাঁর মত যে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংযুক্ত ছিল, অসীম কোরবাণী বা ত্যাগ স্বীকার করেছিল, সেই বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই তার মনে উদয় হয়েছিল। কেননা তিনি পাকিস্তান কায়েমের একজন সক্রিয় সৈনিক ছিলেন। প্রথমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতি মেধাবী ছাত্র হিসাবে এবং পরে একজন কলেজ শিক্ষিক হিসাবে। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই চার বছর পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে ছিল, তখনই তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে লেকচারার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কোন Passive ব্যক্তি হিসাবে নন বরং একজন অতি Active বা সক্রিয় কর্মী হিসাবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

নতুন প্রজন্ম অনেকেরই এখন না জানার কথা, যুবক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান পাস হবার পর পরই ঢাকা কেন্দ্রিক দু'টি সাংস্কৃতিক ফোরামের জন্ম দিয়ে তার দুটিরই আবার সভাপতি হয়েছিলেন। এই দুটির নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান লিটারেরী সোসাইটি' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। সংগঠন দুটির নাম থেকেই বুঝা যায় এই সংগঠন দুটি কি করতে চেয়েছিল। কি করছিল। এর অর্থ অবশ্য এই ছিল না যে, তিনি বর্তমানকালের বা ১৯৭১-এর পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিলেন। তিনি ভালবাসেন পাকিস্তান দর্শনকে, যে পাকিস্তান সৃষ্টিতে বেশী কার্যকরী বা অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন তিনি এবং তদানীন্তন (১৯৪৭-পূর্ব) বাংলাভাষী মুসলমানরা। একই সাথে তিনি কোনসময়েই এদেশে বা তখনকার

www.pathagar.com

'পূর্ববাংলার' প্রতি এতটুকুও উদাসীন ছিলেন না। 'পূর্ববাংলা যে তার জন্মস্থান, সে জন্মস্থানের প্রতি ছিল তার গভীর ভালবাসা।

মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা স্বাভাবিক। এই কারণেই তিনি তার 'একাত্তরের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমি পূর্ব বাংলার সন্তান'। তিনি The Wastes of Time এর Preface-এর শেষে বাক্যটি লিখেছেন এই ভাবেঃ "If history, a hundred years hence, proves any fears and apprehensions about my motherland to have been untrue, nobody will be happier in his grave than myself." ইংরেজীতে লেখা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য বাক্যটির বাংলায় অর্থ এরূপ-"আমার মাতৃভুমি (বাংলাদেশ) নিয়ে আমার এই যে এতসব ভয় এবং আশংকা তা যদি ইতিহাসে একশ' বছর পরেও অসত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তখন কবরে থাকা অবস্থায় আমার চেয়ে বেশী খুশি কেউই হবে না"। পাঠক একটু ধৈর্য্য সহকারে খেয়াল করুন। ইতিহাসের অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজের মাতৃভূমি নিয়ে তার যে ভয় এবং আশঙ্কা সেই ভয় এবং আশঙ্কার কারনেই তিনি তার অবস্থান নিয়েছিলেন। আর সেই ভয়ভীতির কারনে জেলের সেলে বসে নিজের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। এর মধ্যে দেশপ্রেমহীনতার তিলমাত্রও আছে কি? অথচ মামুনের মত ব্যক্তিরা এর মধ্যে দেশপ্রেমহীনতা খুঁজে পেয়েছেন বলে বুঝাতে চান। অন্ধ ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা বোধ করি মানুষকে এমনি গোমরাহ্ করে দেয়।

মামুনরা মরহুম হোসায়েন-এর প্রথম জীবনে প্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষা নাকি তাকে সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণমনা করেছিল বলে বুঝাতে চেয়েছেন। অথচ খাঁটি সত্য এবং বাস্তব বিষয় হচ্ছে এই যে, ড. হোসায়েন ছিলেন একজন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও অতি উদারমনা ব্যক্তি। ১৯৮৪ সালে যখন আমরা দুজন একসাথে লন্ডনে অবস্থান করেছিলাম, তখনও তার কাছে ভারতীয় হিন্দু অধ্যাপক বন্ধুদের আসা যাওয়া করতে দেখেছি। ১৯৪৭-পূর্ব সময়কালে কলকাতার The Statesman পত্রিকার খ্রিষ্টান সম্পাদক Ian Stephens- এর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল Ian এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। মরহুমের ইন্তেকালের স্বল্পকাল আগে একজন হিন্দু ছাত্র-যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে পি.এইচ.ডি করছিল এবং তাঁর Informal Guidance নিচ্ছিল ড. হোসায়েন সম্পর্কে ওই ছাত্রটির এবং ছাত্রটির পিতা অধ্যাপক দিলীপ সেনের বক্তব্য বোধ করি এখানে উল্লেখ করা যায়। ড. সেন তার মেমোরিয়াল ভলিউম (১৯৯৯)-এ মন্তব্য করেন, " তাকে আপাতদৃষ্টিতে বজ্রের মত শক্ত মানুষ বলে মনে হলেও তার হৃদয় ছিল কুসুমের মত কোমল। তার বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি যেটাকে সত্য ও সঠিক বলে উপলব্ধি করতেন, সেটাকে তিনি আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইতেন-বিচ্যুত হতেন না তা থেকে কখনও। অপরদিকে তিনি যেটাকে অসত্য ও সঠিক নয় বলে উপলব্ধি করতেন-তার সঙ্গে তিনি কোনদিনও আপোষ করেননি। তিনি ছিলেন অকুতোভয় পুরুষ।" ড. সেনের এই মূল্যায়ন ছিল দীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের পারস্পরিক জানাশোনার ফল। ড. সেনের স্ত্রী একদিন এক মফস্বল শহরে ড. হোসায়েনকে শাক-শব্জি উত্তম রান্না করে খাইয়েছিলেন ১৯৭০ সালের দিকে এবং যে কারনে তিনি মহিলাকে স্বয়ং অনেক শুকরিয়া জানিয়েছিলেন। আশীর্বাদ করেছিলেন 'সিঁথির সিঁদুর ও হাতের শাখা' অক্ষয় হবার জন্য। তাও বোধ করি মরহুমের উদার ও

www.pathagar.com

অসাম্প্রদায়িক মনেরই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। এসব কিছু আমার কোন কল্পনা নয় ড. সেনের নিজের লেখা মরহুমকে নিয়ে স্মৃতিচারণের বিবরণ থেকে গৃহীত।

মরহুম হোসায়েন-এর জ্ঞান, মেধা, ইতিহাসবোধ তাঁর নিজের বিচরণ ক্ষেত্র ইংরেজী সাহিত্য থেকে কম ছিল বলে ধারণা করার উপায় নেই। তার সেই তীক্ষ্ণ মেধা এবং জ্ঞানের গভীরতার জন্যই তার অনেক শত্রু ছিল। যাকে বলে কিনা Professional Jealousy। তার Encyclopaedic জ্ঞানের পরিধির স্বীকৃতি ছিল দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আর্ন্তজাতিক পর্যায়েও। আর এই কারণেই ষাটের দশকের সূচনা থেকেই Encyclopaedia Britanica এর Pakistan আইটেমটি তাঁকে দিয়েই লিখিয়ে নিতেন ওরা। ১৯৭২-৭৩ সময়কালে যখন তিনি বিনা বিচারে তথাকথিত দালাল আইনে বন্দী ছিলেন, সে সময় বাদে ঐ এনসাইক্লোপেডিয়ার সেই আইটেমটি তিনিই লিখে গেছেন, তার জীবনের প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত। তার বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা অতি পরিস্কার। এবং তা হচ্ছে এই যে তিনি একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান হিসাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদে আজীবন গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামের জাতীয়তাবাদ সার্বজনীন। এই কারনেই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের নিঃস্বার্থ কর্মী ছিলেন। পাকিস্তান কায়েমকে তিনি যথার্থ এবং ন্যায়সঙ্গত কাজ বলে বিশ্বাস করতেন। পাকিস্তান কনসেপ্ট তার অতি প্রিয় ও প্রাণের বিষয় ছিল। একই কারণে পাকিস্তান দেশ ও রাষ্ট্রকে সংরক্ষণ করার জন্য তিনি যতটুকু পেরেছেন, তা করেছেন। না পারলে তা মেনে নিয়েছেন। যেমন মেনে নিয়েছিলেন বাংলাদেশকে। কিন্তু সেই সাথে তার মনে এই ভয়-দ্বন্দ্ব-দ্বিধা-শঙ্কা ছিল যে, বৈদিক ভারত ঘেরা এই ক্ষুদ্র দেশটি তার স্বাধীনতা আদৌ চিরস্থায়ী করে রক্ষা করতে পারবে কিনা।

তার সেই ভয় যে মাঝে মধ্যে বাস্তবরূপে এদেশে দেখা দিয়েই চলেছে, তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? অস্বীকার করতে পারে কেবল তারা-যারা ভারতীয় জাতীয়তার কাছে নিজেদের বিলীন করে দিয়ে তার ভিতর সুখ-শান্তি পেতে উদগ্রীব। একটু খেয়াল করলেই বুঝা যাবে যে, বাংলাদেশের যে ভৌগলিক সীমানা, তা আমরা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম করেই পেয়েছিলাম। সেই ৫২ বছর আগে আমাদের এই দেশ বা অঞ্চল স্বেচ্ছায় এবং গণতান্ত্রিক রায়, রীতি-নীতি অনুসরণ না করে যদি ভিন্ন কিছু করত, তাহলে তখন আমরা পৃথক সত্তা পেতাম না। ভারতীয় জাতীয়তার দর্শনই আমাদের জাতিসত্তার মূল বস্তু হত। ঢাকা কেন্দ্রিক এদেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাও সম্ভব হত না। হত কলকাতা-দিল্লী কেন্দ্রিক ভিন্ন জাতিসত্তা-যা এদেশের সাধারণ মানুষ বরং ঘৃণা করে। মামুনরা কি তা একই ভাবে একই চোখে দেখেন? দেখেন না বলেই মরহুম হোসায়েন-এর মত ব্যক্তিরা তাদের কাছে ঘৃণার পাত্র। এই ঘৃণায় ড. হোসায়েনের মত আমাদের পূর্বসুরীদের কান কিছুই আসে যায় না। কেননা এদেশের প্রায় সব মানুষই পূর্বসূরীদের চিন্তা-চেতনার সাথেই সম্পৃক্ত। আগেও কখনও তারা মামুনদের মত কংগ্রেসী মার্কা দু'চারজন পূর্বসূরীদের সাথে ছিলেন না, এখনো তারা মামুনদের সাথে নেই।

০৮/১০/১৯৯৯ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ। (এই লেখাটি আরও দীর্ঘ ছিল, যা দৈনিক দিনকাল সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশ করে)।

www.pathagar.com

সুরঞ্জিত বাবুদের একজাতিতত্ত্ব বাংলাদেশে অচল

গত ৪ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন যে, 'দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসাই ছিল আমাদের সংবিধানের মূল বিষয়'। সুরঞ্জিত বাবু যেন-তেন একজন ব্যক্তি নন। তিনি একজন এমপি এবং পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি নিজে একজন আইনজীবী এবং আইনবিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশাদি দিয়ে থাকেন। অতএব তার যে কোন আইন ও শাসনতন্ত্র বিষয়ক বক্তব্য ফেলনা কোন বিষয় হতে পারে না। Serious বিষয় হিসাবেই মেনে নেওয়াই সঙ্গত।

সুরঞ্জিত বাবুরা সময়-সুযোগ পেলেই ১৯৪০ দশকের রাজনীতির বিশেষ বিশেষ বিষয়কে গালমন্দ করে থাকেন। তা করুন। এটা তার কথা বলার স্বাধীনতার ব্যবহার। তার এই মৌলিক স্বাধীনতায় আমি বা আমরা কেউই অহেতুক হস্তক্ষেপ করতে চাই না। সে ধান্ধাও নেই। কিন্তু এমন কিছু কথার মারপ্যাঁচে তিনি বা তারা যখন বাংলাদেশের স্বাধীন জাতিসত্তাকে কটাক্ষ করেন এবং অন্যদিকে ভারত উপমহাদেশে 'একজাতিসত্তা'-এর পক্ষে ওকালতি করেন তখন তা কি মেনে নেয়া যায়? দ্বিজাতিতত্ত্বে তিনি সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে পড়েন কিন্তু 'একজাতি' তত্ত্বে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কোন কিছুই খুঁজে পান না, এটা কি আদৌ কোন সুস্থ মনের পরিচায়ক? এটা কি এজন্য যে নিজের মুখের দুর্গন্ধ নিজের কাছে ধরা পড়ে না? অন্যের মুখের দুর্গন্ধ মাত্র নাকে ধরা পড়ে? সেনগুপ্ত বাবু মাত্র বাংলাদেশের ১৯৭২ এর শাসনতন্ত্র নিয়ে কথা বলতে গিয়েই এই মন্তব্য করেছিলেন। তাই সেই শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গ নিয়েই তার সেই মন্তব্যটি বিবেচনা ও আলোচনা করাই জরুরী।

সুরঞ্জিত বাবুদের মত আ'লীগের আরও কেউ কেউ আছেন যারা ১৯৪০ দশকের দ্বিজাতিতত্ত্ব নিয়ে Allergy তে ভোগেন। অথচ অন্য একটি অতি প্রাসঙ্গিক বিষয় বেমালুম ভুলে যান যে, এই তত্ত্বটি সেই সময় অপ্রতিরোধ্য ছিল। তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী বৃটিশ এবং তাদেরই অতি নিকটজনের কংগ্রেসপার্টি ও তাদের ডাকসাইটে নেতাদের কেউই এককভাবে তো দূরের কথা যৌথভাবেও সেই তত্ত্বটির সফল মোকাবিলা করতে পারেন নাই। তাদের এই অপারগতার জন্য যেমন একদিকে মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংগঠন মুসলিমলীগ এর একক সংঘবদ্ধতা কার্যকর ছিল তেমনি অন্যদিকে বা তার চেয়েও বেশী নেতিবাচকভাবে দায়ী ছিল কংগ্রেসীদের 'অখন্ড' ও 'এক' ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মারাত্মক দানবিক চরিত্র। যারা সঠিক ইতিহাস পড়েছেন এবং জেনেশুনে মনে রেখে এখনো বেঁচে আছেন, তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, ১৯৪০-এর দশকে ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের মনে দ্বিজাতিতত্ত্বের চেতনা সৃষ্টি করার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিলেন কংগ্রেস এবং তার নামী-দামী নেতারা। ফলে মুসলমানরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করার জন্য পথ খুঁজছিল।

www.pathagar.com

এ পথের সন্ধানে যখন মুসলমানরা ব্যস্ত-সমস্ত তখনই মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহন করেন জিন্নাহ-যিনি কিনা এক সময় কংগ্রেসের নিবেদিত প্রাণ কর্মী, নেতা এবং সর্বোপরি কংগ্রেসী কোন কোন নেতার দৃষ্টিতে 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত' এই নামে যথার্থই পরিচিত ছিলেন। তিনি তখনও 'একজাতি' তত্ত্বের পক্ষে ছিলেন।

কিন্তু মুলতঃ বঞ্চিত, শোষিত এবং চরমভাবে নিপীড়িত মুসলমানদের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করার পরই কেবল তিনি মুলমানদের পক্ষ থেকে ভীষণ তাগিদ পেয়ে এবং সেই তাগিদে সাড়া দিয়েই মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহন করেছিলেন। তখন মুসলমানদের ন্যুন্যতম মৌলিক স্বার্থরক্ষা করার জন্যই তিনি দ্বিজাতি তত্ত্ব ফর্মুলা দিয়ে আন্দোলনটি এগিয়ে নিয়েছিলেন এবং বাস্তব অবস্থা এই হয়েছিল যে, এই আন্দোলন তখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাড়িঁয়েছিল। এই আন্দোলনেরই বাস্তব ফসল ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানা। এটি যেমন খাঁটি সত্য বিষয়, তাই তা তেমনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের সূচনাতেই। বলা আছে যে 'সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক সীমানাই বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানা।'

অতএব, বুঝা যায় এবং অতি পরিস্কার ভাবেই দেখা যায় যে, ১৯৪০-এর দশকে বা খাস করে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট এখানকার যে সীমানার ভৌগলিক এলাকাটি দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিশেষ একটি এলাকা বা নতুন এক জাতিসত্তার পরিচিতি লাভ করেছিল, তাই বাংলাদেশের বাস্তব ভৌগলিক সীমানা। সেই ১৯৪৭ সালে এই সীমানা নির্ধারিত না হলে এই ভূখন্ডে বাংলাদেশ নামে কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠা কোনভাবেই সম্ভব হত বলে যুক্তিতে আসে না। তবুও যদি সুরঞ্জিতরা ১৯৪৭-এর ভিত্তি ছাড়াই এদেশে কোন স্বাধীন সত্তার কথা বলতে চান এবং তা তাদের নিজেদের যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে পারেন, তা মন্দ হয় না। যেমন তারা বলেন যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মানুষ এদেশ স্বাধীন করেছে। তাই পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তি এখানে অসত্য প্রমাণিত হয়েছে।

এই যুক্তির বিপক্ষে এক ভাল যুক্তি দিয়েছেন ভারতের একজন বিদগ্ধ বাঙালী সাংবাদিক। তার কথাই এখানে তুলে ধরা যাক। তিনি প্রশ্ন করে যুক্তি দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে যদি দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হবে, তাহলে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভৌগলিক সীমানা থাকে কোন যুক্তিতে? তিনি আরো বলেছেন, 'যতদিন বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক ভৌগলিক সীমানা বাস্তবভাবে টিকে থাকবে ততদিন দ্বিজাতিতত্ত্ব খতম হতে পারে না' (দেখুন, বসন্ত চ্যাটার্জীর Inside Bangladesh Today)। তিনি এইসব কথা বলেছেন সেই ১৯৭২ সালেই, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই। এরপর থেকেই সেই সীমানা ঠিকই টিকে আছে। নিশ্চিহ্ন হয় নাই।

এই বাস্তব ভৌগলিক সীমানা নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব এক কাজ হবে বুঝতে পেরেই ১৯৭১-উত্তর ভারতীয় শাসকরা বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে তাদের সেই 'একজাতি' তত্ত্বের দিকে এদেশকে ধাবিত করানোর জন্যই চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি চাপিয়ে দেয়। সেই মূলনীতিগুলো হলো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং

www.pathagar.com

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ। সুরঞ্জিত বাবু যখন 'দ্বিজাতিতত্ত্বের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার' কথা বলছেন, তখন যে তিনি এই চার মূলনীতির কথা বলছেন, তা বুঝতে আমাদের কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু এই বিষয়ে অন্য আরো কিছু প্রশ্ন সামনে না এসে পারে না।

প্রথম প্রশ্ন করতে হয়, ঐ চার মূলনীতির জন্য কি বাংলাদেশের মানুষের ম্যান্ডেট নেয়া হয়েছিল? 'গণতন্ত্র' ছাড়া অন্য আর তিনটি 'মূলনীতি' কি এদেশের মানুষের ওপর অযৌক্তিকভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়নি? সত্তরের নির্বাচন পূর্ব 'ছয়' দফায় ঐ তিনটির নাম-গন্ধ কি কোন কিছু ছিল? ছিল না। তবু কেন, কে বা কারা তা এদেশের শাসনতন্ত্রের মত মৌলিক একটা ডকুমেন্টে সন্নিবেশিত করেছিল? যে জনগণের নামে এই তিনটি 'মূলনীতি' চাপানো হয়েছিল সেই জগণনের নিকট থেকে কি পরবর্তীতে গণভোট করে ম্যান্ডেট নেয়া অতি জরুরী বা লেজিটিমেসীর জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল না? এই লেজিটিমেসী বা বৈধতার জন্য অতি প্রয়োজনীয় কাজটি করা হয় নাই বিধায় এগুলো দেশের শাসনতন্ত্রে ভিত্তিহীন ভাবেই সংযোজিত ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর যদি সকল দলের সমন্বয়ে বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় বসত-যা কিনা যে কোন মুক্তিযুদ্ধের পরপরই হওয়া স্বাভাবিক বা ন্যায়সঙ্গত, তখন যদি তেমন কোন সরকার এসব মূলনীতি গহণ করত তা হয়ত মেনে নেয়া যেত। কিন্তু ১৯৭১-উত্তর বাংলাদেশ সরকার কোন বিপ্লবী সরকার ছিল না। ছিল তারা পাক আমলে পাকিস্তান এলএফও (LFO) এর অধীন নির্বাচিত আ'লীগের একটি দলীয় সরকার।

পাকিস্তান বাংলাদেশকে ১৯৭৪ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের অবস্থান ছিল বৈধতা-অবৈধতায় ঝুলন্ত। তাই তারা যে 'চার মূলনীতি', 'শাসনতন্ত্র' ইত্যাদি যা কিছুই গ্রহন করেছিল তার সবই ছিল বহুলাংশে অবৈধ। বৈধতার যতটুকু ছিল তা ছিল পাক এলএফও'র বলেই। পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়ার পর তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই তিন মূলনীতি-ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ নিয়ে তাদের বৈধতার শূন্যতা রয়েই গিয়েছিল। এই তিন অবৈধতার বৈধতা আসে ১৯৭৫-উত্তর সময়কালে ঐ বছরের ১৫ই আগেষ্টর সফল সামরিক অভ্যুত্থানের পর।

১৯৭১ সালে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ শেষ হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী এই স্বাধীন দেশে বসিয়ে দেয় ওদেরই এক দাসানুদাস সরকার। এই দাসানুদাসদের ওপর যেমন তারা চাপিয়ে দিয়েছিল ২৫ সালা গোলামি চুক্তি, তেমনি দিল্লীই চাপিয়ে দিয়েছিল সেই চারটি মূলনীতির বিশেষ করে উল্লিখিত শাসনতন্ত্রের তিনটি তথাকথিত 'মূলনীতি'। ১৯৭৫ সালের সফল অভুত্থানের পথ ধরেই ঐ তিনটি নীতির পরিবর্তন আনা হয়। বলাবাহুল্য যে যারা এসব পরিবর্তন করেছিল এবং এনেছিল তারাই ছিল খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা। এরা এ ধরনের যেসব পরিবর্তন করেছে তা জাতি সানন্দে গ্রহন করেছে। কেননা, জাতির মূল আশা-আকাঙ্খা, বিশ্বাস, চেতনা ইত্যাদির সঠিক প্রতিফলন ছিল এই সব পরিবর্তনে। তাই ইতিহাসে মুজিব হয়েছেন ধিকৃত এবং জিয়াউর রহমান নন্দিত। মুজিবের

www.pathagar.com

দুঃখজনক ও মর্মান্তিক পতনে কেউই টু-শব্দটি করে অফসোস করেন নাই। অন্যদিকে শহীদ জিয়াউর রহমানের জানাযায় নজিরবিহীন ২০/২৫ লাখ মানুষের ঐতিহাসিক সমাবেশ এক মহান ইতিহাস হয়েই আছে।

শাসনতন্ত্রের সূচনাতে তাই শহীদ জিয়া যে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন করেছেন অন্য সেই তিন নীতি পরিবর্তন করার পূর্বশর্ত হিসাবে, তা বর্তমানকালের আ'লীগ সরকার শত চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত পরিবর্তন করতে পারে নাই। কেননা, এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্রিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হতে রাজী হয় নাই। তা করলে এত দিনে এই সরকারের পতন মুজিবের মতই ইতিমধ্যে অবশ্যম্ভাবী ছিল। তবে সুরঞ্জিতসহ অনেকেই যে সেই পরিত্যক্ত তিন নীতি পুনঃ শাসনতন্ত্রে সংযোজন করতে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তা আমরা অনেকেই জানি। সুরঞ্জিত বাবু তার ৪ঠা নভেম্বরের উল্লিখিত মন্তব্যে যে সেই দিকই নির্দেশ করেছেন তা বুঝতে বোধকরি কারো কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। এদেশের মানুষকে মিষ্টি কথার মারপ্যাঁচ দ্বারা আর যাই হোক এক জাতিতত্ত্বের দিকে আর কোনোভাবেই টেনে নেয়া যাবে না। বর্ডারের ওপারে সুরঞ্জিতদের পেয়ারের দেশে এখন খৃষ্টানদের যেভাবে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তা কি এদেশের মানুষের জানতে বাকী আছে?

০৪/১২/১৯৯৯ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

মুজিব আমলে মানুষের কথা বলার অধিকার ছিল না, হাসিনার আমলেও নেই

শেখ হাসিনার চরম মিথ্যাচারের ফিরিস্তি রাখা খুবই কঠিন। কেননা, প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত জনগণের ক্যাপটিভ মিডিয়ার সর্বাত্মক অপব্যবহার করে ওরা যে হারে, যে গতিতে, যেভাবে মিথ্যাচার করে চলেছে তার সবকিছুর ট্র্যাক রাখা এক বিশাল কঠিন কাজ বটে। অনেকেই প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকতে অনুনয়-বিনয় করছেন। আর কেউ কেউ বা তাকে সত্য কথা বলতে 'উপদেশ' দিয়েই চলেছেন। কিন্তু ওই যে কথায় আছে না, 'চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী'। কিংবা কোরআনের ভাষায় বলা যায়, 'ওরা চোখে দেখেও দেখে না, কানে শুনেও শুনে না, মন দিয়ে বুঝে না, ওদের মন যে আঁধারে ছেয়ে আছে।' তাই ওই চোরদের ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে কোন লাভ নেই, আমরা জানি। সে কারনে আমি এই নিবন্ধ লিখছিও না। লিখছি এই কারনে যে দেশের সহজ সরল মানুষ যে ওদের মিথ্যাচারের অসহায় শিকার হচ্ছে, বিভ্রান্ত হচ্ছে, মিথ্যার পথে চালিত হচ্ছে, সত্যকে ধরে রাখতে পারছে না কোন কোন ক্ষেত্রে, তাই আমার এই কোশেশ।

১৪ই ডিসেম্বরের বিটিভিতে কয়েকটি বাংলাভাষার শব্দ কানে এল, 'একুশ বছর মানুষ মুখ খুলে কথা বলতে পারে নাই-জাতির জনককে হত্যা করে মানুষের কথা বলা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল ওই একুশ বছর'। সত্যি কি তাই?

১৯৯৬ সালে দেশের ক্ষমতায় বসার পরই শেখেরা এই 'একুশ বছর' শব্দ সমষ্টি (দুটি) যথেচ্ছ ব্যবহার করা শুরু করেছেন। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট থেকে ১৯৯৬-এর ২৩ জুন পর্যন্ত এই একুশ বছর সময়কালের কথাই ওরা মিন করে। এই দুই দশক কাল ওরা এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে ছিল কিনা, তাই। এই সময়কাল তাই তাদের কাছে দুঃখজনক হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারা ক্ষমতায় ছিল না বলে দেশের মানুষ মন খুলে কথা বলতে পারেনি এই বক্তব্য কি আদৌ সঠিক? এই একুশ বছর যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসেছিলেন, তারা কি সত্যি সত্যিই মানুষকে কথা বলতে দেননি। নাকি ১৯৭২-৭৫ এর সাড়ে তিন বছর সময়কালে শেখ হাসিনার বাবা শেখ মুজিব এবং তার রাজনৈতিক দল আ'লীগ ও বাকশাল যে মানুষকে মন খুলে কথা বলতে দেয়নি সেটাই আসল সত্য কথা?

নতুন প্রজন্ম ১৯৭২-৭৫এর বিভীষিকার প্রায় কোনো কিছুই জানে না। মুজিব ও আ'লীগের ফ্যাসিজম-এর খবর প্রায় কিছুই জানে না। আর সেই জ্ঞানশূণ্যতারই সুযোগ নিচ্ছেন শেখ হাসিনা পঁচিশ বছর পর। মুজিবের শাসনকালে ফ্যাসিজম এর বিবরণ দিতে গিয়ে দেশের প্রখ্যাত অধ্যাপক-লেখক-বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন ওমর লিখেছিলেন-'পাকিস্তান আমলে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করলে আমরা ধরে নিতাম যে সেই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিটি জেলে আটক আছেন এবং জীবিত সুস্থ আছেন, আর মুজিব

www.pathagar.com

আমলে (১৯৭২-৭৫) কাউকে সরকারী বাহিনী (পুলিশ বা রক্ষীবাহিনী) গ্রেফতার করলে আমরা কোনভাবেই নিশ্চিত হতে পারি না যে সেই ব্যক্তিটি (বা ব্যক্তি সমষ্টি) আদৌ প্রাণে বেঁচে আছেন কি না'।

বদরুদ্দীন ওমরের এই বক্তব্য ছোট করে দেখার কোন অবকাশ ছিল না, কেননা, তিনি যখন এই কথা বলছেন, তখন তিনি একজন যেমন-তেমন সাধারণ মানুষ ছিলেন না বরং সব মহলে স্বীকৃত একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। সেই সময়কালে ('৭২-৭৫) যারা আন্ডার গ্রাউন্ডে অবস্থান করে সত্য কথা বলে চলেছিলেন মুজিবের ফ্যাসিজম-এর প্রতিবাদ করে চলেছিলেন, তাদের নগন্য সংখ্যকদের একজন তিনি। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসের একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। দেশের প্রখ্যাত আইনজীবী, পার্লামেন্টারিয়ান ডঃ আলীম-আল-রাজীর সাথে কথা হচ্ছিল-সেইদিন যেদিন শেখ মুজিবের অতি পেয়ারের ক্যাডাররা সাতটি তাজা প্রাণের ছাত্র যুবককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হলের সামনে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলে রেখেছিল। তখন মরহুম রাজী সাহেব বলেছিলেন, 'এ দেশে কি সত্য কথা বলার কোন পরিবেশ আছে? বললে তো ওই সাত লাশের মত লাশ হতে হবে।'

এসব বা ঐ ধরনের শ্বেত সন্ত্রাসের সাথে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের একজন বড় হোতা ছিল শেখ সাহেবের এক বোনের ছেলে বা আপন ভাগিনা তার ডান হাত বলে পরিচিত শেখ ফজলুল হক মনি। মনি মামুর আশীর্বাদ ধন্য হয়ে রাস্তার একজন হ্যাভনটের অবস্থা থেকে উন্নীত হয়েছিলেন একজন উঠতি পুঁজিপতিতে। তারপর হয়েছিলেন দুটি দৈনিক পত্রিকার মালিক। তার নিজের বাংলা দৈনিকীতে তিনি সকল লজ্জা-শরম ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাথা খেয়ে সম্পাদকীয় বক্তব্যে লিখেছিলেন, 'আমরা আইনের শাসন চাই না, আমরা চাই মুজিবের ব্যক্তি শাসন'। এই মন্তব্য থেকে বোধ করি সহজে এবং স্পষ্টভাবে আন্দাজ করা যায় যে, ১৯৭২-৭৫ সময়কালে কার কতটুকু কথা বলার অধিকার ছিল।

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার ছিল? ছিল না যে তার প্রমাণ তো মুজিবই দিয়েছিলেন, যখন ১৯৭৫-এর জুন মাসে মাত্র ৪টি দৈনিক পত্রিকা তার সরকারের খোদ নিয়ন্ত্রণে রেখে দেশের কয়েকডজন দৈনিকসহ অসংখ্য সাপ্তাহিক ইত্যাদি পত্রিকা বন্ধ করে দেন বাকশালী-এক দলীয় ডিকটেটর শেখ মুজিব নিজেই। এই ডিকটেটরশিপের ফলে মানুষের কতটুকু স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার ছিল তা কি আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন আছে? এতো গেল মুজিবের শাসন আমলের শেষের দিকের কথা।

মুজিবের শাসন আমলের শুরুর অবস্থাই বা কেমন ছিল? বর্তমানকালের বাংলাদেশের অবজারভার পত্রিকার নামটি হয়তো অনেকেই জানেন। এটি ছিল ১৯৭২ পূর্ব সময়কালের পাকিস্তান অবজারভার। এর সম্পাদক ছিলেন (মরহুম) আবদুস সালাম। সাংবাদিকতায় তাঁর সমকক্ষ তখন আর কেউ ছিলেন না। এই অতি সম্মানিত ও বিদগ্ধ মানুষটিকে সত্য কথা বলার জন্য কি মারাত্মকভাবে অপমান করে সেই পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তা এখনকার প্রজন্ম না জানলেও আমরা পুরাতন মানুষ যারা এখনো বেঁচে আছি তারা ভালভাবেই জানি। আমরা আরো জানি যে,

www.pathagar.com

এই অবজারভার পত্রিকা এবং সালাম সাহেব মুজিবকে নেতা বানানোর জন্য এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য কতই না অবদান রেখেছিলেন। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে মরহুম মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর 'হককথা', 'সত্যকথা' ইত্যাদি প্রকাশনা এবং সাময়িকীর বিরুদ্ধে মুজিবশাহী ও খোদ মুজিবের ক্রুসেডের বিষয় আমরা এখনো ভুলে যায়নি। অথচ সবার জানা কথা এই যে, সেই মাওলানা ভাসানীই শেখ মুজিবকে আস্তাকুঁড় থেকে তুলে এনে রাজনীতিক বানিয়েছেন। নিজের সন্তানের মত প্রতিপালন করেছিলেন শেখ মুজিবকে। মাওলানা ছিলেন আজীবন সহজ-সরল অসাম্প্রদায়িক একজন নির্লোভ ব্যক্তি। সাধারণ মানুষের মঙ্গলই ছিল তার একমাত্র কাম্য এবং লক্ষ্য। সেই মাওলানাকে মুজিব ১৯৭২-৭৫ সময়কালে 'সাম্প্রদায়িক' বলে আখ্যায়িত করে তার যত সব প্রকাশনা একটার পর একটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁকে চিরস্থায়ী গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন-১৯৭৫-এর আগষ্টে তাঁর মর্মান্তিক পতনের আগ পর্যন্ত।

আরো সত্য বা খাঁটি কথা হচ্ছে এই যে, মানুষের কথা বলার অধিকার সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পর পরই। যেমন, আবার বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থারও পুনঃ প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিল সেই '৭৫-এর ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবের পর পরই। এবং সেই থেকে একুশ বছরই বরং সেই কথা বলার সুযোগের বিস্তৃতি হয়েছে ব্যাপক। সেই সুযোগেই শেখ হাসিনা যেমন ক্ষমতা পেয়েছেন, তেমনি কথা বলতেও পারছেন।

নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই গণতন্ত্রের পূবশর্ত হচ্ছে সবার অর্থ্যাৎ সরকার এবং বিরোধীপক্ষ উভয়ের কথা বলার সমান স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। এই মৌলিক স্বাধীনতা যেমন ছিল না ১৯৭২-৭৫ সময় কালে মুজিবের ফ্যাসিস্ট শাসনকালে, তেমনি মারাত্মকভাবে সীমিত হয়েছে শেখ হাসিনার আমলেও। কেননা, মতামত প্রকাশের বাহন যেসব পত্র-পত্রিকা, তার মধ্যে সীমিত যে কয়টি হাসিনা সরকারের বিরোধী শিবিরের বলে পরিচিত, তাদের লাইফ লাইন এই সরকার বন্ধ করে দিয়েছে-সরকারী-আধাসরকারী ইত্যাদি বিজ্ঞাপন এবং সেই খাতের রেভিনিউ বন্ধ করে দিয়ে। জনগণের খাত থেকে রেভিনিউ বন্ধ হবার কারণে ইতিমধ্যেই মিল্লাত, শক্তি ইত্যাদি দৈনিকসহ আরো অনেক সরকার বিরোধী সাময়িকী বন্ধ হয়ে গেছে। এর সাথে এসেছে Evidence নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকীটির ডিকলারেশন বাতিল। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রীয় এবং সরকারী মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী হামলা করেও যখন ওই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করা যায়নি, তখনই শেখ হাসিনার নিয়ন্ত্রনাধীন তথ্য মন্ত্রনালয় ওটির ডিকলারেশন বাতিল করেন এইতো মাত্র ক'দিন আগে।

অতএব, মানুষের অর্থ্যাৎ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কথা বলার অধিকার যদি কেউ হরণ করে থাকেন তা করেছেন এবং করে চলেছেন শেখ মুজিব এবং তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা, অন্য কেউ তাদের তুল্য নন।

২০/১২/১৯৯৯ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

'মৃত্যু'-'কবর' এবং বাস্তবতা নিয়ে কথা

নতুন কথা নয়। তবুও নতুন করে বলা হচ্ছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের 'কবর' হয়েছে। ঐ তত্ত্বের নাকি কবর হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের বাস্তবতা নাকি দ্বিজতিতত্ত্বের কবর রচনার ভিন্ন নাম। এই দাবী যেমন বলছিলাম পুরাতন কথাই নতুন কোন কথা নয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যখন ঢাকায় পাক বাহিনীর নিয়াজি অরোরার কাছে আত্মসর্মপণ করে তার পরপরই তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঐ একই কথা বলে উল্লাস করেছিলেন। মাঠে-ঘাটে বা বাজারে রাস্তায় নয় বরং খোদ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সংসদে। সংসদ সদস্যপূর্ণ লোকসভায় বিপুল উত্তেজনা ও করতালির ভেতর দিয়ে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারনেই ছিল সেই ঘোষণা-দ্বিজাতিতত্ত্বের মৃত্যু এবং সে বিজয়ী ঘোষণার জন্য ছিল সকল সদস্যদের উল্লাস প্রকাশের করতালি। তাই বলছিলাম কি না দ্বিজাতিতত্ত্বের 'মৃত্যু' ঘোষনা কিংবা কবর রচনা পুরাতন কথাই, কোন নতুন কথা নয়। প্রায় ২৯ বছর আগেরই এক পুরাতন কথা এখন আবার নতুন করে বলা হচ্ছে এই যা। অথচ একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে ইন্দিরার সেই ঘোষণা ছিল পলিটিক্যাল ব্যান্ডওয়াগন (Bandwagon)। মানুষকে চমক লাগিয়ে দিয়ে হতচকিত করার জন্য। কেননা, পূর্ব পাকিস্তান ভুখন্ডে পাকিস্তানের 'মৃত্যু' হলেও দ্বিজাতিতত্ত্বের মৃত্যু হয়নি। দ্বিজাতিতত্ত্বের পূর্ব পাকিস্তান ভুখন্ড নাম ও রাষ্ট্রীয় পরিচয় পবিবর্তন করে হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখন্ডেও দ্বিজাতিতত্ত্ব টিকে ছিল। তাহলে দ্বিজাতিতত্ত্বের 'মৃত্যু' হল কিভাবে? 'কবর'ই বা হল কার? তাই বলা যায় যে, ইন্দিরার সেই ব্যান্ডওয়াগনই যে এখন আবার নতুন চমক সৃষ্টির জন্য বাতাসে ছাড়া হচ্ছে তা বোধ করি বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

সন্দেহ নেই যে সাতচল্লিশের দ্বিজাতিতত্ত্বের ফসল আজকের বাংলাদেশ। সাতচল্লিশে দ্বিজাতিতত্ত্বের পাশাপাশি ছিল একজাতিতত্ত্বও। তখন এ দেশের মানুষ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একজাতিতত্ত্ব খারিজ করে দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। তারা একাত্তরে দ্বিজাতিতত্ত্ব খারিজ করে একজাতিতত্ত্ব গ্রহণ করেনি। তাই বাংলাদেশীরা যেমন সাতচল্লিশে একভারতীয় হয়নি, হয়েছিল পাকিস্তানী তেমনি একাত্তরে তারা ভারতীয় ও পাকিস্তানী এই দুই রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা পরিত্যাগ করে হয়েছে বাংলাদেশী। তবে ভূখন্ডটি হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক পূর্ব বাংলাব পূর্ব পাকিস্তান বটে। আর অন্য খাঁটি কথা হচ্ছে এই যে, সাতচল্লিশে পূর্ব পাকিস্তান না হলে আমরা থাকতাম বৃহত্তর বঙ্গ প্রদেশ এবং ভারতের একটি প্রদেশ মাত্র। ঢাকায় নয় কলকাতায় থাকত এদেশের রাজধানী।

১৯৭১-এর পর এই উপমহাদেশে আমরা ভারতীয় এবং পাকিস্তানী ছাড়াও তৃতীয় আর এক নামে হয়েছি বাংলাদেশী। এই বাংলাদেশের ঐতিহ্য কি? স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যই বা কি? পরিচিতির ভিত্তিই বা কি? মূল্যবোধই বা কোনটি?

www.pathagar.com

১৯৭১ এর পর যে দল আ'লীগ দেশের ক্ষমতায় বসল তারা তখন ঘোষণা করল যে আমরা 'বাঙালী'। দেশের যে সংবিধান তারা রচনা করল, তাতে তারা চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করল। সেই চারটি মূলনীতিতে দেশের মানুষের চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের কতটুকু সঠিক প্রতিফলন ছিল নাকি তা মানুষের চেতনা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিপন্থী ছিল। তা বুঝতে মানুষের একটু সময় লাগলেও বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। আর তাই সাড়ে তিন বছরের মাথায় যখন আ'লীগ-বাকশাল শাহী মুজিবের পতন হল, তখন একটি প্রানীকেও প্রকাশ্যে আফসোস করতে দেখা যায়নি। না দেশে না বিদেশে কোথাও। ১৫ই আগষ্ট '৭৫ মুজিবের পতনের পর মুক্ত বিশ্বের নামী-দামী পত্র-পত্রিকাগুলো বিশেষ করে ১৭ই আগষ্টের ('৭৫) সংখ্যায় প্রায় একবাক্যেই মুজিব সরকারের জন্য করুণা করে তাদের মন্তব্যে বলেছিলেন যে, মুজিব তার বিশেষ পলিসি দিয়ে দেশের মানুষের বিশ্বাসে যেভাবে আঘাত করেছিলেন তা মানুষ ঘৃণা করেছে, মুসলমানরা মেনে নেয়নি। তাই পরবর্তী প্রতিটি সরকারকে স্বাভাবিক কারনেই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, চেতনা এবং মূল্যবোধের সমীহ করতে হয়েছে। শাসনতন্ত্রে বিসমিল্লাহ সংযোজন করতে হয়েছে। মৌলিক নীতিতে আল্লাহর উপর আস্থা ও গভীর বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম স্বীকার করে নিতে হয়েছে। এ ধরনের সংযোজনের পিছনে রাজনৈতিক কারনের কথা যদি মেনে নিতে হয, তবুও তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রাণের বিশ্বাসের কাছাকাছি যে ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর সাথে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং সাতচল্লিশের চেতনার মিল দেখা যায় এবং এসব সংযোজন যারা শাসনতন্ত্রে করেছেন তারা একাত্তরেরই সৈনিক বটে।

পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহনশীলতার অর্থে যদি কেউ ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন, তা ইসলাম এবং মুসলমানরা গ্রহন করে। কিন্তু আ'লীগ সরকার কি সেই ৭২-৭৫ বা ১৯৯৬ থেকে এই পর্যন্ত সময়কলের ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যা কিছু করেছে তা কি আদৌ সহনশীলতার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল বা আছে? বস্তুতঃ এরা এই অজুহাতে যা করেছেন বা করছেন তা হচ্ছে মুসলমান ঐতিহ্যের মূলোৎপাটন, ইসলামী নাম-নিশানার বিতাড়ন, এমনকি কোরআনের আয়াতকে পর্যন্ত নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া। তা না হলে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের 'মুসলিম' শব্দ মুছে ফেলা হয় কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে পাক কালাম কোরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনী ইলমা' তুলে দেওয়া হয় কেন? সরকারী শিক্ষা কমিশনের (খুদা কমিশন) সুপারিশে ইসলাম শিক্ষা আবশ্যকীয় থেকে ঐচ্ছিক করার বিষয় সুপারিশ করা হয় কেন? অথচ ঐ একই আ'লীগ সরকার Holy Cross School/College এর গায়ে পরিবর্তনের জন্য হাত দেয়া থেকে বিরত থাকে কেন? সাহস পায় নাই কেন খৃষ্টানদের Notredame কলেজের নাম এতটুকুও নড়চড় করতে? এই কি ধর্মনিরপেক্ষতা-নাকি ইসলামী নিশানা বিতাড়ন এবং মুসলিম ঐতিহ্যের মুল্যোৎপাটন? ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে কই Aligarh Muslim University, জামিয়া মিল্লিয়া, বেনারস হিন্দু ইউনির্ভাসিটির নাম সেই যে প্রায় দেড়শ বছর আগে ব্রিটিশ আমলে দেয়া হয়েছিল তাতো আজ অবধি স্বাধীন

www.pathagar.com

ভারতে বদলানো হয় নাই। তাই আ'লীগ সরকার এই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যা করছে তা ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়-বরং ইসলাম বিতাড়ন। মুসলিম ঐতিহ্যের মূলোৎপাটন ও বিনাস সাধন। এবং সেই সাথে দিল্লীর ফরমুলায় ভারতীয়করণ যতসব প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে পাকিস্তান আর্মি পরাজিত হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সরকারও পরাজিত হয়েছে ১৯৭১ সালে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ভুখন্ড এবং তার স্রষ্টা মানুষগুলোর পরবর্তী বংশধররা বহাল তবিয়তে এদেশে বাস করছে। স্মরণ করা জরুরী যে এই অঞ্চলের মানুষের ভোটের এবং সর্বাত্মক সমর্থনের জন্যই সাতচল্লিশে দ্বিজাতিতত্ত্বকে বিজয়ী করা সহজ হয়েছিল। তারা এমন দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট দিয়েছিল তা কি অহেতুক ছিল? অহেতুক যে ছিল না তার সাক্ষী ইতিহাস। সেই ইতিহাস হলো এই যে এদেশের সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে নিপীড়িত মুসলমান কৃষক শ্রমিক মজুরকুল-যাদের নাম পরিচয় কোন কোন বিখ্যাত ইতিহাসবিদরা দিয়েছিলেন Hewers of wood and drawers of water 'কাঠুরে আর ভিস্তিওয়ালার জাত'। এর একটি পরিচয় অতি দরিদ্র নীপিড়িত মানুষের শ্রেনী বিশেষ। সাতচল্লিশের পর সেই অবস্থার তাদের কতটুকু উন্নততর পরিবর্তন হয়েছিল সে আর এক ইতিহাস। তবে সংক্ষেপে কথা হচ্ছে এই, যে স্বপ্ন দেখে তারা সাতচল্লিশে সেই এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তা পূরণ না হওয়ার ব্যাথার কারনে আবার তাদেরই পরবর্তী বংশধররা একাত্তরের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এবং জয়লাভও করেছিল নয়মাসের সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। এই ছিল বাংলাদেশীদের লাভের দিক। আমরাই কি সব লাভ করেছিলাম? ভারত কি কোন লাভ করে নাই? এই লাভের বিষয় নিয়ে সেই ১৯৭২-৭৩ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক রাজনীতিবিদ প্রাণ চোপরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে একাত্তর ছিল ওদের জন্য 'দ্বিতীয় আজাদী'। বাংলাদেশ ফ্রন্ট থেকে ভারত পুরাপুরি হুমকি মুক্ত, তাই একাত্তরের যুদ্ধ হয়েছে। ওদেরই অন্য আর একজন ঝানু বাঙালী বুদ্ধিজীবী বসন্ত চ্যাটার্জী একাত্তরকে একটু ভিন্নভাবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশে কোন বাঙালী ভদ্রলোক নেই। আছে (বাংলাভাষী) মুসলমান। তিনি আরো যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে দ্বিজাতিতত্ত্ব বহাল তবিয়তে আছে। কেননা, তার দৃষ্টিতে, যদি বাংলাদেশের দ্বিজাতিতত্ত্ব-এর মৃত্যু হত, তাহলে যেমন সেখানে মুসলমান থাকত না, সবাই হত বাঙালী ভদ্রলোক, তেমনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যেমনি সাতচল্লিশে আন্তর্জাতিক ভৌগলিক সীমারেখা টানা হয়েছিল তাও একাত্তরের পর থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। যেহেতু, এই সীমানা অটুট আছে, তাই দ্বিজাতিতত্ত্বও বহাল আছে। তার এই সব যুক্তি আমরা কেউ মেনে নেই আর না নেই কিন্তু এই সব যে ফেলনা নয় তা বোধ করি বলা যায় নিঃসন্দেহে। তাছাড়া বোধ করি উল্লেখ করা যায় ভারতেরই কোন কোন সিনিয়র রাজনীতিকদের একাত্তর উত্তর বাংলাদেশ নিয়ে বক্তব্যাদি, যেমন সাতচল্লিশে নেহেরুর জেদের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল এক পাকিস্তান, আর একাত্তরে নেহেরুর মেয়ে ইন্দিরার জেদের জন্য তৈরী হল দুই পাকিস্তান। প্রায় একই কথার যেন প্রতিধ্বনি করলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের ১০ই

www.pathagar.com

জানুয়ারী বাংলাদেশের মাটিতে পা দেয়ার পর তার প্রথম ভাষনে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে যৌক্তিক এবং সঙ্গতভাবেই তিনি লেবেল এঁটে দিলেন। এরপর তিনি ক্ষমতায় বসে সেই মুসলিম চরিত্র রক্ষার জন্য কতটুকু কি করতে পেরেছিলেন নাকি অগত্যার ঢেঁকি গিলেছিলেন সে আর এক ভিন্ন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পরাজয়ের পথ বেয়েই এসেছিল তার পতন তাও আর এক ভিন্ন ইতিহাস। মুজিবের পরাজয় এবং পতন হলে পর দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষার বিরুদ্ধে কর্মকান্ড চললেও সেই স্বাভাবিক চেতনার পথ রুদ্ধ হয় নাই। বিসমিল্লাহ, আল্লাহর উপর আস্থা, রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম ১৯৯৬ সালে শেখ মুজিব কন্যা এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসার পর সাড়ে তিনটি বছর অনেক কোশেশ করে এই স্বাতন্ত্র্যের বিষয় কয়টি এখন পর্যন্ত বদলিয়ে ফেলতে পারেন নাই- করতে গেলে যে চরম ও চূড়ান্ত প্রতিরোধ দেশের অন্ততঃ শতকরা ৮৫/৯০ ভাগ মানুষ করবেই করবে তা আঁচ করতে পেরেই শেখ হাসিনা সেই পথে এখন পর্যন্ত পা বাড়াতে সাহস পাননি। এই সব বিষয় হুবহু দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল বিষয়; কিন্তু সাতচল্লিশের একজাতিতত্ত্বের যে সহায়ক বিষয় নয় তা বোধ করি বিস্তারিত বলা নিস্প্রয়োজন। একাত্তরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভারতের বিশাল ত্যাগ যেমন সত্য তেমনি বোধ করি আরো সত্য হচ্ছে এই যে সর্বভারতীয় যে মূল্যবোধ তারা জাতি হিসাবে বিশ্বাস করে সেই মূল্যবোধই বাংলাদেশেও চাপিয়ে দিয়ে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা। সর্বভারতীয় মূল্যবোধের বেশকিছু ভাল দিক আছে সন্দেহ নেই কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সেই মূল্যবোধের সাথে অতীতে কোনদিন একাত্ম হতে পারেনি। কেননা তা করলে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে নিশ্চিহ্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। কেননা, এই প্রক্রিয়ায় ইউরোপের অনেক মুসলিম জাতিই যেমন ধ্বংস হয়েছে তেমনি সেই ধ্বংস প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে তাদের কেউ কেউ আবার রুখেও দাড়িয়েছে। চেচনিয়ার স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদ যে বর্তমান সময়কালে মরণপণ যুদ্ধ করছে মহাশক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে তা কি তাদের মুসলিম স্বাতন্ত্র্য রক্ষার এক পবিত্র যুদ্ধ বা জেহাদ নয়? কাশ্মীরীরা যে যুদ্ধ করছে বিগত ৫২-৫৩ বছরব্যাপী সেই যুদ্ধই বা কেন? ভারতে একাকার হয়ে সেই বৃহৎ রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকলে কি ক্ষতি হতো কাশ্মীরীদের? কেনইবা এত রক্তক্ষয় করছে তারা। কেন লাখে লাখে প্রাণ দিচ্ছে ওরা ভারতের মোকাবিলায় চলতি অসম যুদ্ধে? স্পেনের মুসলিম সভ্যতা, আলবেনিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল জনগোষ্ঠী কেমন করে যথাক্রমে খৃস্টান এবং মার্কসবাদীদের কাছে মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তা কি আমরা সবাই ভুলে গেছি? ভুলে গেলে কোন সর্বনাশ হবে না! যে কোন জাতির সফল ভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অন্ততঃ দু'টি বিষয়। একটি নিজস্ব মূল্যবোধ ভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তি আর অন্যটি হচ্ছে সাধারণ মানুষ কর্তৃক সেই নিজস্বমূল্যবোধের অনুশীলন এবং তা থেকে প্রেরণা লাভ। ইউরোপের সভ্যতা আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ মনে হলেও তাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে খৃষ্টান মূল্যবোধ। কমিউনিষ্ট দেশ কটির মূল্যবোধ হচ্ছে মার্কসবাদীতায় বিশ্বাস। ভারতের মূল্যবোধের ভিত্তি হচেছ বেদ পুরানের মৌলিক শিক্ষা। বিজেপি-এর ভাষায় তা হচ্ছে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উদযাপনের মত খৃষ্টান কালচারে মেয়েরা যেন পুরুষ মানুষের সাথে একসাথে মেলামেশা করতে না পারে তা তারা বা অন্ততঃ তিনি নিশ্চিত করতে চান। এটি তাদের সরকারী পলিসি কিনা তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও তার সেই বক্তব্য সংসদের আ'লীগ দলীয় কোন সদস্যই টু শব্দটি করে প্রতিবাদ করেন নাই (বিরোধী দলীয়রা ছিলেন অনুপস্থিত), তা তাৎপর্যপূর্ণ না হয়ে পারে না। আর তা যদি হয় তাহলে আ'লীগের নিজস্ব দল বা তাদের পরিচালিত সরকারের সংস্কৃতির রূপ রেখাটি আসলে কি? এমপি সাহেব শুধু যদি বাঙালী সংস্কৃতির কথা বলতেন, 'মুসলমানী' মূল্যবোধের বিষয় উল্লেখ না করতেন যা তারা অহরহই করে থাকেন, তাহলে বোধ করি এখানে কোন কিছু বলার থাকত না। আমিও হয়ত এই লেখার কোন প্রয়োজন অনুভব করতাম না। কিন্তু ওরা হঠাৎ করেই যখন বাঁধনকে নিয়ে মুসলমানিত্বের প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসলেন তখন বোধ করি বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছু আলোচনার অবকাশ এসে গেল। একই সাথে যদি আবার সেই ধর্ষণ সেঞ্চুরীর বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হয়, তখন কি বিষয়টি আরো ঘোলাটে মনে হয় না। কেননা, ঐ ছাত্র নেতাটি এই সরকারী দলেরই ক্যাডার। আর সেই হিসাবে শেখ হাসিনার অতি আপনজনও বটে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের চাপের কারনে 'বহিস্কার' করেছিল সত্য বটে, তবে এই বহিষ্কারাদেশ যে লোক দেখানো ছিল তা পরিস্কার হলো তখন, যখন সেই বহিস্কারকৃত ছাত্রলীগের কলঙ্কটিকে বিনা বাধায় ফাইনাল পরীক্ষা দিতে দিল সেই ক্ষমতার কারনেই। এখন হয়ত তাকে পাসও কারানো হবে-ভাল ডিভিশনও হয়ত তাকে দিবেন ওরা-পরে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমাও জুটে যাবে সময়মত। উন্নত কোন দেশে কি এমন কোন ছাত্রের ভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ডিপ্লোমা জুটত? আমার জানামতে কোনভাবেই নয়। কেননা এসব দেশে ডিগ্রী ডিপ্লোমা পেতে হলে, শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভাল গ্রেড পেলেই চলে না, তাদের নিজস্ব মূল্যবোধের মাপকাঠিতে একজন ভাল মানুষও হতে হয়। কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে যদি কোন শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনরূপ বিরুদ্ধ রিপোর্ট থাকে, তাহলে তার ভাগ্যে এসব খৃস্টান মূল্যবোধের দেশে কোনরূপ ডিগ্রী ডিপ্লোমা জুটে না-সে ছাত্র ছাত্রী যতই মেধাবী হোক না কেন-যত ভাল নম্বর বা গ্রেডই পাক না কেন। অবশ্য এসব দেশে এখন প্রকাশ্য যৌনতা সামাজিক ভাবে কোন অন্যায় কাজ নয় যতক্ষণ তা দুজন এডাল্ট (Adult) মানুষের মধ্যে সম্পর্কের বিষয় হয়। তাদের পরস্পরের সম্মতি ও ইচ্ছার ভিতরে তা সংঘটিত হয়। কিন্তু সম্মতি বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি হয় তাহলে ছোট খাট যৌন বিষয়ও মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয় বটে। এটি পশ্চিমা সামাজিক সংস্কৃতি হলেও খৃষ্টান মূল্যবোধের সংস্কৃতি নয়। পশ্চিমা সমাজ এটির পরিচয় দেয় 'ধর্মনিরপেক্ষ' তত্ত্ব দিয়ে। এ ধরনের অবাধ ও প্রায় প্রকাশ্য যৌনতার সমর্থন নেয় ওসব দেশে তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তার মাপকাঠি থেকে। তাহলে জনাব এমপি এর সংসদে বক্তব্য, পুস্তিকায় প্রকাশিত একই বক্তব্য, সাংবাদিক সম্মেলনে দেয়া সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিবিসিকে দেয়া তার প্রশ্ন-উত্তরের বক্তব্যের সারবস্তুর সাথে এদেরই ছাত্রনেতার ধর্ষণ সেঞ্চুরীর মধ্যে আমরা কি কোন সঙ্গতি খুঁজে পাই? নাকি তাদের মধ্যে মূল্যবোধ প্রশ্নে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড (Double standard) লক্ষ্য করি?

www.pathagar.com

সেই এমপি সাহেবকে অনেকেই জানেন। তার কর্মকান্ড নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় যেসব তথ্য বেরিয়েছে তাও হয়ত কেউ কেউ খোঁজ-খবর রাখেন। তাছাড়া তিনি যেহেতু একটি মফঃস্বল জেলা শহরের নামী ব্যক্তি, সে কারনেও অনেকেই তার দৈনন্দিন জীবনের খোঁজ-খবর রাখেন। তারই এলাকায় প্রায় ৫০জন মানুষ প্রাণ হারলো এইতো মাত্র ক'দিন আগে। বিষাক্ত মদ খেয়ে। এতে হয়ত তার করার কিছু ছিল না। কিন্তু ঐ এলাকায় যে মদের ছড়াছড়ি আছে তাতো বুঝা যায়। এসব বেআইনী মদের ব্যবসায়ীদের সাথে এমপি সাহেবের ঘুণাক্ষরেও পরিচয় নেই তা কি বিশ্বাস করা যায়? এমন খবরও আমরা অনেকেই শুনতে পাই যে ঐ ছোট শহরটির ছোট-মাঝারি-বড় সকল ব্যবসায়ীরা ঐ এমপি সাহেব ও তার কর্মীদের নিয়মিতই টোল দেয়। আমার এক অনেক পুরাতন ছাত্রও ওখানে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে গিয়ে তাদের বেশ কিছু মোটা 'নজরানা' দিয়েছেন বলে কিছুদিন আগে সে আমার কাছে দুঃখ করে বলেছে। এমপি সাহেবের একজন নিকট আত্মীয় আমাকে বলেছেন যে তিনি তাঁর আপনজনের কাছেও এভাবে ট্যাক্স নেন। এই ধরনের অনৈতিক মানদন্ড এ দেশে অনেকেরই। ধর্মনিরপেক্ষবাদীতা এই নীতিহীনতা বা মূল্যবোধের অবক্ষয়কে এ দেশে এক চরম পর্যায়ে হাজির করিয়েছে। এর একটি কারন উল্লেখযোগ্য। কারনটি হচ্ছে, উন্নত পশ্চিমা দেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' গড়ে উঠেছে খৃষ্টান মূল্যবোধের ভিত্তিকে সবলভাবে গড়ে তোলার পর। ঐ ভিত্তিকে হাজার হাজার বছরব্যাপী চর্চা করার পর। এই কারনে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক কিছু বিষয়কে আপাতঃদৃষ্টে 'ধর্মনিরপেক্ষ' মনে হলেও তার প্রায় সবকিছুই খৃষ্টান মূল্যবোধের উপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি অনেক কিছুই ভিন্ন। কিন্তু মিল যেখানে সুস্পষ্ট তা হচ্ছে, খৃস্টান মূল্যবোধ অনুসরণ করে ওরা সবাই। যারা এই মূল্যবোধ হুবহু অনুসরণ করে না তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয় বরং অতি নগন্য। একটু আগে আমি যে প্রকাশ্যে যৌনতার কথা বলছি, তা অবশ্যই খৃষ্টান মুল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু এর ব্যাপকতা যেমন সাম্প্রতিককালে হয়েছে, তেমনি এর কারন বহুলাংশেই শিল্পায়ন, শিল্পে কর্মজীবি শ্রমিক শ্রেনীকে সস্তা আনন্দদান করে ব্যস্ত ও উৎপাদনক্ষম রাখার কৌশল। তাছাড়াও অন্য একটি কারন হচ্ছে, মহিলা শ্রমিককে ব্যাপকহারে বাইরের কর্মজগতে নিয়োগ এবং তাদের জন্য 'স্বাধীনতা' নিশ্চিতকরণ এর অভ্যন্তরীণ চাপ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রয়োজন। তবুও বাস্তব সত্য বিষয় হচ্ছে এই যে প্রকাশ্য যৌনতা সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী বা Working class বলে যাদের চিহ্নিত করা হয় তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মদ খাবার যে পশ্চিমা বিশ্বের PUB বা Public Bar Culture তাও এই কর্মজীবী শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উচুঁ শ্রেনীর মানুষ মদ খায় বা বিবাহিত পার্টনার এর বাইরে যৌনতা করে, কিন্তু তাদের সেই সব কাজ চার দেয়ালের মধ্যে ব গোপনীয়ভাবেই হয়ে থাকে। শ্রমিক শ্রেনীর মত প্রকাশ্য যেমন রাস্তাঘাট, বাজার, ক্যাফেটরিয়া, উন্মুক্ত বাগান ইত্যাদি জায়গায় ঘটে না। শ্রমিক শ্রেনীর এই PUB ও প্রকাশ্য যৌনতার সংস্কৃতির সাম্প্রতিককালে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে এবং যা খৃষ্টান মূল্যবোধকে আঘাত করেছে, তার সাথে অন্যদিকে আবার মুক্তবাজার

www.pathagar.com

অর্থনীতির একটি গভীর যোগাযোগ আছে। অন্যভাবে বলা যায় যে কায়িক শ্রমিক শ্রেনীকে এই দুই বিষয়ে ব্যস্ত সমস্ত রাখা মুক্তবাজার অর্থনীতির উচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার জন্যও একটি প্রয়োজন বটে। প্রয়োজন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এখানে খৃষ্টান মূল্যবোধের সাথে লাভসর্বস্ব নৈতিকতা বিবর্জিত মুক্তবাজার অর্থনীতির সংঘাত চলছে সর্বক্ষণ।

উন্নত বিশ্বের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মেয়ে মানুষ বিশেষ করে যুবতী ও সুন্দরী মেয়ে মানুষের দেহ একটি চড়া দামী পণ্য বিশেষ। এই বস্তুর চাহিদা অনেক। তাই সরবরাহও আছে। এর বাজার বহু বিস্তৃত। বেচাকেনাও হচ্ছে প্রতিক্ষন প্রতিদিন অসংখ্য অগণিত পরিমাণ। বিজ্ঞাপনের বিশাল জগতে যুবতী-সুন্দরী মেয়ে মানুষের দেহ এবং দেহের বিশেষ বিশেষ আর্কষণীয় (পুরুষ মানুষের কাছে) অংশ চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে অনেক দেশেই। মডেলিং এখন বাংলাদেশেও বিস্তৃতি লাভ করছে। উন্নত অনেক দেশে মেয়েদের মডেলিং একটি বৈধ বৃত্তি। মডেলরা এই কাজ করে অনেক আয় করে। কিন্তু 'মডেল' গার্লরা অনেক দেশেই প্রধানতঃ যৌনকর্মী। অর্থের বিনিময়ে তারা পুরুষ মানুষকে দেহদান করে। নিজের দেহ কিছু সময়ের জন্য পণ্য হিসাবে বিক্রি করে। এসব খৃষ্টান মূল্যবোধে অন্যায় বলে বিবেচিত, তাই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও মুক্ত বাজার-মুক্ত সমাজে এসব কোন কিছুই অন্যায় বিষয় নয়।

সারা পশ্চিমা বিশ্বে যেমন মহাসমারোহে ২৫শে ডিসেম্বর বা খৃষ্টমাস পালিত হয়-খৃষ্টান ধর্মের বিশ্বাসের রীতি হিসাবে যীশুখৃষ্টের জন্মদিন পালন করার জন্য তেমনি নতুন বর্ষ (খৃষ্টান-গ্রেগরিয়ান) বরণ করার জন্য ৩১শে ডিসেম্বর-এর রাতটিও ওরা নাচানাচি, মদ খাওয়া, একত্রিত হয়ে আনন্দ করা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে কাটায়। অনেক বড় বড় পশ্চিমা শহর নগরীর মত লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে সবচেয়ে বড় গেট টুগেদার এবং আনন্দ করার অনুষ্ঠান হয় প্রতি বছর। সেখানে ভীড়ের চাপে গোকজন আহততো হয়ই দু'চারজন মারাও যায় সেই রাতের অনুষ্ঠানে। সেখানে অপরিচিত পুরুষ-মেয়েদের পরস্পরকে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া একটি অতি সাধারণ বিষয়। ভাল ও কাম্য বিষয়। অন্যায় কোন কিছু নয়। এটি খৃষ্টান মূল্যবোধ কিনা আমি জানি না-তবে এ যে 'ধর্মনিরপেক্ষ' সামাজিক মূল্যবোধ তা নিশ্চিত করে বলা যায়। ধর্মনিরপেক্ষবাদীতার পশ্চিমা ধারণাই আওয়ামী লীগ ধারণ করে বলে দেশ বিদেশের সকল জ্ঞাত মহল জানেন। বাংলাদেশের যারা আওয়ামী লীগের জাদরেল এবং খাঁটি তত্ত্ববিদ তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে, তারা এবং তাদের এই রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের দর্শনে গভীরভাবে আস্থাবান এবং সেই আস্থা-বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা এই রাষ্ট্রের সবকিছু কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন এবং করতেই থাকবেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি জাতীয় বিষয়ের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে তাদের সেই 'ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী' জাতীয়তাবাদ। জাতীয় সত্তার মূল ভিত্তি। তাদেরকে কেউ ব্যক্তি পর্যায়ে ধর্মীয় কিছু বিষয়ে কিঞ্চিৎ মানবতার শো-আপ করলেও তারা প্রায় সবাই ব্যক্তি পর্যায়ে নিজেদের 'অজ্ঞেয়বাদী ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী' বলে স্বদম্ভে এবং প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। এটাই তাদের সাধারণ পরিচয়। এই দৃষ্টিতে সেই

www.pathagar.com

ছাত্রনেতার কিংবা তার অনুরূপ স্বভাবের অসংখ্য সঙ্গী-সাঙ্গীদের আচার-আচরণ উচ্ছৃংখলতা, মদ্যপী স্বভাব, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে হয়। মনে হয় এ জন্য যে বাংলাদেশে তারা যে 'ধর্মনিরপেক্ষ' সংস্কৃতির ধারক-বাহক সেখানে কোনই সুস্থ মূল্যবোধের ভিত্তি নেই। এমপি সাহেব যেন হঠাৎ করেই বাঁধনকে নিয়ে ইসলামী চেতনা বা মুসলমানী মূল্যবোধ প্রশ্নে সোচ্চার হলেন। কেন? তার কথা, মুসলমান ঘরের কোন (যুবতী) মেয়ে রমযান মাসে গভীর রাতে ৩১শে ডিসেম্বরের খৃষ্টান অনুষ্ঠান পালন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যেতে পারে না। তিনি আরো কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে পরের বছর অর্থ্যাৎ ২০০০ সালের শেষে যে ৩১শে ডিসেম্বর রাত ২০০১ সালের সূচনায় উদযাপিত হতে পারে সেখানে তিনি কোন মুসলমান (যুবতী) মেয়েকে দেখতে চান না। এখানে লোকজন কি প্রশ্ন করতে পারে না যে এরা আবার কবে ইসলামী মূল্যবোধ এর জন্য কেন এত কঠোর হলো? কেনই বা হল এখন? 'অজ্ঞেয়বাদী' ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গলীত্ব কি তবে তারা পরিত্যাগ করেছে? নাকি সামনে নির্বাচন? ১৯৯৬ সালে তারা ও তাদের নেত্রী যেমন চমক দিয়েছিলেন ভোটারদের-সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভোটারদের-সাদা ধবধবে হেজাব পরিহিতা আল্লাহর দরবারে মোনাজাতরত শেখ হাসিনার বিশাল ছবিসহ লাখ লাখ পোষ্টারে দেশের আনাচে-কানাচে তারা ছেয়ে দিয়েছিল-মানুষের ইসলামী মূল্যবোধের অনুভূতির কাছে তাদের আবেদন আকর্ষণীয় করার জন্য। সন্দেহ নেই যে এতে তাদের উদ্দেশ্য বহুলাংশেই হাসিল হয়েছিল। লক্ষ-কোটি সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের সে ধুর্তামির কাছে হেরে গিয়েছিল-তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে। এদের অনেকেই ওদের বাক্সে নৌকায় ভোট দিয়েছিল। এরপর আফসোস করা শুরু করে-পরে ওদের আসল চেহারা দেখে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় বসার পর তাদের যতসব গণবিরোধী ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী অপকর্ম দেখে-শুনে নির্বাচনে ভোট দেয়ার জন্য ওরা ফেরেশতা বা দেবতার রূপে হাজির হয়। আর ক্ষমতার দম্ভ হাতে পেলে মানুষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধ ঘোষনা করে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে ওরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ওদের বিদেশী প্রভুদের কাছে বন্ধক দেয় বা এমনকি বিক্রি করে দেয়। একই ইতিহাস ও ধারা চলেছে ১৯৫৪-৫৫ সালে, আবার ১৯৭২-৭৫ এ এবং ১৯৯৬-এর জুনের পর গত সাড়ে তিন বছরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই চলতি শাসনকালে। মূল্যবোধের যে চরম অবক্ষয় ঘটেছে এই বাংলাদেশে এবং এই আমলে এক চুড়ান্ত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার অহরহ প্রমাণ দিচ্ছেন স্বয়ং দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহম্মদ। সময়-সুযোগ পেলেই তিনি এই অবক্ষয় নিয়ে কথা বলেন। সোচ্চার হবার চেষ্টা করেন-যেমন সর্বশেষ ২৪শে ফেব্রুয়ারী একদল ছাত্রের অনুষ্ঠানেও তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধের মারাত্মক অবক্ষয় নিয়ে তার চরম অসন্তোষের কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের অফসোস করা দিয়ে ব্যক্তির অনুভূতি প্রকাশ পায় নিঃসন্দেহে, কিন্তু এতে কি মূল সমস্যার কোনরূপ তিলমাত্র সমাধান হবে? হতে পারবে কি আদৌ?

www.pathagar.com

মানবিক মূল্যবোধ হাওয়ায় বা বাতাসে জন্ম নেয় না। মাটি বা সাগর সমুদ্রের পানিতেও নয়। মূল্যবোধের জন্ম হয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তায়। ইসলামের ভাষায় আল্লাহ প্রদত্ত 'রূহ' বা Spirit-এ। মানুষের সমাজ মূল্যবোধের জন্ম দেয় বলে যেকথাটি অনেকে বলে বা আমরা শুনি তার পিছনের যুক্তি খুবই দুর্বল। যদি সবলই হতো তাহলে প্রথম মানুষটির মূল্যবোধ বলে কোনকিছুই থাকতে পারত না। অবশ্য প্রথম মানুষটির কথা যারা স্বীকার করে না তাদের কথা ভিন্ন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে যারা বির্তক করতে চায়-তাদের জন্য বোধকরি মূল্যবোধ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলাই অবান্তর-ভিন্নতর আলোচনা হতে পারে অবশ্য। মোট কথা হচ্ছে এই যে, যদি মানবিক মূল্যবোধের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কোনকিছু চিন্তা করতে হয় তাহলে মানুষের আধ্যাত্মিক উৎস চিন্তা করতে হবে। এখান থেকেই মূল্যবোধের চর্চা করা সম্ভব হবে। ভাল ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ এই ভাবেই তৈরি করা সম্ভব হবে। সঠিক চরিত্র ও আচরণ গঠন এই ভাবেই হবে। বাংলাদেশে যে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা আমরা বলি বা শুনি তা এখনো ঐ আধ্যাত্মিক চেতনার মানব সমষ্টির মাঝেই তেমন দেখা যায় না। বরং যারা সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ তারাই প্রধানতঃ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের উজ্জ্বল নমুনা। কেউ কি এই বক্তব্য বা মন্তব্য অস্বীকার করতে পারেন? বর্তমান সরকার যতই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন, বা সেখানে পলিসি গাইড করেছেন, তারা ততই যেন দেশে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বন্যা এনেছেন। দেশ আজ সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ বলে সবাই দোষারোপ করছে। কেন? বাঁধনকে 'বলির পাঁঠা' বানানো যেতে পারে যেমনটি এমপি সাহেব এবং এই সরকারী দল করতে চাইছেন-তাতে তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিল হলেও দেশে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যে মহাপ্লাবন এরা শুরু করেছেন তা বোধ করি মহাপ্রলয়ের দিকেই দ্রুত নিয়ে যাবে আমাদের সবাইকে।

০২/০৩/২০০০ইং, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

জুডিশিয়ারীর উপর প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ পরিকল্পিত

উচ্চ আদালত বা হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্ট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবমাননাকর বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। কোন কিছুরই তোয়াক্কা করছেন না তিনি। বছর দেড়েক আগে সেই একই কারনে তাকে শালীনতার সাথে ভৎর্সনা করা হয়েছিল যা থেকে তার শিক্ষা গ্রহন করা বাঞ্ছনীয় ছিল-দ্বিতীয়বার আর কোন ধরনের অবমাননাকর বক্তব্য উচ্চারণ করা থেকে তার বিরত থাকা উচিত ছিল-তা তিনি করছেন না। কে জানে সেই বিজ্ঞজনোচিত অতি প্রাচীন বচনটি 'অবুঝকে বুঝাবো কত কথা নাহি মানে, ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য বাড়া ভানে'-প্রযোজ্য কিনা।

প্রধানমন্ত্রীর এই অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদ করছেন অনেকেই। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হচ্ছে না। কিন্তু তবুও তিনি ক্ষান্ত হচ্ছেন না। বরং আরো যেন বেশী বেশী ইগোয়িষ্ট ভাব দেখাচ্ছেন। কিন্তু কেন? উচ্চতর আদালতকে কি তিনি তার নির্বাহী ক্ষমতার আজ্ঞাবহ করতে চান? জুডিশিয়ারীর স্বাধীনতা কি তিনি হরণ করতে উদ্যত হয়েছেন? এখানে আমার মনে পড়ছে একটি ঘটনার কথা। শেখ মুজিবের সাথে একজন হাইকোর্টের বিচারকের একটি এনকাউন্টারের ঘটনার বিষয়। মাননীয় সেই বিচারক ছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। বরিশালের এখন মরহুম চৌধুরী। ১৯৭৪-এর কোন একটি ঈদের দিনের ঘটনা। চৌধুরী সাহেব হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে শেখের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। সৌজন্যের কারনে চৌধুরী সাহেব শেখকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন আছেন'। শেখ অনেকটা বিরক্তি এবং রাগান্বিত হয়ে উত্তর দেন, 'ভাল আর থাকি কি করে বিচারপতি সাহেব, আমরা পুলিশ দিয়ে চোর ধরি। আর সেই চোরদের আপনারা জামিন দেন।' কোর্টের জামিন দেয়ার ক্ষমতার বিরুদ্ধেই যেন ছিল শেখের রোষ, অবশ্য এই রোষ, বিরোধী পক্ষকে জামিন দেয়ার জন্য নিজেদের লোকদের জামিনের ক্ষেত্রে নয়। ঠিক হুবহু একই ধরনের কথা নাকি বলছেন তারই যোগ্য মেয়ে শেখ হাসিনা? এ ধরনের রোষ দেখানো বা ক্ষেপাম্পিনা কি আদৌ সঙ্গত? গণতান্ত্রিক এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের অসঙ্গত ও অবমাননাকর আচরণ কি করতে পারেন?

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থা পেয়েছে বৃটেন থেকে। বৃটিশ প্রশাসন ব্যবস্থায় সংসদ, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের মধ্যে যে ধরনের ক্ষমতার ভাগাভাগি বিভাজন, পারস্পরিক স্বাধীনতা ইত্যাদি আছে বাংলাদেশেও তা সবই থাকার কথা। অন্ততঃ ঐ বৃটিশ মডেলই বাংলাদেশের জন্য অনুকরনীয় মডেল। তবে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার কারনে যেমন সংসদ এবং নির্বাহী বিভাগ হুবহু বৃটিশ মডেলের মত দক্ষভাবে কার্যকর আছে, তা হয়ত নাও হতে পারে। কেননা সুস্থ রাজনীতির কালচার বাংলাদেশে এখনো গড়ে উঠেনি। কিন্তু তাই বলে একথা বলা সঠিক হবে না যে বাংলাদেশের জুডিশিয়ারী এবং বিশেষ করে হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্ট বৃটিশ হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্টের তুলনায় কোনভাবে নিম্নমানের বা কম দক্ষ। কেননা, আমরা সবাই জানি

www.pathagar.com

যে, প্রায় দেড়শ' বছর সময়কালব্যাপী এদেশে এই জুডিশিয়ারী শক্ত ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে। তাছাড়াও কথা আছে। জুডিশিয়ারীতে যারা উপরে উঠেন-হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি পদে আসীন হবার সুযোগ পান-তারা দেশের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মেধাবী এবং উচ্চশিক্ষিত গুটি কতক ব্যক্তিবর্গ। তদুপরি তাদের থাকে বিচার নিয়ে গভীর পড়াশোনা এবং সুদীর্ঘকাল বিচারকাজ সম্পাদন করার ফলপ্রসু অভিজ্ঞতা। ফলে স্বাভাবিক কারনেই উচ্চতর জুডিশিয়ারী কর্মক্ষমতা নিয়ে অবমাননাকর প্রশ্ন তোলা শুধু অবান্তরই নয় হাস্যকর বিষয়ও বটে। তবে হ্যাঁ কারোর হিউম্যান ফেইলিংগস (Human failings) থাকতে পারে না তা হয়ত নয়। কিন্তু তাহলে, তা হয় নগন্য ব্যতিক্রম হিসাবে যাকে আইনের ভাষাতেই বলা যায় যে, 'এক্সেপশন প্রুভস দি রুল' (Exception proves the rule) ব্যতিক্রম ফেইলিওরকে সবার ফেউলিওর বলে সরলীকরণ করা কোনোভাবেই সুস্থমনের পরিচয় বহন করে না। বরং নির্বাহী ক্ষমতার বাড়াবাড়ি এবং অপপ্রয়োগের নমুনা বলেই দেখা যায়। এবং এই নমুনা বরং ইংল্যান্ডে ১২১৫ সালের আগে অর্থ্যাৎ প্রায় আটশত বছর আগে যেভাবে নির্বাহী ক্ষমতার বাড়াবাড়ি এবং অপপ্রয়োগ হতো শেখ হাসিনা যেন তাই করতে চাইছেন। উল্লেখ্য যে, ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাগনাকার্টা সই করে দেয়ার আগে রাজা জন (John) যেমন তার নির্বাহী ক্ষমতার বাড়াবাড়ি ও অপব্যবহার করছিলেন-করে চলেছিলেন বলে প্রজারা তাকে রাজপ্রাসাদে ঘেরাও করে নিজেদের জন্য মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, রাজার আরবিট্রারি ক্ষমতা রহিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য রাজার নির্বাহী ক্ষমতা আইনের শাসনের অধীন করতে প্রজারা রাজাকে বাধ্য করেছিলেন। হাসিনা যেন সেই আটশত বছর আগের সেই রাজা জনের নির্বাহী ক্ষমতার পর্যায়ে বিহেভ (Behave) করছেন। অথচ হাসিনাই নাকি বাংলাদেশের একবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানবাধিকারের চরম উৎকর্ষের এই সময়কালে যে প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ আইনের শাসনকে অপমান করতে পারেন, তার ঐ পদে থাকার তিলমাত্রও কোন সঙ্গত অধিকার থাকতে পারে কি? আমাদের মনে হয় না।

শেখ মুজিব একদলীয় শাসন ব্যবস্থা দেশে পাকাপাকি চালু করার আগে জুডিশিয়ারীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করা শুরু করেছিলেন বলে আমরা অনেকেই জানি। তাছাড়া অতি সহজেই আন্দাজ করা যায় যে, একদলীয় জংলী ব্যবস্থা করে দেশ শাসন করতে হলে বিচার বিভাগকে টেম ডাউন (Tame down) করতে হয় যেমন কিনা হয়ে চলেছে একদলীয় সকল দেশেই। হাসিনা মুজিবের সেই পথেই তাহলে কি চলা শুরু করেছেন? সে অপশন (Option) তার আছে। তবে একথাও এদেশের মানুষ জানে এবং বলতেই থাকবে যে মুজিবের একদলীয় ব্যবস্থা যেমন এদেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, তেমনি হাসিনা যদি তাই করেন তাহলে গণতন্ত্র প্রেমিক বাংলাদেশের মানুষ তার পিতার মত তাকে মেনে নিবে না।

www.pathagar.com

হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্টের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার বিষোদগারের রিপিটেশনের সময়ক্ষণটি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই অনেকে মনে করছেন। হাইকোর্টে যে বিশেষ একটি মামলার ডেথ রেফারেন্সের শুনানি চলছে বিশেষ ভাবে গঠিত একটি দুই বিচারপতির বেঞ্চে এবং যে মামলায় নিম্ন আদালতে যে রায় ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে ঘোষিত হয়েছে তাই যেন আপীলেও অপরিবর্তিত থাকে-অপরিবর্তিত থাকার স্বপক্ষে সবল তথ্য, পয়েন্ট, যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপ যেসব অসংখ্য প্রোগ্রাম পালন করে চলেছে তার মধ্যে শেখ হাসিনার একটি এবং একটি মাত্রই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে। এবং তা হচ্ছে হাসিনার কথায়, 'পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই তিনি ক্ষমতা দখল করেছেন'। এই কোটেশন আমাদের মতো নগন্য কোন মানুষের বানানো বা মনগড়া কোন কিছুই নয়-বরং বিবিসি খ্যাত এবং শেখের এক সময়ের অতি ঘনিষ্ঠজন লন্ডন প্রবাসী সেরাজুর রহমানের সাম্প্রতিক এক লেখা-নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি মাত্র। শেখ হাসিনার বিগত চার বছরের চরম অপশাসনে যে বিশেষ বিশেষ মামলা আদালতকে মারাত্মকভাবে টেম ডাউন করেছেন অতীতের তুলনায় সবচেয়ে বেশী তা বর্তমান সবার কাছে সুস্পষ্ট। ফলে মিসক্যারেজ অব জাষ্টিস (Miscarriage of Justice) হচ্ছে অনেক মামলায়। যেমন সেই মামলাটির রায়ে হয়েছিল বলে সাথে সাথেই ১৯৯৮ সালের ৯ই নভেম্বর ও তার পরে অনেক প্রতিবাদ করেছিলেন দেশ-বিদেশের অনেকেই। অনেক বিদগ্ধ আইনজীবীও। নিম্ন আদালতের কোন কোন দু'একজন জজকে ওরা যেভাবে ভয়-ভীতি দেখিয়েছে, দেখিয়ে চলেছেন বলে অহরহ খবর পাওয়া যাচ্ছে তাদের চাহিদা, ইচ্ছা বা খেয়াল খুশী মতো রায় করিয়ে নিতে, সেই একই অসৎ ইচ্ছা কি তারা হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টেও চাপিয়ে দিতে চাইছেন না? এই ঔদ্ধত্য গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীর সাজে না।

১৭/০৮/২০০০ইং, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

ঠান্ডা ও গরম নিঃশ্বাস নেয়া বন্ধ করুনঃ জননন্দিত মহান বীরদের অবিলম্বে মুক্তি দিন

ইংরেজী ভাষায় একটা দামী প্রবাদ বাক্য আছে-"Blowing hot and cold in the same breath"। একই নিঃশ্বাসে বা একই সাথে গরম ও ঠান্ডা দু ধরনের বাতাস ছাড়া। রাজনীতিবিদদের মধ্যে যারা কম পরিপক্ক তারাই এমন কাজ করেন-কথা বার্তা বললে-কথাবার্তায় যৌক্তিক ধারা রাখতে পারেননা-এমন সব কাঁচা রাজনীতিবিদদের বেলায় ঐ ইংরেজী প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়।

আওয়ামীলীগ তুলনামূলকভাবে একটি প্রাচীন দল। বাংলাদেশে যারা এখন রাজনীতির সামনের কাতারে তাদের মধ্যে এরাই বলা যায় পুরানো দল। তাই এদের নেতা নেত্রীরা একই নিঃশ্বাসে গরম ও ঠান্ডা বাতাস ছাড়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু হালে একটি বিষয় নিয়ে তারা তাই করছেন গরম-ঠান্ডা বাতাস ছাড়ছেন তাদের নিঃশ্বাসে। ফলে নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যে স্বাভাবিক কারনেই ঐক্যমত নেই তা অতি সহজেই ধরা পড়ছে। বাইরের মানুষ তা সুস্পস্ট ভাবেই বুঝতে পারছেন।

সমস্যাটি কি?

এখানে বিষয়টি হচ্ছে, ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থানের "মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্ত" নেতাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা নিয়ে তাদের মধ্যে বক্তব্যের ভিন্নতা। কেউ চাইছেন, এই মুহূর্তেই সেই বিশেষ জজকোর্টে দেয়া মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হোক। অন্য কেউ চাইছেন, হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্স এর মীমাংসা ত্বরান্বিত করা হোক। আর ভিন্ন একজন চেয়েছেন যে ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঐ বিচার শেষ করা হোক। একই শীর্ষ নেতা আরও বলেছেন, যতদিন এই বিচারকাজ (তাদের চাহিদা বা ইচ্ছা ও আশা অনুযায়ী) হয়েছে বলে তারা বুঝতে পারবে না অর্থাৎ সেই জজকোর্টে দেয়া "ফায়ারিং স্কোয়াডে" মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে না ততদিন তারা "লাঠি মিছিল" করতেই থাকবে। লাঠি মিছিল করে তারা কি করতে চায়, কাদের ভয় দেখাতে চায়, কাদের পিঠে লাঠি মারতে চায়, তা যদিও আন্দাজের বিষয় মাত্র-কিন্তু তবুও একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকে একজন বিদগ্ধ রাজনৈতিক ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন যে ওরা লাঠি মিছিল করে ঐ গরীব লাঠিওয়ালাদের বিপদে ফেলে দিয়ে নিজেরা নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেদের স্থান করে নেয়। এ সব মন্তব্যের চেয়ে; বেশী সুচিন্তিত এবং পাকা মন্তব্য করেছেন তাদেরই আর একজন শীর্ষ নেতা এবং আইনজীবী। তিনি আইনের কথা না বলে পারেন নাই। "Justice delayed is justice denied" এই নীতিটির উদ্বৃতি দিয়ে তিনি দ্রুততর গতিতে ঐ মামলাটির নিস্পত্তি চেয়েছেন। মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতেই হবে এমন কথা তিনি বলেন নাই-অন্তত ১৮ই এপ্রিল তিনি বিবিসি বাংলা রেডিও এর সাথে সাক্ষাতকারের সময়। সেই একই সাক্ষাতকারে তিনি আরো যে কথা বলেছেন তা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে, তারা বা তাদের দল ও সরকার কোন ব্যাক্তি বা

www.pathagar.com

গোষ্ঠী হত্যার বিচার চান না-বিচার চান গণতন্ত্র হত্যার। যারা ঐ দিন সন্ধ্যার (৭:৩০) বিবিসি এর বাংলা রেডিও অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য নিজ কানে শুনেছেন তারা নিশ্চিতভাবে এই গণতন্ত্র হত্যা শব্দ দুটি শুনেন নাই বলে আমরা বিশ্বাস করি না। এসব পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করে তারা যে একই নিঃশ্বাসে গরম ও ঠান্ডা দু'ধরনের বাতাস ছাড়ছেন তা বোধ করি সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়।

কিন্তু কেন এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিপরীতার্থক বক্তব্য দেয়া? সরকারী আওয়ামী দল এ বিষয়ে যাই বলতে চায় না কেন মানুষ এ ধরনের বিপরীতমুখী বক্তব্যের কারন খুজবেই।

কোর্টের রায় ঘোষনার আগেই রায় দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-

দেশের মানুষ বিগত প্রায় চারটি বছর থেকেই খেয়াল করে আসছে যে, ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের ঘটনাটি নিয়ে এই সরকার মামলা দাঁড় করানোর আগে থেকেই ঐ ঘটনার বা সেই সফল সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কদের ঢালাও ভাবে "খুনী" হিসাবে গালমন্দ করা শুরু করে। যে জজ কোর্টে সেই মামলাটি চলে সেটি ছিল একটি বিশেষ কোর্ট এবং সেটির গঠন, জজ নিয়োগ ইত্যাদি সবই ছিল খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। নিজস্ব কায়দায় নিজস্ব লাইনের লোক নিয়োগ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতৃহত্যার বিচার করার জন্য। এবং সে বিচার যে তার মত করেই তিনি করে নিয়েছিলেন তার অনেক প্রমাণাদিও জনগণের মধ্যে অনেকেই জানে। সেই থেকে সেই জজসাহেব সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যা একজন জেলা জজের পাওয়ার কথা নয় তা তাকে দেয়া হয়েছে। তার পরিবারের সদস্যদের যারা সেনাবহিনীর সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়-তাদের জন্য সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছেন শেখ হাসিনা-প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসবে বিশেষ হুকুম দিয়ে এ ব্যবস্থা করে। সম্প্রতি সেই জজকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন মাননীয় সদস্য বানিয়েছিলেন যা নজিরবিহীন। নজিরবিহীন এ কারনে যে জেলা জজ পর্যায়ের কোন সরকারী কর্মকর্তা পি এস সি এর সদস্য হবার উপযুক্ত নন। এমন কেউ কোনদিন এর আগে হয়েছেন বলে নজির নেই। তাই ঐ জজ কোর্টের রায় যে-শেখ হাসিনার নির্দেশিত রায় ছিল তা একটি ওপেন সিক্রেট মাত্র।

সেই অন্যায় ও অবৈধ রায়ের বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার হয়েছে-

এই কারণে ৮ই নভেম্বর সেই কোর্টে ঐ রায়টি ঘোষনার সাথে সাথেই তার অসংখ্য প্রতিবাদ হয়েছে। দেশের অনেক আইনজীবি ছাড়াও দেশ বিদেশের অনেক নামকরা ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবীও সেই রায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এর মত আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সংগঠনও ঐ মৃত্যুদন্ড রায়ের প্রতিবাদ করেছে। মৃত্যুদন্ডের মত চরম শাস্তি এখন অনেক সভ্য দেশেই রহিত হয়েছে বা এই দন্ডের আর কোন রেওয়াজই নেই সেজন্য যে এই মৃত্যুদন্ডের দুনিয়াজোড়া প্রতিবাদ হয়েছে তা নয় বরং এই মামলাটি যে সাধারণ কোন হত্যাকান্ড ছিল না, তাই এই রায়ের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

অনেকেই সোচ্চার হয়েছেন। "Justice must be seen to be done " বলে আইনে যে একটি নীতি আছে তা যে এই রায়ে মোটেই দেখা যায় না তা বিস্তারিত না বললেও চলে।

সফল অভ্যুত্থানের অনুসঙ্গাদি-

বস্তুতঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট ঢাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতার হাত বদলের জন্য অনুসঙ্গ হিসাবে কিছু মানুষ উভয় পক্ষে হতাহত হয়েছিল। তাই ঘটনাটি ছিল রাজনৈতিক। সাধারণ হতাহত হবার বা হত্যাকান্ড নয়। আর এই হত্যাকান্ড শুধুমাত্র ঢাকায় ঘটে নাই। অতীতেও যেমন ঘটেছে অনেক অনেক দেশে তেমনি সাম্প্রতিক কালেও ঘটেছে কোথাও কোথাও। বস্তুতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের এটিও একটি প্রক্রিয়া বটে। এবং এই প্রক্রিয়ার সাধারণ রূপ হচ্ছে-সামারিক অভ্যুত্থান।

সফল অভ্যুত্থান কোন বিচার্য অপরাধ নয়-

আবার এই ধরনের অভ্যুত্থানের দুটি দিক আছে। অভ্যুত্থানটি বিফল হলে- অর্থ্যাৎ ক্ষমতা দখল করে রাখতে না পারলে অভ্যুত্থানকারীরা শাস্তি পায়। কঠোর শাস্তি পায়-সামরিক আইনে মৃত্যুদন্ডও হতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে যদি অভ্যুত্থানটি সফল হয় তাহলে বৈধ বলে বিবেচিত হয়। এই বৈধতা শুধু আইন সম্মতই নয় বরং আইনের উৎসও হয় বটে। তাই সফল অভ্যুত্থানকারীদের কোন শাস্তি হবার নজীর দুনিয়ার কোথাও নেই। সেটা আইনের বিধানও নয়। যে আইন এ বিষয়ে প্রাসংঙ্গিকতা "Justice delayed is justice denied" এর মতই আইনে অন্য একটি মূল নীতি যার আসল কথা হচ্ছে "Cou is crime if it fails" ক্যু বা সামরিক অভুত্থান তখনই একটি অপরাধ বলে বিবেচিত হয় যখন তা অকৃতকার্য হয়। কৃতকার্য হলে তখন তা কোন অপরাধ হয় না। অপরাধতো হয়ই না বরং তা পরবর্তী সময়ে আইনের বৈধ উৎসও হয় বটে। এই নীতির ভিত্তিতে ১৯৭৫ সালের ঢাকার ১৫ই আগষ্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থানটি কোন সাধারণ হত্যাকান্ড হিসাবে বিচার্য কোন বিষয় হবার কথা নয়। এ কথা যারা আইনবিদ তারা জানেন। যারা আইনবিদ নন, তারাও খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন। শেখ হাসিনা আইন পড়েন নাই। এই বিষয়ে তিনি বই পড়ে না শিখে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি তার অসংখ্য সঙ্গী সাথীর মধ্যে যারা আইন পড়েছেন তাদের কাছে জেনে নিতে পারেন। তার আইন বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত বাবুকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করে নিয়ে তিনি জানতে পারেননা তা নয়। তিনি বা বাবু যদি তা গোপন করে যান, বা গোপন করে থাকেন তা হলে তা ভিন্ন কথা। কিংবা হাসিনা যদি জেনেও না জানার ভান করেন সেতো আরো ভিন্ন কথা। ১৮ই এপ্রিল বিবিসি এর সাথে সাক্ষাৎকারে সুরঞ্জিত বাবু যা বলেছেন বলে আমরা উপরে উল্লেখ করেছি তাতেই বুদ্ধিমান সবার কাছে স্পস্ট হবার কথা যে তিনি পরোক্ষ ভাবে হলেও এই মামলায় মুজিব হত্যাকান্ড বিষয়টি গৌন করে দেখেছেন। তিনি কোন ব্যক্তি বা

www.pathagar.com

গোষ্ঠীর হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করেননি, দাবী করেছেন গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার হত্যাকান্ডের বিচার। মুজিব ব্যক্তির হত্যা এবং গণতন্ত্র হত্যা যে এক বিষয় নয় এবং তাই এক অপারাধের ধারায় তারা পড়ে না, তাতো বিস্তারিত না বললেও চলে। এবং এই প্রশ্নদ্বয় থেকে আর যাই হোক না হোক, একটি বিষয় অন্ততঃ বেরিয়ে আসছে যে ১৫ই আগষ্টের সবকিছু ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার হাত বদলের ঘটনার বিষয়াদি সর্ম্পকিত। সাধারণ কোন খুন-খারাবি নয়। তাই এটির জন্য কোন সাধারণ খুনের মামলা হতে পারে না।

পেনাল কোড বহির্ভূত রায় কেন?-

বিশেষ জজকোর্টের একক বিচারক গোলাম রসুল কেন এই মামলাটিকে সাধারণ খুনের মামলা হিসাবে বিচার করেছেন এবং সেই অনুযায়ী রায়ও দিয়েছেন-তার কারন আর বুঝি পুনঃ বলা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু তবুও না বললেই নয় যে তিনি একজন জজ হিসাবে তার পক্ষপতিত্বকে গোপন রাখতে পারেন নাই। তার অন্যতম প্রমাণ এই যে তিনি তার আইনের আওতার বাইরে 'ফায়ারিং স্কোয়াডে' ১৫জন সামরিক অফিসারের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার রায় দিয়েছেন। এতেই পুনঃ প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ এবং বর্তমান সরকারকে খুশী করার জন্যই তার রায়টি ঘোষনা করেছেন। আইনের জন্য নয়। আইনে যে আছে সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়া সে জন্য তো নয়ই। কেননা সেই রাতের অন্ধকারে কে কাকে খুন করেছে তার সার্বিক সাক্ষী কেউই থাকা সম্ভব নয়। নাইও।

"বিলম্বিত বিচার" প্রসংঙ্গ শুধু মাত্র একটি বিশেষ মামলার ক্ষেত্রে কেন?-

হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্সের মামলা আরো অনেক আছে। এমনকি ১৯৯৬ সালের মামলাও আছে। এই আগের মামলার নিস্পত্তি না করে ১৯৯৮ সালের শেষের ৮ই নভেম্বরের মামলাটির আগে নিস্পত্তি চেয়ে আওয়ামী লীগ যে পীড়াপীড়ি, মিছিল, মিটিং, লাঠি মিছিল, জজদের ভীতি প্রদর্শন, চাকুরী থেকে তাদের বরখাস্তের হুমকি ইত্যাদি গণতন্ত্র ও আইনের শাসন বিরোধী চরম অবৈধ অপকর্ম করেছে তাতে কি প্রমাণ হতে বাকী আছে যে এই দল ও তাদের সরকার যে কোন উপায়ে দেয়া রায় বাস্তবায়ন করবেই? অন্ততঃ সেই ১৫জনের যে চারজন ঢাকার সেন্ট্রাল জেলের ডেথ সেলে অমানবিকভাবে এখন আটক আছে তাদের ফাঁসিতেই ঝুলাবেই। এবং তাদের যে সময় আছে বাকী প্রায় একটি বছর তার মধ্যেই। এ কারনেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম যে এবছরের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমাও নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা ধরে নেয়া কোন অযৌক্তিক বিষয় হতে পারে না। এই মামলায় বিচার "বিলম্বিত" নীতিটির জন্য অসম্ভব চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে অথচ অন্য আর সব অসংখ্য মামলার বেলায় করা হচ্ছে না কেন?

www.pathagar.com

বিচারপতিদের বিব্রতবোধ করা আইন সম্মত-

বিচারপতিদের বিশেষ করে উচ্চ আদালতের বিচারপতিরা সাধারণতঃ ন্যায় বিচারের স্বার্থেই বিব্রতবোধ করতে পারেন, করা বাঞ্ছনীয়ও বটে। ডঃ কামাল হোসেনের মত একজন প্রবীণ ও বিজ্ঞ আইনজীবীও সে কথা ২৩ শে এপ্রিলের ঢাকার দি ইনডিপেনডেন্ট দৈনিক পত্রিকায় স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। অথচ এই ক্ষুদ্র বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগ, তাদের সরকার ও মন্ত্রীরা কতই না তুলকালাম কান্ড ঘটিয়েছিল এবং ঘটিয়ে চলবেন বলে প্রকাশ্যে ঘোষনাও দিয়েছেন। এ সব দেখে শুনে কি বিশ্বাস করা যায় যে ওরা আইনের শাসন চায়? গণতন্ত্র টিকে থাকুক তা চায় বলে কি আদৌ ওদের উপর আস্থা রাখা যায়? যায় না?

পঁচাত্তরের আগষ্ট এর রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন যেমন আইন সম্মত তেমন নৈতিকও ছিল বটে।

১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের দেশের সরকার পরিবর্তন অতীব দুঃখজনকভাবে সংগঠিত হয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিবর্তনটি তেমন হওয়া ছাড়া বিকল্পও কিছু ছিল না। কেননা, শেখ মুজিব নিজেই তার চরমতম ও জঘন্য Ego এর কারনে দেশে তার সরকার পরিবর্তনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সেসব ইতিহাসের পুনরুক্তি এখানে না করলেও সচেতন প্রায় প্রতিটি মানুষই তার বিস্তারিত জানেন। একদলীয় বাকশাল শাসন, শাসনতন্ত্র বর্হিভূত মুজিবের নিজস্ব ঘাতক বাহিনী রক্ষীবাহিনীর নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ, লাল-নীল-সাদা প্রাইভেট বাহিনীর নিত্যদিনের লোহমর্ষক যতসব অপকর্ম, তার পার্টির ক্যাডারদের অবৈধ ভাবে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবার বিপরীতে সাধারণ মানুষের হাহাকার, অনাহার, দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষের মৃত্যু ইত্যাদি অপকর্মাদির ফলে শেখ মুজিবের ক্ষমতায় থাকার নৈতিক ভিত্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই দেখা গিয়েছিল যে তার পতনের সাথে সাথেই বাজার দর পুনঃ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালে ফিরে এসেছিল। মানুষ স্বস্তির নিঃশাস ফেলেছিল। তাঁর পতন যারা এনেছিল তাদের জন্য মানুষ প্রাণ খুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেছিল। মুজিবের নিজ দলের সংসদের স্পীকার আবদুল মালেক উকিল তার পতনকে চরম অত্যাচারী ও ধিকৃত ফেরাউনের পতন বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মুজিবের দোযখখানা থেকে মানুষ যেন পুনঃ বেহেশতে প্রবেশের স্বাদ পেয়েছিল। এসব বিষয় অনেকে ভুলে গেলেও বা কেউ কেউ না জানলেও ইতিহাস হয়েই আছে। আর তাই আলীগের আইনবিদ Sane People-দের সাথে ঐ দলের অন্যদের ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ এর ঘটনাদি ও বিচার প্রসঙ্গ নিয়ে দ্বিমত বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকাই স্বাভাবিক। আইনগত কারনে যেমন তেমনি নৈতিক কারনেও বটে। তাই এই অবস্থায় ওদের বা আওয়ামীলীগারদের একই নিঃশ্বাসে ঠান্ডা-গরম নিঃশ্বাস নেয়াটাই অতি স্বাভাবিক। না নেয়াই বরং অস্বাভাবিক।

www.pathagar.com

বৈধ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকে সাধারণ হত্যাকান্ড সাজানো বৈধ হতে পারেনা -

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই যে এই মামলাটি সাধারণ একটি হত্যা মামলা হিসাবে দায়ের করা হয়েছে তা বুঝতে কারোই বাকি নেই। অথচ সবাই জানে যে গণতন্ত্রে প্রতিহিংসার কোন স্থান নেই। সহনশীলতা গণতন্ত্রের আবশ্যকীয় পূর্ব শর্ত। সবাই আরও জানেন যে পঁচাত্তুরের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করেই দেশ ও জতি সামনে এগিয়ে চলেছে। সেই পরিবর্তনের মুল নায়কদের ফাঁসিতে ঝুলালে দেশে শান্তি ও সংহতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবেই-যা শান্তিকামী একজন মানুষও চাইতে পারেন না।

তাই দেশের বৃহত্তর কল্যানের স্বার্থেই পঁচাত্তুরের ১৫ই আগষ্ট এর জননন্দিত নেতা এবং জাতীয় বীরদের অনতিবিলম্বে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের ডেথ সেল থেকে মুক্তি দেয়া হোক।

৩০/০৪/২০০০ইং, জাতীয় নিরাপত্তা ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং প্রচারিত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় টার্মে জিতলে তিনি লেন্দুপ দর্জীর ভূমিকা নেবেন

'একত্রীকরণ' ও 'একমুদ্রা' প্রশ্ন নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হৈচৈ হচ্ছে। কেননা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয় দু'টির প্রশ্ন নিয়ে নাকি আমেরিকার সিএনএন-এর প্রশ্নোত্তর সেসনে মুচকি হেসেছেন। সরাসরি কোন উত্তর তিনি সেদিন ঐ দু'টি প্রশ্নের দেননি। তবুও এক মুদ্রার ব্যাপারে নাকি বলেছেন যে, 'কিছুদিন দেরী' করতে হবে। ঠিক এখনই এই মুহূর্তে না। কে জানে তিনি যে 'দ্বিতীয় টার্ম' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্ন পূরণ হলে পর এমন ঐ দুটি বিষয় ষোল কলায় পূর্ণ করবেন কিনা তিনি।

যেসব পাঠক বিষয় দুটির হাল শানেনযুল জানেন না, তাদের জন্য বিষয়টি খোলাসা করে বলা দরকার। সম্প্রতি শেখ হাসিনা আমেরিকায় যে জাতিসংঘের মিলেনিয়াম সামিট (২০০০) এ যোগদান করতে গিয়েছিলেন, সেখানে ওখানকার মশহুর টিভি চ্যানেল সিএনএন-এর সাথে তিনি যে সাক্ষাৎকার দেন তাতেই ঐ দু'টি প্রশ্ন করেছিলেন দু'জন ভারতীয় নাগরিক। প্রশ্ন দু'টি ছিল তিনি (হাসিনা) আগে দেয়া ওয়াদা মত কবে নাগাদ বাংলাদেশকে ভারতের সাথে একীভূত এবং অভিন্ন মুদ্রা চালু করবেন। এই প্রশ্ন দুটির উত্তরেই তিনি মুচকি হাসি দিয়েছেন আর প্রশ্ন কর্তা এবং শ্রোতাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছেন।

শেখ হাসিনা দেশে ফেরার আগেই তার এই দুটি বিষয়ে 'মৌন সম্মতি লক্ষণ' বা মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ভীষন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে দেশের সবাই। ফলে দেশে ফিরে এসে তিনি যখন এক সংবাদ সম্মেলনে ঐ একই প্রশ্নের অনেকের সম্মুখীন হন, তখন আর নীরব থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রশ্ন দুটি এড়িয়ে যেতে পারেননি তিনি। ফলে দেশের মানুষের বিরুদ্ধ মনোভাবের বিষয় জানতে পেরেই তিনি 'ভালো' মানুষের মত উত্তর দিয়েছেন। 'অবান্তর' শব্দ প্রয়োগ করে ঐ দুই সম্ভাবনা 'নাকচ' করে দিয়েছেন। এছাড়া ভিন্ন কিছু বলার কোন অবকাশ ছিল না। কেননা তাহলে এখানকার দেশপ্রেমিকদের পক্ষে কেউ না কেউ আজতক তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার মামলা ঠুকে দিতেন। আপাততঃ হয়তো তিনি এই দুটি প্রশ্নে দেশদ্রোহীতার চার্জ থেকে রেহাই পেলেন। কিন্তু এই রেহাই কি স্থায়ী হতে পারে? কেননা অনেকেই এখনো বলাবলি করছেন যে, তিনি সঠিক উত্তর দেননি।

হাসিনা কার মানুষ সে কথা এদেশের একটি অতি সাধারণ মানুষও জানে। ১৯৭৫-এর পূর্বের কথা যদি বাদ দেয়া যায়, তাহলে এরপর বিগত ২৫ বছরে তিনি যেসব প্রমাণ রেখেছেন, তা নিয়ে মোক্তাসার আলোচনা করলেই তার চেহারা অতি খোলাসা হতে পারে।

১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের পর তার খাস স্থান ছিল দিল্লীর সাউথ ব্লকে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রায় ছ'টি বছর তিনি এই আশ্রয়ে ছিলেন।

www.pathagar.com

উল্লেখ করা যায়, হিন্দু মানসিকতা হলে এই উপমহাদেশে শুধুমাত্র 'অখন্ড' ভারত সত্ত্বাই সঠিক। কংগ্রেসের এবং সেই কারনে আওয়ামী লীগের দর্শন এবং লক্ষ্যই সঠিক। অন্য কোন দর্শন বা বিশেষ করে মুসলিম জাতিসত্ত্বা সঠিক নয়। তাই এবং এই পথেই আওয়ামীদের সর্বোত্তম বন্ধু হচ্ছে ভারতদেশটি ও তার সরকার। বিশাল সাহায্য সহযোগিতা করে তাকে ঢাকার ক্ষমতায় বসিয়েছে অবশ্য গণতন্ত্রের খোলসে। সেইসব ভারত মুখীতায় ও ভারতের সেই দর্শনে ট্রেনিং পেয়ে যখন হাসিনা তাই ১৯৯৬ সালে ঢাকার ক্ষমতা দখল করেন ২৩শে জুন, তখনই খুশীতে গদগদ হয়ে সেই সময় ক্ষণকে তারা এক-'মহাশুভক্ষণ' হিসাবে তখনকার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গুজরাল খোদ বিশেষ মন্তব্য করেছিলেন। অথচ এই দেশের মানুষ ভাল করেই জানে যে ঐ সময় দিনটি ছিল এই দেশবাসীর জন্য মহা কুলক্ষনের দিনক্ষণ। কেননা, ঐ দিনে ১৭৫৭ সালে এদেশের আজাদী ধ্বংস হয়েছিল পলাশীতে স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনের মধ্য দিয়ে। ভারতের অতি চতুর শাসকরা হাসিনাকে মুসলিম জাতিসত্ত্বা ধ্বংসী ট্রেনিং দেয়ার জন্য তার যে ভাবাবেগটির সর্বোত্তম ব্যবহার করেছিল তা ছিল তার 'পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ' নেয়ার হিংস্র প্রকৃতিতে সর্বক্ষণ সুড়সুড়ি দেয়া। এখনো সেই সুড়সুড়ি দিচ্ছে ওরা ও ওদের বংশধররা। আর সেই সুড়সুড়ির বিষয় এখন একটি অতি ওপেন সিক্রেট।

সম্প্রতি কালে শেখ হাসিনা যে পাকিস্তান দেশ ও রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে মারাত্মক বিষোদগার করে চলেছেন যা কূটনৈতিক ভব্যতার ধারে কাছে তো দূরের কথা, বরং চরম অশালীন বলে সবার চোখেই ধরা পড়ছে, তাকি হাসিনার কোন ভুল নাকি অতি পরিকল্পিত বক্তব্য এবং সেই সব বক্তব্যের সময় সুযোগটাও ফেলনা নয়। বাজপেয়ী যখন ১৪ই সেপ্টেম্বর মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে পাকিস্তানকে তুলা ধুনা করছেন, ঠিক তখনই হাসিনাও একই কাজ করছেন ঢাকায় বসে। আরো কাকতলীয় ব্যাপার এই যে ভারতের পত্র-পত্রিকাগুলোও হাসিনার পাকিস্তান বিরোধী সাধারণ শিষ্টাচার বর্হিভূত বক্তব্যকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে যারা বাংলাদেশকে ভারতের সাথে একীভূত করার জন্য জোর তৎপরতা চালিয়েছিল, তাদের সাথে তখন হাসিনার সরাসরি যোগাযোগ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও যারা ১৯৭১-এর পর ঐ একই কাজ করেছিল তাদের সাথে ১৯৭৫-এর পর হাসিনার যোগাযোগ সুগভীর বলেই অনেক তথ্য আছে। ১৯৭৭ সালের ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে কলকাতায় যে অনুষ্ঠান হয় সেখানে শেখ হাসিনা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বলাবাহুল্য যে, সেখানে সেদিনই 'বঙ্গভূমি' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলনের অন্যতম নায়ক দেশদ্রোহী ও সাবেক আওয়ামী এমপি চিত্তরঞ্জন সুতার এর সাথে হাসিনার ফরমাল সংযোগ পাকাপাকি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল এলাকার প্রায় ১/৩ ভৌগলিক অংশ নিয়ে 'স্বাধীন বঙ্গভুমি' আন্দোলনেরই বাংলাদেশে হাসিনার আশীবার্দপুষ্ট 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদ' তাতো একটি ওপেন সিক্রেট বিষয়। এরা এখন আর কলকাতায় বসে এদেশের সংহতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এ কাজ করছে না। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে বসেই হাসিনার ব্লেসিংগস (Blessings) নিয়ে সদম্ভে বাংলাদেশের সংহতিকে

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। করেই চলেছে। এদের বিরুদ্ধে হাসিনা কি কোন সময় টু শব্দটি পর্যন্ত করেছেন?

হাসিনা দিল্লীর এজেন্ডা বাংলাদেশে একে একে বাস্তবায়ন করছেন সে কথা এদেশের সবার মুখে মুখে কিন্তু যে কথাটি এখনো সবার মুখে আসে নাই এবং যা অতি জরুরীভাবে আসা উচিত-তা হচ্ছে এই যে এই মহিলা ইসলাম বিরোধী দুনিয়ার সকল শক্তির হাতের একটি সফল ক্রীড়নকও বটে। তার যে তথাকথিত সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রাপ্তির বহর তা অবশ্যই তার দালালীরই এনাম বটে। ইসলাম বিরোধীদের প্রদত্ত 'বকশীস'। তসলিমা নাসরিন ও সালমান রুশদীর মতই পেয়াবার একজন তিনি ঐ পশ্চিমা ইসলাম বিরোধীদের কাছে। বাংলাদেশের ভারতে একত্রীকরণ এর প্রসঙ্গ বা প্রশ্নটি নতুন কোন বিষয় নয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের যেদিন এই অঞ্চলটি স্বেচ্ছায় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই স্বাধীন দেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেই সময় থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। কথাবার্তার পর আন্দোলনও হয় ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে। ঐ সময়ে যেহেতু কংগ্রেসী নেতা প্যাটেল, নেহেরু ছাড়াও হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রাসাদ মুর্খাজী সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছিলেন যে ক্ষুদ্র, দরিদ্র অসহায় পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ) অবশ্য অবশ্যই তার নিজের বাঁচার জন্য 'অচিরেই' ভারত ইউনিয়ানে একীভূত হবেই এবং তার আগে পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন হবেই-তাই তাদের মত নামী-দামী বড় বড় নেতাদের সেই লক্ষ্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অনেকেই কাজ করে চলেছিল। সেই লক্ষ্যেই আওয়ামীলীগ এবং তাদের কিছু সংখ্যক বিশেষ বাম ধরনের নেতা-কর্মী সেই ১৯৪৭-এর পর থেকেই আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রোগ্রাম চালু রেখেছিল। এরাই ১৯৭১-এর যুদ্ধের পরপরই সেই একত্রীকরনের জন্য সেই সময়ের ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার কাছে যে অনেক অনেক ধরণা দিয়েছিল তাতো অনেকেরই জানা। ইন্দিরা তাদের কথা শুনেন নাই তা নয়। শুনেছেন। তবে সময় ক্ষনের ব্যাপারে তাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরতে বলেছিলেন। সেই ধৈর্য ধরার পর একটি মোক্ষম সময় হবে নাকি এই শেখ হাসিনার দ্বিতীয় টার্ম-২০০১ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা জিতলে পর তবেই। সিকিম-এর লেন্দুপ দর্জির ভুমিকায়ই যে শেখ হাসিনা পালন করছেন এখন এই বাংলাদেশে সে কথা তো অনেকেরই জানা।

০১/১০/২০০০ইং, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

গোয়েবলস্ আজাদ সাহেব এখন কি বলবেন?

কে সত্য কথা বলছেন? আবদুস সামাদ আজাদ নাকি বাবু অনিল সরকার? নাকি মেরী-এ্যান পিটার্স?

৫ই মে পত্রিকান্তরে ছাপার অক্ষরে দেখা গেল যে, আবদুস সামাদ আজাদ অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন যে, বাংলাদেশে নাকি গুজরাটের মত সংখ্যালঘু নীপিড়ন চলছে। পরের দিন অর্থাৎ ৬ই মে ঐ একই দৈনিকটি ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রীকে কোট (Quote) করে খবর ছাপালেন যে, বাংলাদেশে 'গুজরাটের' হত্যাযজ্ঞের আগুন এসে পৌঁছেনি। তাই আমাদের মত সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে- কে সত্য কথাটি বলেছেন আজাদ সাহেব নাকি অনিল বাবু?

সামাদ আজাদসহ আওয়ামী লীগারদের বড় বড় নেতা কর্মী, পাতিনেতা সহ প্রায় সবাই গোয়েবলসীয় মিথ্যাচারে ট্রেইনড এবং অতি পারদর্শী। যে কারনে সামাদ আজাদের উল্লেখিত বক্তব্যটি হয়তো আর একটি মিথ্যাচার হিসাবেই ধরে নেয়া যায়। তবুও বিষয়টি বোধ করি একটু যুক্তির কম্পিউটারে মেপে দেখা যেতে পারে।

গুজরাটে বিগত প্রায় দু'মাসে সরকারী হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৯০০ জন মানুষ নিহত হয়েছে। আহত, আগুনে পুড়ে, দোকান-পাট, সম্পত্তি ধ্বংসের সঠিক হিসাব যে অনেকগুন বেশী হয়েছে, তা সহজেই আন্দাজ করা গেলেও সঠিক কোন হিসাব জানা যায়নি। এসব হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের একটি হিসেব জানা গেছে, এসব হত্যার এবং অন্যসব ধ্বংসযজ্ঞের শতকরা নব্বই ভাগই হয়েছে মুসলমানদের। এই হিসাব আমাদের কারো নয়। নিরপেক্ষ বিদেশী একটি সংস্থার-হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর। গুজরাটে মুসলমান বিরোধীতায় এই যে বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে.গত দু'মাসে তার তুলনায় বাংলাদেশে সেই ধরনের কোন ঘটনার বা সেই তথ্যের মত কোন তথ্য কি আজাদ সাহেবের হাতে আছে? বিগত প্রায় দশ সপ্তাহ যাবৎ প্রায় প্রতিদিনই যে কোন না কোন মুসলমানকে গুজরাটে হত্যা করা হয়েছে, কাউকে কাউকে প্রকাশ্যে আগুনে পুড়ে মারা হচ্ছে, তাদের দোকান-পাট, ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, ফলে অনেক মুসলমান গুজরাট ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এমন কোন ঘটনা কি বাংলাদেশে হচ্ছে? গুজরাটে সংগঠিত অবিশ্বাস্য ভাবে প্রতিশোধমূলক আদৌ একটি ঘটনা কি সামাদ আজাদ সাহেব সঠিক করে দেখাতে পারেন? তথ্য দিতে পারেন সুনির্দিষ্টভাবে? না, তিনি তেমন সুনির্দিষ্ট কোন সঠিক তথ্য দেননি। দেয়ার কোন অবকাশও নেই। কেননা, তেমন কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনাও ঘটেনি। গত ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর এমন কিছু অভিযোগ ওরা করেছিলো, সেই সব তথ্য এমনকি ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক (পশ্চিমবঙ্গ) সরকার পর্যন্তও নাকচ করে দিয়েছিল।

ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা পনের ভাগের বেশী নয়। রাজ্য বিশেষে তাদের সংখ্যা কম বেশী আছে। তবুও একটি বিষয় সঠিক যে, মুসলমানরা ভারতে নগন্য, সংখ্যালঘু। এতো সংখ্যক সংখ্যালঘুরা কোন সাহসে আগ

www.pathagar.com

বাড়িয়ে প্রায় পঁচাশিভাগ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আক্রমন করতে সাহস করতে পারে? সাধারণ যুক্তিতে পারার কথা নয়। তবুও যদি কেউ কেউ তেমন দুঃসাহস করে, তা হতে পারে Desperate কোন কারনে। যেমন-বলা যায় বাবরী মসজিদের মতো গভীর ধর্মীয় অনুভূতি প্রশ্নে। যেমন ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর যখন উগ্র হিন্দুবাদীরা তখনকার ভারতীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তা বা পরোক্ষ মদদদানের কারনে সেই চারশত বছরের পুরাতন মুসলমানদের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ওই মসজিদটি মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। অনেকের স্মরণ থাকার কথা এই যে, ভারতের কেন্দ্রীয় বর্তমান বাজপেয়ী সরকারের অতি শক্তিশালী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভানী সেই বাবরী মসজিদটি ধ্বংসে নেতৃত্ব দেয়ার অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন। এমন জঘন্য ঘটনায় যে কোন মানুষের অতি ভাবাবেগী হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘুদের প্রতি সহানুভূতিশীল কোন অমুসলমান ব্যক্তি বা দল নেই এ কথা আমি বলতে পারি না বলছিও না। কিন্তু ওদেশের বিজেপি, আরএসএস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, সাবেক হিন্দু মহাসভা, সাবেক জনসংঘ ইত্যাদি দল এবং তাদের নেতা-কর্মীরা যে চরম মুসলিম বিদ্বেষী তা কি সচেতন কোন মানুষের অজানা? অজানা কি সে বিগত প্রায় ছয় দশক সময়কাল ব্যাপী এরা ভারতে যে লাখ লাখ মুসলমানকে হত্যা করেছে, তাদের বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পদ-সম্পত্তি থেকে উৎখাত করেছে, তার নজির কোথাও কি আছে? সেই তুলনায় পাকিস্তানে ভারতের মতো কোনো সংখ্যালঘু Massacre-এ সর্বাত্মক নিধন করা হয়েছে-কোন সময়েই? ১৯৪৭ সময়কালে বড় সংখ্যক হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভারতে চিরস্থায়ীভাবে চলে গিয়েছিলো, তাদের এদেশে সরকার বা মুসলমানরা তাড়িয়ে দেয়নি। বরং ওরা নিজেরাই চলে গিয়েছে। এই চলে যাওয়া নিয়ে যে মনমানসিকতা কাজ করেছিলো তা নিয়ে বাবু নির্মল সেন তার 'জননী জন্মভূমি' বইতে বিবরণ দিয়ে লিখেছেন যে, তার পরিবারের যার মধ্যে তার মাও ছিলেন, সদস্যরা এই বাংলাদেশে যা কিনা তাদের সবার জননী জন্মভূমি ছিল, তারই প্রতি তারা ছিঃ ছিঃ করে ঘেন্যায় থুথু দিতে দিতে নতুন স্বাধীন দেশ ভারতে চলে গিয়েছিলো সেই সাতচল্লিশের পরপরই। অন্যভাবে দেখলে বিষয়টি এই হয় যে সেই সাতচল্লিশে বৃটিশ ভারতের অনেক জায়গায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হলেও বাংলাভাষী মুসলমানরা বা বাংলাদেশের মুসলমানরা কোন ধরনের হিন্দু নিধনে বা নিপীড়নে বিতাড়নে কোনো অংশ নিয়েছিলো বলে ইতিহাসে সঠিক রেকর্ড নেই-বিচ্ছিন্ন দু একটি মারামারি সেতো নিজের পরিবারেও হয় কিংবা হতেই পারে। এ ধরনের ব্যাপার সাম্প্রদায়িকতা যে নয় তা কি বিস্তারিত বলার প্রয়োজন আছে? তাহলে পারিবারিক ঝগড়া-ঝাটিকেও সাম্প্রদায়িকতা নামকরণ করতে হবে । গুজরাটে দাঙ্গা চলছে এখন দশ সপ্তাহ সময়কালব্যাপী। এই দাঙ্গায় সরকারের কেউ কেউ এবং পুলিশের বেশ একটি অংশ হিন্দু দাঙ্গাকারীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব ধরনের মদদ দিয়েছে বলে সব ধরনের আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের তথ্যে উল্লেখ করেছে। অথচ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী এর জন্য দোষারোপ করেছেন মুসলমানদেরই। গুজরাটে যে তার বিজেপী দলীয় মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি কিনা

www.pathagar.com

ওখানকার নজিরবিহীন দাঙ্গার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না, তাকে পদত্যাগ করতে বলা তো অনেক দূরের কথা, প্রধানমন্ত্রী বজপেয়ী বরং তাকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে চলেছেন। অন্যদিকে ২৭৮-১৮২ ভোটে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে 'তিরস্কার প্রস্তাব' লোকসভায় বাতিল হওয়ায়, ফের প্রমাণিত হল যে, ভারতের অধিকাংশ মানুষ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুসলমান বিরোধী মনোভাব কত সুদৃঢ়।

গুজরাটে দীর্ঘ নাটক ভারতের অন্যত্রও মঞ্চস্থ হতে চলেছে বলে অনেকে আন্দাজ-অনুমান করেছে। গুজরাট থেকে মুসলমানরা পালিয়ে যে যেখানে পারে চলে যাচ্ছে। ৬ই মে কিছু গুজরাটি মুসলমান বাংলাদেশেও এসে পৌঁছেছে পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে। এর আগের দিন কুচবিহার থেকে একশ' জন মুসলমান বাংলাদেশের ভুরুঙ্গমারীতে এসে পৌঁছেছে। ওদের পালিয়ে আসার কারন একটাই। ভারতে তাদের নিজ জন্মস্থানে তারা নিপীড়নের ভয় করছে। বাংলাদেশে নাকি গুজরাটের মতো হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে ৪ঠা মে, একথা বলেছেন আজাদ সাহেব, পরের দিন অর্থাৎ ৫ই মে বাবু অনিল সরকার বলেছেন যে 'গুজরাটের আগুন বাংলাদেশে আসে নাই'। ৬ই মে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরী এ্যান পির্টাস এই বলে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশে গুজরাটের দাঙ্গা প্রতিক্রিয়ার কিছুই ঘটেনাই। সামাদ আজাদ সাহেব এসব তথ্যের বিপরীতে এখন কি বলবেন? তার সেই মিথ্যাচার প্রত্যাহার করবেন কি? গুজরাটের হত্যার সংখ্যা তথ্য থেকে আরও একটি বিষয় পরিস্কার। তা হচ্ছে এই যে, ওখানে নিহত প্রতি দশজনের একজন মাত্র সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত। মানুষে-মানুষে মারামারি-খুনাখুনি যতই ঘৃণ্য বিষয় হোক না কেন, এসব ঘৃণ্য অপকর্ম হচ্ছে দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র। কোথাও বেশী কোথাও কম। বাংলাদেশ এই সাধারণ নিয়মের বাইরে নয়। এতদসত্ত্বেও একটি বিষয় সঠিক ভারতে যে আনুপাতিক হারে মুসলিম নিপীড়ন, নির্যাতন ও নিহত হচ্ছে তাদের নিজের জন্মস্থানে-হোক সরকারী পুলিশ, আধাসামরিক, সামরিক এবং দলীয় বিশেষ বিশেষ গুন্ডা-পান্ডাদের হাতে, তেমন কোন আনুপাতিক হারের তথ্য বাংলাদেশে আদৌ কেউ কি দিতে পারবেন? আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং ঐ দলের প্রবীণতম নেতা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ পারবেন দিতে তেমন কোন সঠিক তথ্য? নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে কেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে গোয়েবলসীয় এসব হাওয়াই মিথ্যাচার?

১৬/০৫/২০০২ইং, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের তিপ্পান্ন বছর! মীর জাফরীর ইতিহাস

আ'লীগের 'সুবর্ণ জয়ন্তী' সত্যিকার কি? ওদের ভাষায় 'গৌরবের'। আর এদেশের মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতায় মীরজাফরীর। গোয়েবলসীয় চরম মিথ্যাচারের।

আওয়ামীলীগ তাদের তিপ্পান্ন বছর পূর্তি উদযাপন করল এবার। এ বছরের ২৩শে জুন। তারা হিসাব দাঁড় করিয়েছে যে, ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন থেকে ২০০২ সালের ২৩শে জুন তাদের বয়স ৫৩ বছর হলো। সত্যিই কি তাই?

১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন আওয়ামী লীগের জন্মদিন নয়। ঐদিন মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক দলটির পত্তন হয়েছিল তার নাম পরিচয় ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকার এবং পাকিস্তান কায়েমের দাবিদার হকদার মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং 'দুঃশাসন'-এর প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতেই আওয়ামী মুসলিম লীগ কায়েম হয়েছিল। দলটির তখনকার প্রতিষ্ঠাতারা বিশেষ করে মাওলানা ভাসানী সেই লক্ষ্যেই ওই রাজনৈতিক দলটির সূচনা করেছিলেন। সে দলের তিনি হয়েছিলেন সভাপতি এবং সামসুল হক সাধারণ সম্পাদক। শেখের বা শেখ মুজিবুর রহমানের সে দলে স্থান ছিল বটে। তবে অনেক নিম্নে। দু নম্বর-যুগ্ম-সম্পাদক। খোন্দকার মোশতাক ছিলেন ১নং যুগ্ম-সম্পাদক। সোহরাওয়ার্দী এই সুচনাতেই ঐ দলে যোগদান করেননি। তিনি তখন করতেন জিন্নাহ লীগ করাচীতে বসে। এরপর ১৯৫৪ সালে নির্বাচনী জোট 'যুক্তফ্রন্ট' বা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জোট গঠনের সময় আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি পরিত্যাক্ত হয়। এ বিষয়েব মুজিবের একটি ভূমিকার বিবরণ দিয়েছেন ভারতীয় বাঙালী সাংবাদিক এবং ভারতীয় গোয়েন্দার অন্যতম ঢাকায় অবস্থানকারী কর্মকর্তা জ্যোতি সেন গুপ্ত (দেখুন, জ্যোতির লেখা ও ১৯৭৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বই-(Freedom Movement of Bangladesh: Some Involvement.)।

১৯৫৪-এর সাধারণ নির্বাচনে ভাসানী আওযামীলীগের সাথে যুক্ত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীও করাচী থেকে ঢাকায় এসে আওয়ামীলীগে যোগদান করেন। এরপর নির্বাচন শেষে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করে নিজেরা পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক সরকারও গঠন করে। পরে সে সরকারের পতন হয় বছর খানেক সময়ের মধ্যেই। জারি হয় গভর্নরের শাসন ৯২ক ধারা। এরপর সোহরাওয়ার্দী-ভাসানীব মধ্যে ভাঙন শুরু হয়। ভাসানী সাহেবকে আওয়ামীলীগ থেকে বিতাড়ন করে মুজিব চক্র। এর আগেই মুজিব চক্রটি শামছুল হককেও বিতাড়ন করেছিলো। শামসুল হকের স্ত্রী আফিয়া খাতুনকে আমেরিকায় বলা যায় মুজিবরাই পাচার করেছিলেন। আর শামসুল হককে পাগলা ঘোষনা করে তাকে ঢাকা ছাড়া করেছিলেন। আফিয়া খাতুন এখনো আমেরিকায় বেঁচে আছেন। শিক্ষকতা করেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর শামসুল হক সেই 'পাগল' অবস্থায় এরপর আরো অনেকদিন বেঁচে ছিলেন।

www.pathagar.com

একটি সরকারী গোপন সূত্র আমাকে ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে খবর দিয়েছিল যে, শামসুল হক ঐ সময় সিলেটে হযরত শাহজালালের মাজারে খাদেম হিসাবে কর্মরত ছিলেন। অথচ তার এক বছর আগেই আ'লীগ সরকার তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেছিলো। ষড়যন্ত্রকারী মুজিবী চক্রটি যখন পঞ্চাশের দশকের শুরুতে শামছুল হক-আফিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তখনই তারা এই দলটিকে ভারতীয় কংগ্রেসের বি-টিমে পরিণত করে। তাদের এই অপকর্মে একমাত্র শাসছুল হকই ছিলেন প্রধান বাধা। কেননা শামসুল হক-আফিয়া দুজনই দৃঢ়ভাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শে কমিটেড ছিলেন। মাওলানা ভাসানী সেই কারনেই ওদের দুজন স্বামী-স্ত্রীকে খুবই স্নেহ করতেন। ভালবাসতেন। শামসুল হক-আফিয়াকে বিতাড়নের সাথে সাথেই ঐ ভারতীয় চক্রটির ক্রীড়নকরা মাওলানা ভাসানীকেও ঐ দল থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে। ফলে ভাসানী ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ এর প্রতিষ্ঠা করেন। মুজিবের নেতৃত্বে এক গুন্ডা বাহিনী ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত রূপমহল সিনেমা হলে মাওলানা ভাসানীর সেই দল গঠনের সম্মেলনে সন্ত্রাসী আক্রমন চালিয়েছিল। এই সময় আমি ঢাকায় কলেজে পড়াশুনা করতাম। অতএব বিষয়টি বুঝবার মত বয়স ও বুদ্ধি আমার হয়েছিল। তখন থেকেই অর্থ্যাৎ ১৯৫৬ সালের পর থেকেই বস্তুতঃ ভারতের কংগ্রেস পার্টির বি টিম হিসাবে আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে বাস্তব রূপ গ্রহন করে।

সেই থেকে আ'লীগ ভারত ও একই সাথে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের দোসর হিসাবে দেশে যতসব অপকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। গুন্ডামি, সন্ত্রাসী, ষড়যন্ত্র ছিল ওদের প্রধান কার্যক্রম। ফলে মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য হয়নি এই দলটি। পাকিস্তান আমলের শেষদিকে বা ষাটের দশকের শেষে যে তারা কিঞ্চিৎ জনসমর্থন পাওয়া শুরু করে তার কারন ছিল দেশে আইয়ুব খানের মার্শাল ল' এর স্বৈরশাসন। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন যদি থাকতো বা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশ চলতো, তাহলে শেখের ৬ দফার জন্মই হতো কিনা সন্দেহ। তাই বলা যায় যে, দেশের অভ্যন্তরে সামরিক কাম স্বৈরশাসনই ৬ দফাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল। আর এই ফাঁকে বা গণতান্ত্রিক রাজনীতির শূণ্যতার কারনেই ভারত সুযোগ পেয়েছিল এদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবার। মুজিবের মত নেতৃত্ব দেশকে মারাত্মক সংকটে ফেলে দিয়েছিলো। ভারত তার কুঠারে শাণ দিতে এক মহাসুযোগ পেয়েছিল। অন্য কথায় ভারতের জন্য ভারতের রোল প্লে করেছিলেন শেখ মুজিব ও তার দল আ'লীগ। এতো গেল ১৯৭১ পূর্ব বিষয়াদির ও ঘটনাদির একটি সাধারণ রূপ।

১৯৭২-৭৫ সময়কালে ভারত বাংলাদেশের এমন কোনো বিষয় ছিল না যাতে নাক গলায়নি। দেশের সিক্রেট বা গোপনীয়তা বলে কোন কিছুই ছিল না। মিলিটারি সিক্রেট তো ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের হাতে চলে গিয়েছিল। এরপর দেশের কাছে যেসব স্টেট সিক্রেট একান্তে থাকার কথা, তাও তিনি ভারতীয় অফিসারদের কাছে খোলামেলা ছেড়ে দেন। প্রসঙ্গত জে এন দীক্ষিত-এর লেখা ১৯৯৯

www.pathagar.com

সালের জুনে প্রকাশিত 'লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড' বইখানি পড়ে দেখতে পারেন। এই বইয়ের লেখক ভারতের এখন অবসরপ্রাপ্ত বিদেশমন্ত্রী। যখন ১৯৭২ সালের ১৭ই জুন ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের অফিস খোলেন, তখন তিনি ছিলেন একজন জুনিয়র আফসার। এই বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মুজিবের পরিবারের একজন একান্ত সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব বুঝতেই পারছেন তার কাছে রাষ্ট্রীয় সিক্রেট বলে কোন কিছুই গোপন ছিল কিনা।

দেশের সব সিক্রেট ছাড়াও অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও দিল্লীর নিয়ন্ত্রনে ছেড়ে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব। কি শাসনতন্ত্র বা সংবিধান, প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই দিল্লী নিজেদের কব্জায় পেয়ে গিয়েছিল। দীক্ষিত অবশ্য তার এই বইতে উল্লেখ করেছেন যে, মুজিব ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে ভারত বা দিল্লী নির্ভর থাকলেও পরে কিছুটা আত্মনির্ভরতার দিকে এগুবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা চরম ভারতমুখীতা এবং নির্ভরতার কারনে দেশের অর্থনীতি মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল। দেশে হাহাকার, খাদ্যাভাব, দলীয় ও সরকারী সন্ত্রাস এক বিভীষিকার রূপ নিয়েছিল। ভারতের শোষণ এবং সরকার দলীয় দুর্নীতির ফলে দেশে এক মহাদুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭৪ এর শেষে কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েক লাখ বনি-আদম অকালে প্রাণ হারিয়েছিল। একই সময় শেখ মুজিবের বা সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা দেশের সম্পদ লুটপাট করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গিয়েছিল। দেশের মানুষ যেন বোবা বনে গিয়েছিল। প্রকাশ্যে কথা বলার সাহস পর্যন্ত মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল। কেননা পাছে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন, পিটুনি এমনকি হত্যার শিকার হতে হয়।

এই বাহিনীর সংগঠন এবং অপারেশনও ছিল দিল্লীর প্রত্যক্ষ মদদ এবং নিয়ন্ত্রনে। ভারতীয় জেনারেল ওভানের পরিকল্পনায় এবং পরামর্শেই এই প্যারা-মিলিটারি বাহিনী গঠিত হয়েছিল। বিশেষ ধরনের ভারতমুখী বা ভারতের অনুগত নওজোয়ানদের দিয়ে। মুজিব আর তোফায়েল ছিলেন এই বাহিনীর স্থানীয় নিয়ন্ত্রক। ভারতের গোলামীর এখানেই শেষ ছিল না। এরপর তিনি দিল্লী মস্কোর পরামর্শে এবং সক্রিয় সহযোগিতায় গঠন করেন একদলীয় বাকশাল, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে। মুজিব বন্ধ করে দেন ন্যায্য রাজনৈতিক প্রতিবাদের সকল খোলা গণতান্ত্রিক পথ। ফলে ভারত বিরোধী বিভিন্ন গোপন সংগঠন রাজনৈতিক সংগ্রাম বা এমনকি প্রতিরোধ যুদ্ধও শুরু করে। শেষে ১৯৭৫এর ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর লেজুড় মুজিব সরকার ও বাকশাল নামক একদলীয় দানবকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়। সংঘটিত হয় এক সফল সামরিক অভ্যুত্থান। দেশের মানুষ হাঁফ চেড়ে বাঁচে। চরম ধিক্কার দেয় মানুষ ভারতের পুতুল এবং নব্য মীরজাফর মুজিবকে। বাকশালের অনেক নেতাই আত্মগোপন করে বা পালিয়ে যায় ওদের প্রভুদের কাছে বর্ডারের ওপারে। কেননা ১৯৭২-৭৫ এর সাড়ে তিন বছর সময়কালে বাকশাল আ'লীগাররা তাদের অনেক অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদাদি ভারতে পাচার করেছিল। এমন ছিল একজন নেতা গাজী গোলাম মোস্তাফা। তার নাকি

www.pathagar.com

একশ কোটি টাকার সম্পদাদি জমা ছিল ভারতের বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানে। পরে সেই ব্যক্তিটি তার স্ত্রীসমেত ঐ ভারতেই মোটরগাড়ী দুর্ঘটনায় মারা যান। দুষ্টজনেরা বলেন যে, তার সেই শত কোটি টাকার সম্পত্তি তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। যারা ওর চেয়ে বুদ্ধিমান তারা নিজেদের অবৈধ সম্পদ পাচার করে জমা করেছিলেন সুইস এবং অন্যসব ইউরোপীয় দেশের ব্যাংকে। মোটকথা হচ্ছে, দেশের দলবল নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিরাপদ মনে করত ভারতের কোলে আশ্রয় নেয়া। কংগ্রেসের বি টিম হিসাবে তারা যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার কাররেও ওরা পুরা ভরসা পেত দিল্লীর আশ্রয়ে।

একই নিরাপত্তার ধারাবহিকতায় শেখ হাসিনা ঢাকায় ক্ষমতাসীন ছিলেন। বিগত ৫টি বছরে শেখ হাসিনা তার সাধ্যমত সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন দিল্লীর পদতলে। দিল্লীর পূর্ন আশ্রিত রাজ্য ছিল হাসিনার বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাথে চরমভাবে মীরজাফরী করে চলেছেন শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ। মানুষ তাই এদের হাত থেকে রেহাই এর পথ খুঁজছে। শ্রমিক-জনতার যৌথ আন্দোলনের ভিতর দিয়েই হাসিনার চূড়ান্ত পতন ঘটে বিগত ১লা অক্টোবর ২০০১ এর নির্বাচনে।

০১/০৭/২০০২ইং, দৈনিক দিনকাল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোনাজাত করেছিল। এসব কি অবাক হবার বিষয় ছিল না? আরো অবাক হবার বিষয় কি ছিল না যে, আমাদের আজতক জানা মতে, প্রায় কোন একটি প্রানীও সেই 'জনপ্রিয়' মানুষটি মুজিবের জন্য কোন সহানুভূতি জানায়নি। সহানুভূতিতে সেই সেনাদের প্রতিরোধ তো অনেক দূরের কথা। আরো জানা গেছে যে, মুসলমান মুজিবের জন্য কোন একজন মুসলমানও আল কোরআনের সেই বিখ্যাত আয়াত "ইন্না লিল্লাহ ...." যা কিনা প্রতিজন মুসলমান অন্য মুসলমানের মৃত্যু শুনে উচ্চারণ করেন তাও কেউ করেনি! কি আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু কেন? মানুষের সেই ১৫ই আগষ্ট (৭৫) কি অনুভূতি ছিল? আলো থেকে অন্ধকারে ডুববার নাকি গভীর অন্ধকার থেকে আলোর ঠিকানা পাবার? আলো থেকে অন্ধকারে পতিত হলে কেউ কি আনন্দিত হয়? খুশী হয়? আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করে? শেখ হাসিনা তবে কোন অন্ধকারের কথা আমাদের বুঝাতে চাইছেন? নাকি ওসব সময়ের সঠিক তথ্য নিয়ে যে নতুন প্রজন্ম অজ্ঞ, তাদের সেসব সীমাহীন অজ্ঞতার বা শূণ্যতার সুযোগ নিয়েছেন শেখ হাসিনা? কে জানে তার দুর্ভাগ্য কিনা এই যে, আমরা ঐ সময়ের সচেতন নওজোয়ান এখন প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধ্যক্যে বেঁচে আছি। আল্লাহর রহমতে সেসব বিভীষিকার অন্তত কিছু কিছু স্মৃতি এখনো সচেতনভাবেই বহন করে চলেছি। আমরা মনে রেখেছি, যে বহুদলীয় গণতন্ত্রের মুজিব কবর দিয়েছিল ১৫ই আগষ্টের পরপরই তা পুনরুদ্ধার করা গিয়েছিল-চরম অন্ধকার থেকে আলো দেখেছিল মানুষ।

শেখ মুজিব আমাদের আট আনা বা পঞ্চাশ পয়সা সের দামে চাল আর ছয় আনা সের দরে গমের আঁটা খাবার ওয়াদা করেছিলেন। ১৯৭৫ এ সেই চাল মানুষকে ১৫ই আগষ্ট এর আগে ১০/১২ টাকা সের দামে খাইয়ে তবেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। অন্য সব জিনিস পত্রের দামেরও একই মাত্রায় ১৫/২০ গুন বাড়িয়ে তবেই তিনি সাড়ে তিন বছরের মাথায় 'তিন বছর কিছুই দিবার পারুম না' এই কথা বলে আগের দেয়া সকল ওয়াদা ভঙ্গ করেছিলেন। অবশ্য ১৫ই আগষ্ট তার পতনের সাথে সাথেই বাজার দর সেই আট আনা, ছয় আনা না হোক প্রায় এক তৃতীয়াংশ নেমে গিয়েছিল বিশেষ করে চাল আটার দাম। কি তেলেসমাতি কান্ড' খতম হয়েছিল মুজিবের ব্যক্তি শাসন, ফলে অন্ততঃ স্তব্ধ হয়েছিল ভারতীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী তাদের এদেশীয় দালালদের তীব্র শোষণ, অসাধু ব্যবসায়ী পাটনারশীপের লাভালাভ ইত্যাদি তাতেই কিনা নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার দর রাতারাতি নেমে গিয়েছিল প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কেননা, ওপারের শোষনের ও কালোবাজারীর চেইন এ ছেদ হলে এমনিতেই এ দেশের অর্থনীতি যে চাঙ্গা, সবল ও সচল থাকে তাই ছিল অতি স্বাভাবিক। মানুষ হিসেব মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিল তার ৬ দফায় যেসব ওয়াদা শেখ মুজিব মানুষকে দিয়েছিলেন, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' বড় বড় লাখো পোস্টারের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার সবই যেন তাদের কাছে ভুল ঠেকেছিল।

কেনই বা মানুষের হাহাকার, খাবার-দাবারের অভাব, অনাহারে লাখ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি শনির দশা তাদের নিত্য সাথী হয়েছিল? কেনইবা মানুষের ভাতের অধিকার হরণের সাথেই ভোটের অধিকারটুকুও সেই স্বাধীনতার প্রায়

www.pathagar.com

এক বছরের মাথায় ১৯৭৩ এর নির্বাচনেই হরণ করা হয়েছিল? কেনইবা মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাভাবিক প্রতিবাদ স্তব্ধ করার জন্য সেই অতি গণতন্ত্রী মুজিবই পত্র-পত্রিকা বন্ধ করা সহ রক্ষীবাহিনী নামক একটি নির্মম ঘাতক বাহিনী দিয়ে সকল বিরুদ্ধবাদীতা ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে চলেছিলেন। শুধু কি তাই? বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনীরাই যেমন কামাল, মনি, এসপি মাহবুব ইত্যাদি কি কম নির্মম বা ঘাতক ছিল? এই সব বাহিনী ১৯৭২-৭৫এর সাড়ে তিন বছরের মুজিব আমলে যে প্রায় ৪০ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল তা কি মানুষের তখন ভুলে যাবার কথা ছিল? এরপর ১৯৭৫ এর জানুয়ারীতে সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে বেআইনী ঘোষণা করে শুধুমাত্র নিজের লোকজনকে দিয়ে একটি মাত্র দল বাকশাল গঠন করে তিনি নিজের গণতন্ত্রী চেহারাটার কি বারোটা বাজাননি? বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা ও ঐতিহ্যের কফিনে কি তিনি শেষ পেরেকটি নিজ হাতেই ১৩ মিনিটের একটি সংসদের নজিরবিহীন সংক্ষিপ্ত অধিবেশন টুকে দিয়ে নিজে নিজেই ইতিহাসের পঁচা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হননি? জাতিকে তিনি কি আলো থেকে চরম অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিলেন না? বহুদলীয় মুক্ত গণতন্ত্রের জায়গায় একদলীয় বাকশাল কি আলো থেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল না? ১৫ই আগষ্ট কি সেটি পুনরুদ্ধার করেনি? দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যখন অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন নিজেদের সম্মানজনক ভাবে স্বাধীন দেশে বাঁচার কোন পথই বাকী আছে বলে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখনই আওয়ামী-বাকশাল নেতা, পাতিনেতা ক্যাডাররা প্রায় রাতারাতি অন্যের জমি সম্পত্তি, বাড়ীঘর লুট, দখল ইত্যাদি যতসব অসৎ উপায়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিলেন। দেশের ভিতরে ছাড়াও সুইজারল্যান্ড, লন্ডন, নিউইয়র্ক এমনকি ভারতের মত গরীব ও অনুন্নত দেশের কোন কোন ব্যাংকে ওদের এদেশ থেকে পাচার করা অর্থ কোটি কোটি সংখ্যায় ঐ তিন সাড়ে তিন বছরেই জমা করেছিলেন ওদের অনেকেই। ১৯৭৫-এর শেষ দিকে একমাত্র সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকেই প্রায় ৪০০ কোটি ডলার ওদের জমা ছিল বলে আমি নিজেই লন্ডনে ১৯৭৫-এর শেষ কালে একটি পত্রিকায় খবর পড়ে দেখেছিলাম। মুজিবের অতি একান্তজন সে সময়ের এদেশের রেড ক্রসের প্রধান গাজী গোলাম মোস্তাফার একারই ভারতের ব্যাংকে জমা ছিল প্রায় একশ' কোটি টাকা। এই একশ' কোটি টাকার জন্যই ওদের অতি বন্ধু দেশ সেই ভারতেরই মাটিতে গাজী ও তার স্ত্রীর একই সাথে মটরগাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যাবার কারন ছিল বলেই অনেকের কাছে আমি শুনেছি। চুরিদারী করে সংক্ষিপ্ত সময়ে ভাগ্য কামাই করা ওদের ক্ষমতা দখলের একটি প্রধান কারন হিসাবে চিহ্নিত করে ওসব অন্ধকারাময় মানুষকে মরহুম মাওলানা ভাসানী ঘৃণাভাবে সম্বোধন করতেন 'লুটপাট সমিতির সদস্য' এই বিশেষ বিশেষণে। একজন প্রখ্যাত অথচ আওয়ামী লীগার নয় এমন একজন মুক্তিযোদ্ধা (এখন মরহুম) আমাকে তার মৃত্যুর আগে (প্রায় ৮/৯ বছর আগে) বলেছিলেন যে, শেখ মুজিবই স্বয়ং এ ধরনের অন্যায় অসৎ-ভাগ্য কামাই করার জন্য পরোক্ষভাবে হলেও উৎসাহ দিয়েছিলেন। ১৯৭২ এর প্রথম দিকে ঢাকার সিদ্দিকবাজার কমিউনিটি সেন্টারে মুজিব স্বয়ং নাকি সেই মুক্তিযোদ্ধাকে অনেকটা ধমকের সুরে

www.pathagar.com

বলেছিলেন, 'আমার ছেলেরা ১৯৫৪ সালের পর ১৭ বছর কোন কিছুই খায়নি, এখন ওরা না হয় কিছু কিছু খাচ্ছে, তাতে তোর চোখ টাটায় কেন?' আল্লাহ জানেন উনি সত্যি বলেছিলেন কি না। তবে মিথ্যা বলার কোন কারন আমি খুঁজে পাইনি।

মুজিবের পরিবার এবং নিকট আত্মীয়স্বজনের মধ্যে শেখ কামাল, শেখ মনি, শেখ নাসের ইত্যাদি আরো অনেকের নিপীড়ন, চৌর্যবৃত্তি, অন্যের সম্পত্তি জবরদখল ইত্যাদি কোন ধরনের আলো ছিল? নাকি সবই ছিল অন্ধকার আর গহীন অন্ধকার?

শেখ হাসিনা শেখ মুজিবী শাসনকালের সাড়ে তিন বছরের কিঞ্চিৎ উল্লেখিত ওসব অন্ধকারাময় বিষয়াদির কথা নতুন প্রজন্ম থেকে গোয়েবলসীর মিথ্যাচারের কায়দায় যে গোপন করতে চাইছেন তা আমাদের মত বৃদ্ধদের কাছে অতি সহজেই বোধগম্য। এছাড়াও নব্য বাকশালী কায়দায় ভবিষ্যতের যে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক আফিমের তথাকথিত 'আলো'র স্বপ্ন দেখাতে চান, তাও এই পোষ্ট মডার্নিজম একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে কোন আলো যে নয় বরং আরো অন্ধকারময় হতে পারে, তার আলামতের কোন কমতি এখন নাই। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কিউবা এবং কিম এর উত্তর কোরিয়া আর কতসময় ওদের সেই একদলীয় বা 'এক নেতা এক দেশ'-এর তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে টিকে থাকবে তা বোধ করি আর অল্পকাল মাত্র বেশী দিন নয়। কমিউনিষ্ট চীন একদলীয় ব্যবস্থায় আপাততঃ টিকে থাকলেও মুক্ত বাজার এর সাথে প্রতিযোগিতা ঐ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে অচিরেই নিঃশেষ হবে তা আন্দাজ করতে খুব একটা কষ্ট হবার কথা নয়। চীন আর কতটি 'তিয়ান-আন-ম্যান স্কোয়ার' ট্রাজেডি ঘটাতে ও তারপরও ঐ একইভাবে টিকে থাকবে তাও ভেবে দেখার বিষয়। আর ধর্মনিরপেক্ষতায় ইউরোপ ও আমেরিকা বা অনুরূপ উন্নত ও মুক্তবাজারের কোন দেশই এখনই আর এক শ' ভাগ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ওরা শিল্প বিপ্লব উত্তর সময়কালের মত আর 'ধর্মনিরপেক্ষ' থাকতে চাইছে না। কেননা, ঐ পাপের ফলে তারা অভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাতের শিকার হয়েছে। ফলে ওদের দেশের সকল জ্ঞানী-গুনী-বিবেকবান মানুষ পারিবারিক মূল্যবোধ পুনঃজাগরণের বিষয়ে ভীষণ জোর দিচ্ছেন। আমেরিকার এই বছরের নির্বাচনে বুশ ও কেরী দু'জনই এই 'পারিবারিক মূল্যবোধ' পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর খুবই জোর দিচ্ছেন। এই নিয়ে ২০০৪ এর নভেম্বরের নির্বাচনে উভয়েই ওয়াদা করেছেন। বলেছেন যে মূল্যবোধ কায়েম করা ছাড়া দেশের সমূহ আরো ক্ষতি হবে। আর এই জন্য যে ধর্মনিরপেক্ষতার পথ পরিহার করে আধ্যাত্মবাদের দিকে প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে তা বোধকরি বুদ্ধিমান প্রতিজন মানুষের কাছে অতি পরিস্কার। তাই শেখ হাসিনা যদি সেই 'ধর্মনিবপেক্ষতা' ও 'সমাজতন্ত্র' নামের বস্তাপচা তথাকথিত 'মানবিক' আর্দশকে এখনো 'আলো হিসাবে বিবেচনা করতে থাকেন, অন্যদিকে ইসলামী মূল্যবোধের কালোত্তীর্ণ সঠিক ধারাকে 'অন্ধকার' বলে এখনো মহাদম করতে থাকেন, তাহলে কেউই তাকে বোধ করি মুসলিম প্রাধান্যের বাংলাদেশে অন্ততঃ রাজনীতিতে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। তিনিই থাকবেন অন্ধকারে, যেমন ছিলেন মুজিব।

১৫/০৫/২০০৪ইং, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

গ্রন্থকার মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বিগত প্রায় ৪৮ বছর শিক্ষকতার পেশায় জড়িত। জন্মস্থান বৃহত্তর রংপুর জেলায় (গ্রাম-নিতাই, থানা-কিশোরীগঞ্জ, জেলা-নীলফামারী)।

১৯৫৭ সালে অধুনালুপ্ত আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এ লাইসেন্সিয়েট (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন) করার পরপরই তখনকার সর্বপ্রথম এবং একমাত্র পলিটেকনিক-ইষ্ট পাকিস্তান পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট এ শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। এরপর উচ্চতর লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন করাচী পলিটেকনিকে (১৯৬১), ওকলাহোমা ষ্টেট ইউনিভার্সিটি ষ্টিল ওয়াটার ক্যাম্পাসে (১৯৬৬-৬৭), প্রাইভেটে বি.এ. ডিগ্রী নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৭০) এবং ১৯৭৪-৭৫ সেশনে অর্জন করেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন এর এসোসিয়েটশিপ।

১৯৮২ সাল পর্যন্ত ঢাকাসহ আরও ভিন্ন তিনটি পালটেকনিকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি চলে যান লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন এ পোষ্ট গ্রাজুয়েশন করার জন্য। ১৯৮৯ সালে পোষ্ট গ্রাজুয়েশন শেষে দেশে ফিরে তিনি প্রথমে টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে (ঢাকা) (১৯৯০-৯৩), এরপর আই সি টি ভি টি আর এ ১৯৯৩-৯৬ এবং সর্বশেষ দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটিতে ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে শিক্ষাদান শেষে বার্ধক্য জনিত ও অসুস্থতার কারনে অবসর নেন। তবে ২০০৩ সালের জুলাই মাস থেকে পুনরায় দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটিতে অনারারী ফেকাল্টি মেম্বার হিসেবে মাত্র দুটি বিষয়ে সপ্তাহে ৪ ঘন্টা মাত্র শিক্ষাদান কাজে এখনও নিয়োজিত আছেন।

প্রথমদিকে পেশাগত জীবনে তিনি বেশ কয়েকখানা পাঠ্যবই সম্পাদনা করেছেন (মোটরগাড়ী ও রেফ্রিজারেশন)। তার রাজনীতি বিষয়ক বইগুলি হচ্ছে (১) Bangladesh. Victim of Black Propaganda, Intrigue & Indian Hegemony (1996), (২) India's Farakka Barrage: Cold-Blooded Murder of Bangladesh (1996), (৩) Patriot-Traitor Question : Bangladesh Syndrome (2006) এবং (৪) দুর্জন রাজনীতিকদের কিছু চালচিত্র (২০০৬); এছাড়াও 62 Letters of Prof. Dr. Syed Sajjad Husain এই শিরোনামের বইখানিও লেখকের কাছে লেখা রাজনীতি নিয়ে তার একটি ব্যতিক্রমী ধরনের সংকলন গ্রন্থ।

লেখালেখির সাথে লেখক এখনও জড়িত। আরও কয়েকটি পান্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। এর একটি হচ্ছে (১) মানবিক মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা দর্শনের সন্ধান এবং (২) শিক্ষাক্রম প্রনয়ণ বিষয়ে।

লেখক বিভিন্ন পেশাজীবি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িতঃ ১) ইনষ্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ ১৯৭০-১৯৮২ (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি), ২) বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি, ১৯৭০-১৯৭৪ (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি), ৩) মাসিক কারিগর, ১৯৭২-১৯৮২(প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক), ৪) মাসিক আল-হেলাল (লন্ডন) ১৯৮৪-৯৯(প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক), ৫) মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ১৯৯৯-(প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি), ৬) ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬- (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি) এবং অন্যান্য।